নরনারীর যৌনবোধ

—যৌনক্ষুধা ও যৌনজীবন—

"Protiva"

"সমাচার" পত্রের ভূতপূর্ব সহযোগী সম্পাদক, "জীবনের আলো"-সম্পাদক
"জন্ম-শাসন", "History Of Prostitution In India",
"দুর্নীতির ইতিহাস" প্রভৃতির গ্রন্থকার

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু

ও

শ্রীআরাধনা দেবী

কাত্যায়নী বুক স্টল্
২০৩, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট্, কলিকাতা।

রোমাঞ্চ জাগাইয়া তুলিতেছে! সে যুগে 'ধর্ম' ও 'মোক্ষ' লইয়া বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ অনেক কিছু মাথা ঘামাইয়াছিলেন; 'অর্থ' লইয়া শুক্র, কৌটিল্য, কামন্দকাদি বহু পণ্ডিতই গবেষণা করিতেছিলেন। কিন্তু কাম সম্বন্ধে গভীর ও প্রণালীবদ্ধভাবে গবেষণা করিবার মহাজন আবির্ভূত হইয়াছিলেন অতি অল্প সংখ্যকই। অথচ বাৎস্যায়ন দেখিলেন, মানব-জীবনের অক্ষকেন্দ্রই হইল কাম; কাম হইতেই মানুষ ধর্ম ও অর্থ, এমন কি মোক্ষ পর্যন্ত লাভ করিতে পারে। এসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ মানুষের সর্বাগ্রে সর্বাধিক প্রয়োজন।...

কাম-পরিচালনার ভার শুধু তাহার সহজ বুদ্ধির উপর ছাড়িয়া দিলেই চলিবে না। শুধু আনন্দের পাল চড়াইয়া দিয়া নৌকাকে তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের বুকে ভাসাইয়া দেওয়া চলে না, উহাতে জ্ঞানের দাঁড় ও সংযমের হাল জুড়িয়া না দিলে, প্রতিপদেই বান্‌চাল্ হইবার সম্ভাবনা। নৌকার দ্বারা লোক ব্যবসা-বাণিজ্য করে, পারাপার করে, লোকযাত্রা নির্বাহ করে, দেশ-দেশান্তরে ভাবের আদান-প্রদান চালায়। কে কবে নৌকায় চড়িয়া জলদস্যুতা করিবে—এই আশঙ্কা করিয়া কেহ নৌকার গঠন ও চালন বন্ধ রাখে নাই। অগ্নিতে কবে কাহার গৃহ ভস্মসাৎ হইবে বলিয়া কেহ উহার প্রচলন বন্ধ করে নাই—রন্ধনকার্যও স্থগিত রাখে নাই; বরং অগ্নিকে অশেষ মঙ্গলজনক প্রণালীতে বিনিয়োগ করিবার কৌশল মানুষ শিখিয়াছে।...কাম সম্বন্ধেও ঠিক্ এই কথাটাই প্রযোজ্য; বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—কামের মধ্য দিয়াই সংঘটিত হয়; ইহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ব্রহ্মজ্ঞানের চেয়ে কিছু হীনতর নহে। তাই বাৎস্যায়ন ঘোষণা করিলেন—

"শরীরস্থিতিহেতুত্বাদাহার সধর্মাণো হি কামাঃ ফলভূতাশ্চ ধর্মার্থয়োঃ। বোদ্ধব্যস্তু দোষেম্বিব। নহি ভিক্ষুকঃ সন্তিতি স্থাল্যো নাধিশ্রীয়ন্তে।

নহি মৃগাঃ সন্তীতি যবা নোপ্যন্তু ইতি বাৎস্যায়নঃ॥”—শরীরের স্থিতি করে বলিয়া কাম আহারের সহিত একধর্মা, এবং ইহা ধর্ম ও অর্থের ফলস্বরূপ। যথোপযুক্ত আহারের দোষে যেরূপ অজীর্ণাদি নানা ব্যাধি জন্মিতে পারে, কামও সেইরূপ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে পরিচালিত না করিলে, তদ্দ্বারা নানারূপ অনর্থপাত হইতে পারে। ভিক্ষুকগণ আছে বলিয়া হাঁড়ী চড়াইবে না, হরিণগণ আছে বলিয়া যব বপন করিবে না,—এরূপ তো হইতে পারে না।···

বাৎস্যায়নের পূর্বেও অবশ্য ভারতে যথেষ্ট কামজ্ঞানের চর্চা ছিল; এবং বৌদ্ধ ও পৌরাণিক যুগেও ধর্মের পার্শ্বে রাখিয়াই কামকলার কল্পবৃক্ষ-মূলে সযত্নে জলসিঞ্চন করা হইত। মহাভারতেও আমরা দেখিতে পাই, পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে ধর্ম, অর্থ ও কামের কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ তাহা লইয়া তুমুল তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে। হিড়িম্বা-প্রেমিক বীরবপু ভীমসেন কামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে যে সকল সারগর্ভ যুক্তির অবতারণা করিলেন, তাহা যেমন জ্ঞানগর্ভ, তেমনি সত্যপ্রকাশে নির্ভীকতার পরিচায়ক। উপনিষদে আমরা দেখিতে পাই যে, পঞ্চালরাজ প্রবাহন জৈবালি প্রমুখ বহু রাজর্ষি তৎকালে “পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়” পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন,—দেশ-বিদেশ হইতে বহু পণ্ডিত ছাত্ররূপে তাঁহাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। শঙ্করাচার্য নিখিলবিদ্যায় অপরাজেয় পণ্ডিত হইয়া, যে বিদ্যায় ভাবমিশ্রের পত্নী উভয়ভারতীর নিকট পরাজয় মানিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বিদ্যাকে তুচ্ছ করিবার স্পর্ধা তখন কাহারো ছিল না। কিন্তু ওই সকল উপনিষদ, মহাকাব্য, পুরাণাদির মধ্যে আপামর-সাধারণকে যৌনবিষয়ক শিক্ষা দিবার একটা বিজ্ঞানসম্মত আন্তরিক প্রয়াস ছিল না, বা অধ্যবসায়ের সহিত ওই জ্ঞানকে সংহত ও সমৃদ্ধ করিবার মতো কোন ধারাবাহিক উদ্যোগ ছিল না।

যাহাহউক, বৌদ্ধবাদ ও হিন্দু সভ্যতার বহুদিনব্যাপী প্রাণ-বিধ্বংসী দ্বন্দ্বের উপসংহারে যেদিন বিরাট্ ধ্বংস-স্তূপের মধ্য হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম, একটা বিসদৃশ নূতন রূপ ও মুখে হাসি চক্ষে জল লইয়া বাহির হইয়া আসিল, সেইদিন হইতে যুগযুগান্তের ধর্ম, অর্থ ও কাম-বিষয়ক প্রাচীন প্রজ্ঞানরাশি পঙ্কতলে মুখ লুকাইল; কেবল উপরে ভাসিয়া রহিল—ক্রিয়াকাণ্ড-বাহ্যানুষ্ঠান-বিধিনিষেধ-ভেদবিভেদের স্বল্পপ্রাণ শফরী! তথাপি মুসলমান যুগের মাঝামাঝি সময়ে কল্যাণমল্ল বিদেশী বাদশাহের দরবার স্তম্ভের অন্তরালে নির্ভয়ে বসিয়া 'অনঙ্গরঙ্গ' লিখিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বে যখন ইস্লামীয় ভাগ্যান্বেষীর দল বাংলার দ্বারে আসিয়া করাঘাত করিতেছিল, তখন মহাকবি জয়দেব লক্ষ্মণসেনের অভয়াশ্বাসে, বৈকুণ্ঠের দোহাই দিয়া, রতি-সুখসারের অজস্র মহিমা কীর্তন করিয়াছিলেন। তারপর বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণ সুখদুঃখময় বাস্তব প্রেমের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি দেবলীলার পটভূমিকায় রামধনু রঙে আঁকিয়া গেলেন।...অবশ্য, ভারতের জ্ঞান ও অজ্ঞানতার সবিস্তার ইতিহাস লেখার স্থান ইহা নহে; তবে ইহাই বক্তব্য যে, যৌন-বিষয়ক জ্ঞানদানের প্রয়োজনীয়তা প্রাচীন-ভারতে যেরূপভাবে অনুভূত হইয়াছিল, নবীনভারতেও সেইরূপ হইতেছে—বরং আরো নিবিড়ভাবে।

এ বিষয়ে জ্ঞান-বিস্তারের বিপক্ষে লোকের আন্তরিক গোঁড়ামি যতটা না আছে, তাহার চেয়ে অনেক বেশী আছে অত্যধিক ভণ্ডামি। এ দেশের পরাধীনতার মূলে—ধর্মে, কর্মে ও জ্ঞানে দারুণ অজ্ঞতা, বিরাট্ কপটতা ও নীতিবাগীশতার বহ্বাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। যথেষ্ট যৌনজ্ঞানের অভাবে কত শত দম্পতি যে আজ চিরদুঃখ-বেদনার সহিত মিতালি পাতাইয়াছেন, কত সংসার যে পুড়িয়া ছারখার হইতেছে—তাহার ইয়ত্তা নাই। রাষ্ট্রে ও সমাজে সংস্কারসাধনার্থ কত নেতাই আজ

উদ্যোগী, চিন্তাকুল! কিন্তু আমাদের মনে হয় সর্বাপেক্ষা সমস্যাপ্রধান অথচ সমাধানসাধ্য, অজ্ঞাত অথচ অর্চনীয়, পরিচিত অথচ অনাদৃত—এই রহস্যকুহেলি-ঘেরা দাম্পত্য-জীবনের জ্ঞানদ্বার-উদ্ঘাটন করিয়া দেওয়া সর্বশ্রেণীর লোকহিতৈষীরই প্রাথমিক কর্তব্য। এই সঙ্গীন প্রশ্নকে এড়াইয়া চলিলে, ব্যষ্টি ও সমষ্টির মুক্তি কোনকালেই সুলভ ও সম্পূর্ণ হইবে না।...

এই দৃঢ়প্রতীতি লইয়াই, কিঞ্চিদধিক দশ বৎসর কাল পূর্বে প্রবল জনমতের সম্মুখে—সার্বজনীন্ জাড্য ও ঔদাসীন্যের মধ্যে—একটা প্রচ্ছন্ন কৌতূহল ও পরিহাস-সমাকীর্ণ সঙ্কীর্ণ পথ বাহিয়া, অনাগত, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া, আমি এই নূতন কর্মক্ষেত্র-অভিমুখে যাত্রা করি। শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, নূতন ও পুরাতন যৌনজ্ঞানের সর্বশাখার অসংখ্য পুস্তক-প্রতিবেদনাদি অধ্যয়ন করিয়াই তৃপ্ত হইতে পারি নাই, স্বজনবান্ধব, প্রতিবেশী ও অল্পপরিচিত ব্যক্তিগণের যৌন-জীবনের বিশিষ্ট রীতিনীতিগুলির সহিত পরিচিত হইবার বিধিমত চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, এবং তদ্বিষয়ে কতকাংশে কৃতকার্যও হইয়াছি। শুধু তাহাই নহে, কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবী মারফৎ দেশের বিভিন্ন স্থানের ও সমাজের নানা স্তরের নরনারীর যৌন-প্রগতি সম্বন্ধে সুব্যবস্থিত অনুসন্ধান-কার্যেও গত পাঁচ বৎসরাধিক কাল ব্যাপৃত রহিয়াছি। এ সকল কার্যে যে পরিমাণ সময়, শক্তি ও অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহার প্রত্যর্পণ পাই শুধু এই উপলব্ধির আত্মপ্রসাদে যে, এতদ্দ্বারা লোকহিতের কথঞ্চিৎ সহায়তা করা হইতেছে। এ দেশে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দার্শনিক তথ্যের মৌলিক গ্রন্থ লিখিয়া গ্রাসাচ্ছাদন-নির্বাহ হয় না, তাহা সকলেই জানেন।

তদুপরি, যৌন-বিজ্ঞানের গ্রন্থ লিখা ও তাহার মাল-মশলা সংগ্রহ করার

বাধাবিপত্তি অন্যদেশ অপেক্ষা আমাদের দেশে অত্যন্ত অধিক—এক-প্রকার দুর্লঙ্ঘ্য বলিলেও চলে। একটা নূতন ও আবশ্যকীয় জ্ঞানের গুহান্তরে আলোকপাত করিবার শুভ উদ্যমে উৎসাহিত করিবার উদারতা আমাদের দেশে খুব কম লোকেরই আছে। এদেশের পুরমহিলাদের নিকট হইতে তাঁহাদের ব্যক্তিগত যৌন-জীবন সম্বন্ধে সমাচার-সংগ্রহের প্রত্যাশা করা কত বড় দুঃসাহসিকতা, তাহা প্রকাশ না করিলেও চলিবে। এতদ্ব্যতীত কতিপয় পরছিদ্রান্বেষী, পরশ্রীকাতর, সাহিত্যিক-যশঃলিপ্সু দুর্বৃত্ত কোন যুক্তি না দেখাইয়াই এই জাতীয় সাহিত্যের প্রতি গালিবর্ষণ করে। সর্বোপরি, পুলিসের অযথা অনুগ্রহ-দৃষ্টি ও রাজরোষের সম্ভবনীয়তা তো আছেই। সুতরাং আমার কর্মক্ষেত্র কুসুমাস্তীর্ণ ও আদৌ লোভনীয় নহে। তথাপি, দারিদ্র্য, ভগ্নস্বাস্থ্য, নানা বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার উৎসাহ, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় আমার হ্রাস পায় নাই।...

প্রাচীন ভারতবর্ষ কামকলা সম্বন্ধে যতখানি কৃষ্টি বিশ্বসমাজে দান করিয়াছে, কোনো যুগে কোনো দেশ ততটা জ্ঞান বিতরণ করা দূরে থাক্—নিজেই অনুশীলন ও আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। অবশ্য মধ্যযুগের প্রথম পাদে আরব ও পারস্য এবং শেষ পাদে ফরাশী দেশ কামতত্ত্বের আদর্শগত ও বস্তুগত অনুশীলন যথেষ্ট করিয়াছিল এবং বিশ্ব-যৌন-সাহিত্যেও তাহারা নূতন কিছু তথ্য দান করিয়াছে। কিন্তু বিশ্ব-সভ্যতার আদি যুগেই বলুন বা মধ্যযুগেই বলুন, বিশারদগণের দৃষ্টি শুধু কলার উপরই নিবদ্ধ ছিল, বিজ্ঞানের উপর পড়ে নাই। তাঁহারা কামের বাহ্য লক্ষণগুলি ও বিভিন্ন অবস্থায় প্রেমিক-প্রেমিকার আচরণগুলি যত ভালো করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন, অন্তরের উপসর্গগুলিকে ততটা সূক্ষ্মদৃষ্টি লইয়া অধ্যয়ন করেন নাই। কারণ, অভিপ্রায় ও মূলগত প্রেরণা

অপেক্ষা কার্য ও তাহার বিভিন্ন অভিব্যক্তিকেই তাঁহারাবড় করিয়া দেখিয়াছিলেন ; দেহের প্রতি সুবিচার করিতে গিয়া, মানস-অজন্তার সর্ব কন্দরের পরিচয় লইতে তাঁহারা একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলেন।... প্রাচীন পণ্ডিতদের জ্ঞান ছিল অনেকটা synthetic ও physical, এবং এখনকার বিশারদগণের জ্ঞান analytic ও psychological.

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে যৌনজ্ঞানের চিরঅবজ্ঞাত অন্তরালটির প্রতি বিচক্ষণগণের দৃষ্টি পড়িল ও তাহার ক্ষেত্র প্রশস্ত হইল। তাঁহাদের সন্ধানী আলোক-রশ্মি বহুরূপী প্রেমের তমসাচ্ছন্ন অতল অন্তরে গিয়া অবগাহন করিল। মনোবিজ্ঞানের ডুবারী সেই গহ্বর হইতে অপরূপ দক্ষতায় মূল্যবান মণিমুক্তাহীরকপ্রবালের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া উপরে উঠাইতে লাগিল। পুরাতনের স্মৃতিপূজার সহিত নূতনের সমারোহময় অভিনন্দন চলিল।...বক্ষ্যমান গ্রন্থও সেই সদ্যোভিনন্দিত নবজ্ঞানালোকের একটা ক্ষীণতম ময়ূখরেখা!

গতানুগতিক পন্থা ছাড়িয়া, অল্পশিক্ষিত পাঠকপাঠিকার কৌতূহল-নিবৃত্তি বা হীনপ্রবৃত্তিকে শাণিত করিবার প্রলোভন দূরে রাখিয়া, আমাদের পুস্তকে একটা মৌলিক, অনাস্বাদিতপূর্ব স্বাস্থ্যকর জ্ঞান-রস পরিবেষণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। একদিকে ভারতের প্রাচীন গ্রন্থকর্তৃগণ, আরব্য-পারস্যের কামকলা-কুশলীগণ ও ফ্রয়েড্ হইতে ফ্রিজ্ ভিটেল্স্—এলিস্ হইতে ম্যাল্চাউ পর্যন্ত আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের গ্রন্থ হইতে পুস্তকের উপাদান যেরূপ সন্তর্পণে সংগ্রহ করিয়াছি, অন্যদিকে তেমনি ব্যক্তিগত অনুসন্ধান ও বহুদর্শনের ফলাফলও যুক্তিসহকারে লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এস্থলে একটি কথা পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি যে, স্ত্রী-পুরুষের যৌন-স্বভাব ও আপেক্ষিক বৈষম্য সর্বদেশে ও সর্বকালে মূলত প্রায় একইরূপ ; স্থানীয়

আব্‌হাওয়া ও সামাজিক রীতিনীতির প্রভাবে উহাতে অবশ্য যৎসামান্য ইতরবিশেষ হইতে দেখা যায়।

নারীদিগের যৌন-জীবন সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য-সংগ্রহ ইতঃপূর্বে আমার স্ত্রী ও তাঁহার দূরসম্পর্কীয়া এক ভগিনী করিতেন; কিন্তু ইঁহাদের অবসর ছিল অত্যন্ত অল্প ও কার্যক্ষেত্রের পরিসর ছিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। ইঁহাদের সাহচর্য যখন আমার নিকট অপর্যাপ্ত বলিয়া নিরাশ হইতেছিলাম, সেই সময় শ্রীমতী আরাধনা দেবী অযাচিতভাবে এই সংগ্রহের ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করিয়া দিবার ভার লইলেন। শুধু ভার লওয়া নহে, সাধ্যমতো নারীদিগের যৌনজ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা সুষ্ঠু নীতিসম্মত প্রণালীতে মিটাইয়া দেওয়া—তাঁহার জীবনের সুমহান ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিলেন। এই শিক্ষিতা গুণবতী মহিলার ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস উন্মুক্ত করা আমার অধিকার-বহির্ভূত; কিন্তু বলিতে বাধা নাই যে, বাংলা ও বাংলার বাহিরে উদারচরিত্র স্বামী-সমভিব্যাহারে পরিভ্রমণ করিয়া ও তত্তৎস্থলের নারীসমাজে অন্তরঙ্গ-রূপে মিশিবার সুযোগ পাইয়া, তিনি এ বিষয়ে বিস্ময়কর বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। পুস্তকের খুব সামান্য অংশই তিনি লিখিয়া দিয়াছেন, তথাপি প্রণয়নকালে ও তাহার পরে তিনি যে সকল নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া, আমার পরিশ্রমের লাঘব করিয়াছেন, এবং যে অসন্দিগ্ধ আত্মপ্রত্যয়ের বলে বলীয়সী হইয়া আমার এই অপ্রিয় তপস্যার সহিত একাত্ম হইয়াছেন, তাহাতে অন্তত কৃতজ্ঞতার খাতিরেও আমার পার্শ্বে তাঁহার নাম অঙ্কিত রাখা অপরিহার্য বলিয়া বিবেচনা করি।

পুস্তকের ভাষা সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। উহা যথাসাধ্য গম্ভীর, প্রাঞ্জল ও ভাবদ্যোতক করিবার চেষ্টা করিয়াছি; অথচ শব্দাড়ম্বরে অর্থকে জটিল করিবার কষ্টকল্পিত প্রয়াস কোথাও বোধহয় করি নাই।

বানান-বিষয়ে আমি আমেরিকার ইংরাজী শব্দমালা লিখনের সুসংস্কৃত পদ্ধতির উপর শ্রদ্ধাশীল এবং বাংলা ভাষায়ও ঐ রীতি-প্রচলনের আবশ্যকতা বহুকাল ধরিয়া অনুভব করিয়া আসিতেছি। সেইজন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম-এ বিদ্যানিধি মহাশয়ের বানান্ সম্বন্ধীয় মতবাদ আমি বহুলাংশে মানিয়া চলি। শ্রীযুত অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ ও বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ মহাশয়দ্বয়ও ইহার পক্ষপাতী।

বর্গের কোন কোন বর্ণের উপর রেফ্ থাকিলেই যে উহার দ্বিত্ব হইবে, এইরূপ নিয়ম প্রাচীন বৈয়াকরণিকগণের মস্তিষ্কসম্ভূত নহে। শব্দের যতখানি উচ্চারণ ততখানি লইয়াই বানান্ (phonetic),—ধ্বনির মূর্ত প্রতিচ্ছবি হইবে শব্দমালা। ভাষাসৃষ্টির মৌলিক নীতি ছিল তাই, এখনো তাহাই অব্যাহত রাখা উচিত। পক্ষান্তরে শব্দের মধ্যে বাঙ্গালীর একান্নভুক্ত পরিবারের দুই-একটি নিষ্কর্মা শরীকের মতো কোনো অনুচ্চারিত বর্ণের প্রয়োজন নাই,—আমি এই মতের পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং সর্ব, গর্ব, কর্ম বর্ম, কার্য, অর্ধ, উর্ধ, বর্তমান; মর্যাদা...ইত্যাদির সম্মুখীন্ হইলে কেহ যেন গ্রন্থকারদ্বয়ের বানান-জ্ঞানের মূর্খতার অজুহাতে উচ্চহাস্য না করেন। সাধ্যমতো অলস বিসর্গগুলিকেও নিশ্চিহ্ন করিয়াছি; সুতরাং 'প্রধানত', 'প্রথমত', 'মূলত', 'পুনঃপুন' প্রভৃতি শব্দ প্রথম প্রথম পাঠকের চক্ষে একটু বিসদৃশ ঠেকা অসম্ভব নহে। তবে প্রতীয়মান কারণেই আমাকে দুই-একটি শব্দের চিরব্যবহৃত বানান্ অব্যাহত রাখিতে হইতেছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, পুস্তকখানিতে আমরা গড়্পড়্তা বাঙ্গালী স্ত্রী-পুরুষের যৌনবোধ, যৌনক্ষুধা ও যৌনজীবনের কতকগুলি স্থূল, সাধারণ তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যাহা লিখিয়াছি, তাহার সবটুকুই প্রত্যেক পাঠকপাঠিকার যৌন-জীবনের সহিত হুবহু মিলিয়া যাইবে,

এমন কোন কথা নাই। তবে অল্পবিস্তর যে মিলিবে, তৎসম্বন্ধে আমরা স্থিরনিশ্চিত। পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্বের যে দুই একটি কথার মাঝে মাঝে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার সহিত প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই, আশা করি, একমত হইবেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সাধারণ পাঠকপাঠিকাগণ পুস্তকখানিতে এমন কিছু নূতন তথ্যের সন্ধান পাইবেন—যেগুলির দ্বারা তাঁহাদের অবশিষ্ট যৌন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে, নূতনতর সুখশান্তির দ্বার উন্মুক্ত হইবে।...

শয্যায় শুইয়া নিদ্রাকর্ষণার্থ বইখানি লঘু উপন্যাসের মতো পাঠ করিয়া গেলে, পুস্তকের প্রতি যেমন—গ্রন্থকারদ্বয়ের প্রতি তেমনি অবিচার করা হইবে। স্থির-মস্তিষ্কে একটু নিষ্ঠা ও মনোযোগের সহিত পাঠকপাঠিকাগণ যদি ইহা একাধিক বার পাঠের অবসর করিয়া লন্, এবং পরে তাঁহাদের অভিমত আমাদিগকে জানাইয়া দেন্, তাহাহইলে আমরা পরম অনুগৃহীত হইব। ইতি—

১০২।১, বেলেঘাটা মেন্ রোড,
কলিকাতা।

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু

—দ্বিতীয় সংস্করণের প্রাক্কালে—

প্রায় বৎসরাধিক কাল পূর্বে "নরনারীর যৌনবোধের" প্রথম সংস্করণ ফুরাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী রোগশয্যায় শায়িত থাকার জন্য দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য আমি যথাসময়ে প্রস্তুত হইতে পারি নাই।···

প্রথম সংস্করণে সংযোজিত "আমার অশ্লীলতার বিচার" শীর্ষক পরিশিষ্টটি এবার পরিত্যক্ত হইল। তাহা ছাড়া, বিষয়বস্তুর কিছু-কম প্রায় অর্ধাংশই বর্জিত ও অবশিষ্টাংশ সুমার্জিত করা হইয়াছে। তদুপরি, সওয়া-শতাধিক পৃষ্ঠার নূতন পাঠ্যবস্তু ও কয়েকটি রেখাচিত্র এবার নূতন সংশ্লিষ্ট হইল। প্রথম সংস্করণের পুঁথি অত্যন্ত দ্রুত লিখিত হইয়াছিল বলিয়া দুই একস্থলে অযুক্তিকর ভুল থাকিয়া গিয়াছিল; সেগুলি যথাসাধ্য পরিশুদ্ধ হইয়াছে। এতদ্বারা পুস্তকের আশানুরূপ ও সাধ্যমতো উন্নতি-সাধন করা হইল বলিয়া আমার ধারণা।

কয়েকজন অধ্যাপক বন্ধু আমাকে ক্রমাগত অনুরোধ করিয়া আসিতেছিলেন---পুস্তকের পরবর্তী সংস্করণে আমার বিভিন্ন তথ্যগুলির পরিপোষণার্থ বিদেশী গ্রন্থকারদিগের মতবাদগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিতে ও পাদটীকায় তাঁহাদের গ্রন্থের নামোল্লেখ করিতে। এ সংস্করণে তাঁহাদের সে অনুরোধ বহুলাংশে রক্ষিত হইতেছে। যে-সকল তথ্য আমিরা স্বাধীন অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে বাহির করিয়াছিলাম, তাহার কোন কোনটির উপর বিদেশী গুরুদিগের সমর্থনমূলক 'লেবেল্' আঁটিয়া দিবার জন্য অনাবশ্যকভাবে আমাকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। কোন কোন বিষয় আমাদের দেশের স্ত্রীপুরুষের যৌন-স্বভাবের একমাত্র বিশেষত্ব;

সুতরাং তাহার পরিপোষণের জন্য অন্যদেশের প্রামাণিক গ্রন্থনিচয় হাঁতড়াইতে যাওয়া সময়ের অপচয় মাত্র বলিয়া মনে করি।

প্রথমবারে পাঠকপাঠিকাদিগের যৌনজীবন-কাহিনীর মোটামুটি তথ্যগুলি জানাইয়া আমাকে সাহায্য করিবার জন্য যে আবেদন প্রচার করিয়াছিলাম, তাহার ফলে প্রায় দেড়শতাধিক স্ত্রী-পুরুষ আমার নিকট হইতে মুদ্রিত প্রশ্নপত্র চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং কিছু কম একশত পুরুষ ও মাত্র পাঁচজন স্ত্রীলোক তাঁহাদের উত্তর লিখিয়া আমার বা শ্রীমতী আরাধনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন বয়সের অন্তত চারিশত কেসের প্রতিবেদন না পাইলে, আমাদের আশানুরূপ তথ্যনিরূপণ সম্ভব হয় না। পাশ্চাত্য দেশে শুধু শিক্ষিত নহে, অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণও বিজ্ঞানের গবেষকদিগের হস্তে তাহাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল নিঃসঙ্কোচে তুলিয়া দেয়। জার্মানী, আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি সুসভ্যদেশে পণ্ডিতদিগের সাহায্যকল্পে শত সহস্র আবালবৃদ্ধবনিতা তাহাদের যৌন-জীবনের সমুদয় রহস্য বিবৃত করিয়া যে-সকল পত্র প্রতিবেদনাদি প্রেরণ করেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই Dickinson & Beam এর "Thousand Marriages", Katherine B. Davis এর "Factors in the Sex-life of 2200 women" প্রভৃতির ন্যায় জ্ঞানাঢ্য গ্রন্থনিচয় রচিত হয়।...

পূর্বের ন্যায় এবারো পাঠকপাঠিকাদিগের নিকট আমার করযোড়ে নিবেদন যে, আমাদের আশা ফলবতী ও ভাবী অবদান সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে তাঁহারা যেন তাঁহাদের সহৃয় সহযোগিতা ও অকপট সাহায্য হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত না করেন। যথাসাধ্য উত্তর লিখিয়া পাঠাইবার আশ্বাস দিলে, প্রত্যেককেই আমি প্রশ্নপত্র পাঠাইয়া দিতে পারি। যে

সকল উত্তর আমার নিকট আসিয়াছে বা অদূরভবিষ্যতে আসিবার সম্ভাবনা আছে, তাহা হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া ও প্রয়োজনমত সামান্য কোন অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া আমার আগামী গ্রন্থকে পরিপুষ্ট করিব বলিয়া ভরসা রাখি। বলা নিষ্প্রয়োজন, কোনো অবস্থায়ই এ অমূল্য বিশ্বাসের অপহ্নব হইবে না,—কোন ক্ষেত্রেই লেখক-লেখিকার নাম-ধাম প্রকাশ করা হইবে না।...

পরিশেষে লক্ষ্মৌপ্রবাসী অগ্রজপ্রতিম বন্ধু শ্রীযুত নির্মলচন্দ্র দে মহাশয়ের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। এ সংস্করণের অধিকাংশ সংস্কার তাঁহারই অনুপ্রেরণায় সাধিত। তাহা ছাড়া নির্ঘণ্টের কাঠামোটি বহু পরিশ্রমে তিনি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। আরো কয়েকজন চিকিৎসক ও অধ্যাপক বন্ধুর নিকট আমি এ বিষয়ে ঋণী রহিলাম। পীড়িত চক্ষু লইয়া প্রুফ্ দেখায় এ সংস্করণে কয়েকটি ছাপার ভুল থাকিয়া গিয়াছে; পাঠকগণ, আশা করি, মার্জনা করিয়া লইবেন। পুস্তকের উন্নতিকল্পে প্রত্যেকের শুভ ইঙ্গিতই আমার নিকট সর্বসময়েই বরণীয়। ইতি—

কলিকাতা।
মহালয়া, ১৩৪১ সাল। } নৃ-কু-ব

সূচীপত্র

[পুরুষ]

[প্রকৃতি]

দোঁহে কহি দুঁহু অনুরাগ।
দুহুঁ প্রেম দুহুঁ হৃদে জাগ॥
দুহুঁ দোঁহা করু পরিহার।
দুহুঁ আলিঙ্গই কতবার॥
দুহু বিম্বাধরে দুহুঁ দংশ।
দুহুঁ গুণ দুহুঁ পরশংস।
দুহু হেরি দোঁহার বয়ান।
দুহুঁ জন সজল নয়ান॥
দুহু কহ মধুরিম ভাষ।
নিরখয়ে যদুনাথ দাস॥

রেখাচিত্র নং ১

এক শ্রেণীর নারীর কাম-জোয়ার ও কামচূড়-আবির্ভাবের চান্দ্রমাসিক হিসাব।

—২২৪ পৃষ্ঠা।

নরনারীর যৌনবোধ

—পুরুষ—

প্রথম প্রপাঠ

উপক্রমণিকা

সারা সভ্যজগৎ জুড়িয়া নারী-জাগরণের ঢেউ উঠিয়াছে। গৃহের মধ্যে ও উহার অব্যবহিত বাহিরে যে সঙ্কীর্ণ সীমানার মধ্যে এতকাল ধরিয়া রমণীর কর্মক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট ছিল, তাহা বিংশ শতাব্দীর নব প্রেরণার কঠিন সংঘাতে বিস্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; নারী দিগ্‌দিগন্তের অফুরন্ত আলো-সমীরণের বন্দনা করিতে উৎফুল্লনেত্রে পুরুষের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, সে আজ রাষ্ট্রে, সমাজে, উপার্জন-ক্ষেত্রে, সভ্যতাবদানের সর্ব স্তরে পুরুষের সমকক্ষতা করিতে চাহিতেছে, তাহার সমান সুযোগ ও অধিকার দাবী করিতেছে; কোন কোন স্থলে পুরুষের সর্বপ্রকার শাসনের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহের রক্তনিশান উড্ডীন করিতেছে। বিদ্রোহী স্ত্রীরাজ্যের এ দল নেতা সর্বতোভাবে প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে, পুরুষ অপেক্ষা তাঁহারা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহেন, তাঁহারাও পুরুষের মত একই রক্তমাংসে গড়া: কয়েক

বিংশ শতাব্দীর নারী

বৎসরের সাধনা ও অধ্যবসায়ের ফলে তাঁহারাও শক্তিতে, বুদ্ধিতে, গুণে ও জ্ঞানে পুরুষের অনুরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন।

প্রকৃতির উদ্দেশ্য

কিন্তু ইহা অনুমানের কথা, প্রত্যক্ষ সত্যোপলব্ধির ফল নহে। পুরুষ ও নারীর মধ্যে দেহগত, মনোগত ও চরিত্রগত পার্থক্য দিয়াই প্রকৃতি তাহাদিগকে তৈয়ারী করিয়াছেন, এবং এই পার্থক্য যথাসাধ্য রক্ষা করিয়া চলাই তাঁহার একান্ত উদ্দেশ্য। মনুষ্যসৃষ্টির আদিম উষায়,—বাইবেল-বর্ণিত আদি নারী আদি পুরুষের পঞ্জরাস্থি হইতে উদ্ভূত হওয়ার কথা নিছক্ গল্প হইলেও, পারস্পরিক পার্থক্যের ভেদরেখা লইয়াই তাহারা জন্ম-জন্মান্তরের অনন্ত রাজপথে পদবিক্ষেপ করিয়াছিল, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উভয়ের মধ্যে জননেন্দ্রিয়গত পার্থক্য ত ছিলই, দেহগত ও মনোগত অন্যান্য বৈষম্যও ছিল। অবশ্য আদিমকালে এই ভেদ-লক্ষণ যতটুকু ছিল, সভ্যতার সোপানশ্রেণী বাহিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে তাহা আরও সুস্পষ্ট ও ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে।

এ কথা সত্য যে, প্রয়োজনীয়তার খাতিরে স্ত্রী-পুরুষের দেহ-মন ক্রমশ স্ব স্ব কর্ম্মজগতের অধিকতর উপযোগী করিয়া গঠিত হইয়াছে। বংশানুক্রমিক ও ঐতিহ্যগত অভ্যাস প্রত্যেক জাতিরই দ্বিতীয়প্রকৃতি-গঠনের পথে কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রদূত হইয়াছে বটে; কিন্তু সেই অস্ফুট জ্ঞান ও চিত্তবৃত্তির তন্দ্রাচ্ছন্ন তমসাময়ী উষায়, যখন গায়ের জোরে বা বুদ্ধির কৌশলে কেহ কাহাকেও পদদলিত করিবার স্পর্ধা রাখিত না, স্ত্রী-পুরুষ যখন সমান সুযোগ, সুবিধা ও অধিকারের স্নিগ্ধ বিচ্ছায়ে হাত-ধরাধরি করিয়া জীবন-যাত্রার পথে চলিবার আত্মপ্রচোদনা লাভ করিয়াছিল, তখন প্রকৃতিগত পার্থক্য নিবন্ধনই কি তাহাদের উভয়ের কর্ম্মক্ষেত্রের পথ ধীরে ধীরে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায় নাই?

কে ছোট, কে বড়,—এই প্রশ্ন লইয়া আপাতত যতখানি তুমুল তর্ক-বিচার-বাদ-বিসংবাদের তুফান উঠিয়াছে, প্রাচীন যুগে তাহার ক্ষীণতম বীচি-বিক্ষোভও কখনও দেখা যায় নাই। স্ব স্ব সীমানার মধ্যে, সময় বিশেষে, প্রত্যেকেই প্রধান, প্রত্যেকেই প্রভুর ভূমিকা গ্রহণ করিবে—ইহাই প্রকৃতির অভিপ্রায়। এই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্যই যুগে যুগে মানুষ চেষ্টা করিয়াছে—এখনও করিতেছে। এই ক্রিয়াশৃঙ্খলার উপর মানুষের কৃষ্টির রঙ্ হয়ত কিছু ফলানো আছে, কিন্তু প্রকৃতির কর্মশালা হইতেই ইহার পরিকল্পনা ও উদ্ভব। নৃতাত্ত্বিক ও পুরাবৈজ্ঞানিক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া অন্তত একটি সত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি উন্মোচন করিয়া দিয়াছেন যে, নারী যদি এতকাল পুরুষের দাসত্বই করিয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে—নারী পুরুষকে স্বেচ্ছায় প্রভুত্বের আসনে বসাইয়াছে বলিয়া।

স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই প্রভু

নারী ও পুরুষের পারস্পরিক পার্থক্য সৃষ্টি করিবার মূলে রহিয়াছে প্রকৃতির আর একটি মহান্ উদ্দেশ্য,—প্রজা সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এই পার্থক্য আছে বলিয়াই নর-নারীর মধ্যে আকর্ষণ আছে, ভালবাসা আছে। প্রকৃতি তাই জীবকে দুইটি সহজ সংস্কারের বশীভূত করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন; সংস্কার দুইটির একটির নাম ক্ষুধা, অন্যটির নাম যৌনাকর্ষণ। ক্ষুধার উপাদানদ্বারা মানুষ ব্যক্তিগতভাবে আত্মরক্ষা করে, যৌনাকর্ষণ দ্বারা সে জাতিগতভাবে বাঁচিবার চেষ্টা করে। যৌনাকর্ষণ না থাকিলে প্রজনন হইত না, প্রজনন না হইলে জীব-সংসার সমূলে বিনাশ পাইত। প্রজননের দ্বারাই মানুষ নিজেকে অমর করিয়া রাখে।

উভয়ের পার্থক্যের মুখ্য কারণ

মানুষ জন্মিয়াই প্রথমে নিজেকে ভালবাসিতে শিখে। এই আত্ম-কামের (Narcissism) চশ্‌মা পরিয়া সে দেখে যে, দুনিয়ায় রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শের পশরা যাহা কিছু আছে, তাহা তাহারই তৃপ্তি-বিধানের জন্য। মাতার স্তননিঃসৃত অজস্র ক্ষীরধারা, পিতার স্নেহগদগদ আদর-চুম্বন, ভ্রাতা-ভগিনীর আনন্দাবেগপূর্ণ প্রণয় প্রদর্শন—যেন তাহারই আত্মতুষ্টির প্রকৃতিপ্রদত্ত উপাদান মাত্র। জগৎ যে তাহাকে ভালবাসে, তাহা তাহার নিজের প্রতি নিজের ভালবাসার প্রতিধ্বনি মাত্র। স্বপ্রীতির বাহিরে কোন কিছুর সহিত আপন সত্তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের কল্পনা করাও তাহার পক্ষে যেন সুকঠিন।

প্রথমে আত্মপ্রেম

ক্রমশ বালক বা বালিকা নিজের বাহিরে বিরাট জীবরাজ্য—বিশাল জন-সমাজ হইতে নিজেকে স্বতন্ত্র দেখিতে শিক্ষা করে। সে যথাকালে উপলব্ধি করে যে, জগৎ তাহার জন্য নহে, সে জগতের জন্য ; ভাল না বাসিলে তাহার ভালবাসা পাওয়া যায় না, এই অক্ষয় রূপৈশ্বর্য—এই অতল প্রেম-পারাবারেরর মধ্যে ডুব্‌ দিতে গেলে আপন সত্তাকে ক্ষুদ্র বিন্দুর মধ্যে কেন্দ্রীভূত রাখিলে চলিবে না—উহাকে কেন্দ্রচ্যুত করিয়া বহির্মুখী করিতে হইবে। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে আপন সত্তার একটা প্রতিরূপ গঠন করিয়া লয় এবং ঐ প্রতিরূপের সঙ্গে যাহার সৌসাদৃশ্য আছে, তাহাকে ভালবাসে। এই ভালবাসা সাধারণত সমজাতীয় হইতে উদ্ভূত হইয়া, কালে বিষমজাতীয়ে পরিণত হয়; অর্থাৎ প্রথমত কিশোর কিশোরকে—কিশোরী কিশোরীকে ভালবাসে; পরে যৌবন-সমাগমে প্রেমভাজনের পাত্র-পরিবর্তন হয়। আত্মকাম, সমকাম, বিষমকাম—ইহাই হইল যৌনজীবনের প্রকৃতি-নির্ধারিত ক্রমিক বিবর্তন !

পরে সমজাতীয় ও বিজাতীয় প্রেম

এই বিবর্তন কিরূপ করিয়া ও কেন সংঘটিত হয়, তাহার উত্তরও জীবতাত্ত্বিক্ ও মনোবৈজ্ঞানিক দিয়াছেন বিশদ ও মনোজ্ঞভাবে।

স্ত্রী-পুরুষের আকর্ষণের মূল

কিন্তু তাহার আলোচনা করা বা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া এই পুস্তকের অব্যবহিত উদ্দেশ্য নহে। স্ত্রী ও পুরুষে কোন্ বিষয়ে কতখানি বিশেষত্বের অধিকারী, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করাও আপাতত এস্থলে খুব প্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেবলমাত্র উভয়ের যৌন-বোধ, যৌন-আবেগ ও যৌন-ক্ষুধার মধ্যে পার্থক্য কোথায়, তাহাই মোটামুটিভাবে আলোচনা করিবার জন্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের অবতারণা। বিষয়টিকে ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে দুইটি স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে সর্বদা স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিতে হইবে। প্রথমত—স্ত্রী-পুরুষের মনোগত ও দেহগত গঠন-বিন্যাস ও পরিস্ফুরণের মধ্যে যখন পার্থক্য আছে, তখন তাহার যৌন-বোধ, যৌন-আবেগ ও যৌন-ক্ষুধার মধ্যেও অবশ্য পার্থক্য থাকিবে; দ্বিতীয়ত—এই সকল পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে কতক কতক বিষয়ে সমরূপতা ও সামঞ্জস্য আছে। প্রকৃতিগত এই সামঞ্জস্য ও বৈপরীত্য আছে বলিয়াই স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি এরূপ ভাবে আকৃষ্ট হয়, এবং প্রকৃতির সেই পরম উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্ত পরস্পর যৌনসুখ-সম্ভোগার্থ সম্মিলিত হয়।

ওই সামঞ্জস্য ও বৈপরীত্যের কারণসমূহ অনুসন্ধান করিতে গিয়া, বিজ্ঞানবিৎ আর একটা সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। সে সত্যটি হইল এই যে, নর বা নারী ষোল আনা নরত্ব বা নারীত্ব লইয়াই পৃথিবীতে

নরের মধ্যে নারীত্ব ও নারীর মধ্যে পুরুষত্ব

জন্মগ্রহণ করে না; বিশ্বপ্রকৃতি সাধারণ নরের মধ্যে বেশীর ভাগ পুরুষত্ব ও অল্পাংশ নারীত্বের (ধরা যাউক, কমবেশী বারো-আনা-চারি-আনা পরিমাণে) বীজ উপ্ত করিয়া পৃথিবীতে পাঠান; সাধারণ নারীর

মধ্যে আবার ঠিক ইহার বিপরীত ব্যবস্থা করিয়া দেন *। স্বাভাবিক পরিবেশ ও বংশ-প্রভাবের আওতায় উভয় জাতীয় বীজই যথাকালে যথানুরূপ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহারা পুষ্ট হয়। পুরুষের সুবৃহৎ পুরুষত্ব-সহকার ঘেরিয়া তাহার নারীত্বের ক্ষীণ লতা হিল্লোলিত হইয়া উঠে; আর নারীর বিশাল নারীত্ব-সরসীর বুকে গুটি কয় পেলব পুরুষত্ব-পদ্ম শীর্ণ মৃণাল-শীর্ষে হিন্দোলিত হইতে থাকে। প্রত্যেক নারী বা নরের মধ্যে যেন হরগৌরী সম্মিলনের একটা বিসদৃশ প্রতীক্ জাগিয়া রহিয়াছে; সেইজন্য পুরুষের মধ্যে 'হরের' প্রতাপ বেশী, নারীর মধ্যে 'গৌরীর' প্রতাপ বেশী। প্রাণীর মধ্যে দুই জাতীয় উপাদানের সম পরিমাণ সংমিশ্রণ হইলে, স্ত্রী ও পুরুষ দুইটি পৃথক জাতির সৃষ্টি হইত না, হইত—'না-নারী-না-নর' একটা কিম্ভুতকিমাকার জীবের, হিজিড়া বা নপুংসক জাতীয় একটা কিছুর আবির্ভাব। উহাদিগকে পুরাপুরিভাবে উভলিঙ্গ (Hermaphrodite) বলা চলে। বৃক্ষরাজ্যে ও নিম্নশ্রেণীর কীটজগতে উভলিঙ্গতার দৃষ্টান্ত দুর্লভ নহে।

* "In this sense Weininger's theory applies, viz. that there is no absolutely male and no absolutely female individual: that in every man there is something of woman, and in every woman something of man, and that between the two various transitional forms, sexual 'intermediate stages' exist. Therefore, according to this view, every individual has in his composition so many fractions 'man' and so many fractions 'woman', and according to the preponderance of one set of elements or the other, he must be assigned to one or the other sex."—Iwan Bloch in SEXUAL LIFE OF OUR TIME, p. 39—40.

পুরুষ খুঁজে তাহার এক চতুর্থাংশ পুরুষত্ব নারীর মধ্যে, নারী খুঁজে তাহার এক চতুর্থাংশ নারীত্ব পুরুষের মধ্যে। এই দুই ভগ্নাংশ মিলিয়া পূর্ণ এক হয় বলিয়াই স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি এত আকর্ষণ। নারীর ভিতর পুরুষ আপনাকে সম্পূর্ণভাবে খুজিয়া পায়, আবার পুরুষের ভিতর নারী পায় আপনার পূর্ণসত্বাব সন্ধান। যাহার যেটির অভাব, তাহার সেটি কাম্য। সুতরাং নারী পুরুষের সহিত একাত্ম হইয়া তাহার অভাব মোচন করে। পুরুষও এইভাবে নারীর সহিত যুক্তাত্ম হইয়া তাহার বাসনা মিটায়। অন্য ভাবেও এই কথাটি প্রকাশ করা চলে। নর ও নারীর পরস্পরের মধ্যে যৌনবোধ যখন জাগ্রত হয়, তখন প্রত্যেকেই আপন ব্যক্তিত্বকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ফেলে; উপনিষদ-পুরাণের সেই পুরাতন কথা—"স ইমেবাত্মানং দ্বেধাপয়েত্‌...!" এই তথাকথিত অর্ধ সত্বার মধ্যেও থাকে ছয় আনা ও দুই আনা পরিমাণে পুরুষত্ব ও নারীত্বের মৌলিক তত্ব। সুতরাং উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যখন মিলিত হয়, তখন আট্ আনা পুরুষত্ব ও আট্ আনা নারীত্বের সংযোগ হইয়া, সত্যকার হরগৌরী সম্মিলন সুসাধ্য করিয়া তুলে। এইভাবে নর-নারী, সমত্ব ও বিষমত্বের মধ্য দিয়া, একে অন্যের নিকট প্রেয় ও প্রিয় হইয়া উঠে।

নর-নারীর একাত্মতা

কাজে কাজে এই কথাটা আমাদিগকে ভুলিতে বসিলে চলিবে না যে, আমরা প্রত্যেকেই প্রকারান্তরে দ্বিলিঙ্গাত্মক (Bisexual)। নর বা নারীর মধ্যে উভলিঙ্গতার উপাদানের স্বভাবসঙ্গত পরিমাণের তারতম্য ঘটিলে, আমরা তাহার দেহ ও মনোবৃত্তি-গঠনের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখিতে পাই। স্ত্রীলোকের গোঁফ্ উঠিয়াছে, পুরুষের গোঁফ্‌দাড়ীর

নর-নারী প্রত্যেকেই দ্বিলিঙ্গাত্মক

বালাই নাই; রমণীর পুরুষজনোচিত পেশীবহুল দীর্ঘ দেহ, সাহস ও ব্রীড়াহীন ব্যবহার, পুরুষলোকের নারীসুলভ সঙ্কোচনম্র ভাব, কোমল কণ্ঠস্বর ও চালচলন,—এরূপ দৃষ্টান্ত আমরা মাঝে মাঝে দেখিতে পাই। তাহার স্থূল কারণ খুঁজিতে আমাদিগকে এখন আর বেশী কষ্টকল্পনা করিবার প্রয়োজন হইবে না, বৈজ্ঞানিকগণ হাতের নিকটেই একটা সদুত্তর প্রস্তুত রাখিয়া দিয়াছেন।

শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুরুষেরও যেমন, স্ত্রীলোকেরও তেমনি। তথাপি পরিপুষ্টি, বৃদ্ধি ও সংগঠনের মধ্যে কিছু পার্থক্য রহিয়াছে।

উভয়ের দৈহিক সৌসাদৃশ্য

আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরের যৌনযন্ত্রের মধ্যে একটা সাধারণ সৌসাদৃশ্য ধরা পড়ে না বটে। কিন্তু পুরুষের মধ্যে স্ত্রীসুলভ জননযন্ত্রাদির এক একটা অপুষ্ট প্রতিরূপ রহিয়াছে; আবার স্ত্রীলোকের মধ্যে উহার বিপরীত ব্যবস্থা। যেমন স্ত্রীলোকের স্তনদ্বয়ের একটা অস্ফুট চিহ্ন পুরুষের দেহে আছে, তেমনি পুরুষের শিশ্নের একটা ক্ষুদ্রতম প্রতিমূর্ত্তি রমণীর জননযন্ত্রের উপরিভাগে সংলগ্ন রহিয়াছে—যাহার নাম ভগাঙ্কুর বা ভগপুচ্ছিকা (Clitoris)। এই ভগপুচ্ছিকা পুরুষের লিঙ্গের ন্যায় যৌনক্ষুধার সময় কঠিনাকার ধারণ করিয়া স্পন্দিত হয় এবং সঙ্গমকালে নিম্নাভিমুখী হইয়া ক্রমাগত পুরুষাঙ্গ-গাত্র স্পর্শ করিতে থাকে। পুরুষের অণ্ডকোষেরও প্রতিচ্ছবি আমরা খুঁজিয়া পাই স্ত্রীলোকের গর্ভকোষের (ovaries) মধ্যে। সময় সময় দেখা যায়, কোন কোন রমণীর ভগপুচ্ছিকা অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট (এমন কি কচিৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলির মতোও বড় হয়), আবার কোন কোন যুবকের পৌরুষচিহ্ন স্বভাবত নিতান্ত শীর্ণ ও দুর্বল। ইহার মুখ্য কারণ আর ব্যক্ত না করিলেও বোধহয় চলিবে।

স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে দেহগত সৌসাদৃশ্য ও বিসদৃশভাব সম্বন্ধে

আমাদের অল্পবিস্তর জ্ঞান সকলেরই আছে। একের শুক্রকীট, অন্যের ডিম্বাণু (ova), একের গর্ভে অন্যের গর্ভোৎপাদন, জরায়ুমধ্যে ভ্রূণের সৃজন ও যথাকালে জীবশিশুর প্রসব, চান্দ্রমাসিক ঋতুস্রাব ও তৎসহ স্বভাবসৃষ্ট সাময়িক বিক্ষোভ…প্রভৃতিদ্বারা উভয়ের মধ্যে কতখানি পার্থক্য, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি *।

এইবার উভয়ের মনোগত বিশেষত্ব সম্বন্ধে সাধারণভাবে দুইচারি কথা বলিয়া, আমরা মূল বিষয়বস্তুর গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিব। প্রথমতই

স্ত্রী-পুরুষের মস্তিষ্কগত পার্থক্য

বলিয়া রাখা ভাল যে, ভারতবর্ষীয় প্রধান জাতি কয়টির প্রতি পুরুষের মস্তিষ্কের গড়্‌পড়্‌তা ওজন কিছু কমবেশী ১৩৩৫ গ্র্যাম্‌ ও স্ত্রীলোকের প্রায় ১১৮০ গ্র্যাম্‌। আমাদের সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক চেষ্টা ও জ্ঞানগত ক্রিয়াশীলতার অবিসম্বাদিত কেন্দ্র হইল পুরঃকপাল (Frontal lobe)। এই পুরঃকপালের অন্তর্গত ধূসরবস্তু স্ত্রী-পুরুষের মস্তিষ্ক হইতে সংগ্রহ করিয়া, পৃথক পৃথক ওজন করিয়া দেখা হইয়াছে। পুরুষের পুরঃকপালের ওজন দাঁড়াইয়াছে ৪২৭ গ্র্যাম্‌, স্ত্রীলোকের ৩৮০ গ্র্যাম্‌,—পার্থক্য বেশ সুস্পষ্ট। এমন কি, সভ্যদেশের মেয়েদেরও পুরঃকপালের ওজন গড়্‌পড়্‌তা ৩৮৪র বেশী হইতে দেখা হইতে দেখা যায় না। পুরুষানুক্রমিক চর্চার ফলেও এই পরিমাপকে পুরুষের সমকক্ষ করা সম্ভবপর নহে।

* "As long as women are distinguished from men by primary sexual characters—as long, that is to say, as they conceive and bear—so long will they remain unequal to man in the highest psychical process."—Havelock Ellis in MAN AND WOMAN. p. 21.

নিছক্ জ্ঞানমার্গের দিক্ হইতে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সৃষ্টি-পরিকল্পনায়, সামঞ্জস্য-বিধানের ধীশক্তিতে, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনায় এবং সর্বোপরি বিচার-বিশ্লেষণমূলক মনোবৃত্তিতে পুরুষ স্ত্রীজাতিকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে সর্ববিধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার সুযোগ, সুবিধা ও অধিকার নারী এখনো ভাল করিয়া পায় নাই ; কিন্তু যেসকল দেশে নারী পঞ্চাশ বৎসরাধিক কাল পুরুষের সমান অধিকার পাইয়াছে, সেই সকল দেশের মনীষিগণ উভয়ের চিত্তবৃত্তি নিক্তির ওজনে পরিমাপ করিয়া উপরিলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন ; সুতরাং অধিকার বা সুবিধা-অসুবিধার অজুহাত দেখানো বিড়ম্বনা মাত্র *।

জ্ঞানগত ও মনোগত বিশেষত্বাবলী

যাহাহউক, অন্যদিকে আবার কোন বিদ্যা গ্রহণ বা জ্ঞান বোধ করিবার এবং তাহা অপরের নিকট বোধগম্য করিবার শক্তি পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের কম নহে। প্রফেসর ফোরেল্ বহু বৎসর যাবৎ জ্যুরিচ্ ইউনিভার্সিটির সংস্পর্শে থাকিয়া, যুবকযুবতীদিগের মেধা ও বিদ্যাবত্তার সহিত গভীরভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি পরীক্ষাস্থলে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন যে, একই শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট দুইটি

* "For a long time this was said to be explained by the statement that women had not the opportunity of measuring their intelligence against that of men ; but thanks to the modern movement of the emancipation of women, this assertion becomes more and more untenable. When certain people maintain that a few generations of activity suffice to elevate the intellectual development of women, they confound the results of education with those of heredity and phylogeny."—August Forel in THE SEXUAL QUESTION, p. 64-63.

ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ছাত্রটি অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করে; আবার ঐরূপ সর্বনিকৃষ্ট দুইজনের মধ্যে ছাত্রীটিই অধিকতর কৃতকার্যতা লাভ করে; ("The most intelligent men reproduce better and the most stupid men reproduce worse than the corresponding female extremes").

শিল্পকলা, সঙ্গীতচর্চা ও সুকুমার বিদ্যা-শিক্ষায় যুগযুগান্তর ধরিয়া পুরুষের অনুরূপ সুবিধা ভোগ করিয়া আসিলেও রমণী তাহাকে এখনও পরাস্ত করিতে পারে নাই; বরং এতদ্বিষয়ক মৌলিকতায় তাহারা পুরুষের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে! স্ত্রীলোকের মনোরাজ্যঘটিত পরীক্ষামূলক গবেষণায় অধ্যাপক জ্যাস্‌ট্রো লক্ষ্য করিয়াছেন যে, তাহাদিগের অধিকতর অনুরাগ জাগিয়া রহে তাহাদের সঙ্কীর্ণ ও প্রত্যক্ষ পরিবেশের মধ্যে; সম্পূর্ণ-করা ঘষামাজা জিনিষ, সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্য-বৃদ্ধির কৌশল, ব্যষ্টি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের প্রতি তাহাদের অধিকতর আগ্রহ। কিন্তু পুরুষের স্বভাব ঠিক ইহার উল্টা। দূরতর পরিবেশের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিতে তাহার আগ্রহ বেশী; যে জিনিষ নির্মিত হইতেছে, এখনো শেষ হয় নাই—তাহার প্রতি, কার্যকরী শিল্পবিজ্ঞানের প্রতি, সমষ্টির প্রতি ও অতীন্দ্রিয়গত বিষয়ের প্রতিই নরের কৌতূহল জাগে অনেক বেশী।

নিজের বা আত্মীয়স্বজনের কোন্ ছেলে-মেয়েটি কোন্ সালে—কি বারে—কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অথবা পাড়ার কোন্ বধূটির কত ভরির কি গহনা আছে—কোথায় তাহাদের বাপের বাড়ী, তাহা একজন সাধারণবুদ্ধিসম্পন্না স্ত্রীলোক যথাযথ বলিয়া দিতে পারেন; কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থের জন্য কোন্ মহিলা কোথায় কিরূপ সংগ্রাম করিতেছেন,—শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমলা লেক্‌চারে নারীর কোন

বিশিষ্ট রূপের উপর বক্তৃতা দিয়াছিলেন, ডাঃ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী দেবদাসী প্রথা উচ্ছেদের জন্য কি করিয়াছেন, অথবা মিসেস্ সুব্বারায়ণ্ জেনিভায় 'লীগ্ অব নেসন্সে'র বিগত অধিবেশনে কি উদ্দেশ্যে যোগদান করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে ওয়াকিব্‌হাল্ হইবার প্রয়োজনীয়তা বহু শিক্ষিতা মহিলাই অনুভব করেন না।

বাহিরের কর্মক্ষেত্রে রমণীরা ধরাবাঁধা কাজ (routine work) করিতে পুরুষলোকের ন্যায় পটু ; এমন কি, সাধারণ কেরাণীর কাজে তাঁহারা পুরুষ অপেক্ষা শ্রমশীল ও সন্তোষদায়িনী। কিন্তু যে কার্যে একটু বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালন করিতে হয়, যাহার সৌকর্যসাধন নিজ বিচক্ষণতার উপর নির্ভর করে, তাহাতে স্ত্রীলোক পশ্চাৎপদ। কায়িক শ্রমোৎপন্ন কর্মসমূহে স্ত্রীলোক যে পুরুষকে কোনক্রমে অতিক্রম করিতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

দয়া, মায়া, দ্বেষ, প্রীতি প্রভৃতি হৃদয়াবেগের ক্ষেত্রে রমণী পুরুষকে যথার্থ পশ্চাতে রাখিয়া চলে। সংবিৎ, সংস্কার, ভাবোন্মাদ ও সুকোমল বৃত্তিসমূহে স্ত্রীলোক সমধিক সমৃদ্ধিশালিনী। অধিকতর আবেগ-প্রবণতার জন্য তাহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষিপ্রতার সহিত দৈহিক ও মানসিক অঙ্কুশাঘাতে সাড়া দেয়। পুলক ও বেদনার অনুভূতি রমণী পায় অতি সহজে ; এবং ব্যাপকভাবে উহাদের ছাপও তাহার চিত্তবৃত্তির উপর আধিপত্য করে বহুকাল ধরিয়া। সর্ববিষয়েই তাহার স্মৃতিশক্তি অতিশয় প্রবল—বিশেষ করিয়া স্বার্থসম্বন্ধীয় ঘটনা সম্বন্ধে। হর্ষ-ক্লেশের উপলব্ধি পুরুষ হয়ত পায় রমণী অপেক্ষা গভীরতরভাবে, তথাচ উহার স্মৃতি তাহারা মনে অপেক্ষাকৃত অল্পদিন স্থায়ী হয়।

বাল্যকালে রমণীর মনে একবার যে সংস্কার বদ্ধমূল হয়, পরবর্তী জীবনের কোনরূপ শিক্ষা ও শাসনের বলে তাহাকে উৎপাটিত করা

সহজসাধ্য নহে। রমণীর ভাবপ্রবণতার গভীরতা অল্প বলিয়া অধ্যাত্মবাদ অপেক্ষা বস্তুতান্ত্রিকতার প্রতি তাহার আশক্তি বেশী। সেইজন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বর্গসুখের কল্পনা করা—মানসপটে বস্তুগত পরজীবনের চিত্রাঙ্কন করা নারীর পক্ষে স্বাভাবিক। সেইজন্য লোকাচার, দেশাচার, কৌলিক প্রথা, পূজাপার্বণ ও ধর্মের বহিরঙ্গ-প্রকরণের প্রতি নারীর আসক্তি অত্যধিক। হ্যাভলক্ এলিস্ দেখাইয়াছেন যে, জগতে একশতর মধ্যে নিরনব্বইটি ধর্মমূলক আন্দোলন নরের নিকট হইতে প্রাথমিক প্রেরণা লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু প্রথমত নারীরাই গড্ডালিকা-স্রোতের মত আসিয়া ধর্মপ্রতিষ্ঠাতাদিগের চরণোপান্তে আত্মনিবেদন করিয়াছে। তথাকথিত ধর্মের প্রতি অসংবরণীয় মোহ—নারী-প্রকৃতির একটা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। ইহাও এস্থলে এক কথায় বলিয়া যাওয়া উচিত যে, নারীর কামজীবন ও ধর্মজীবনের মধ্যে একটা অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ রহিয়াছে; এক মার্গ হইতে অন্য মার্গে পদবিক্ষেপ করিতে তাহাদের সময় লাগে পুরুষ অপেক্ষা অনেক কম।

ইচ্ছাশক্তিতেও রমণী পুরুষ অপেক্ষা উচ্চতর স্তরে বিদ্যমান। মানসিক বৃত্তির এই বিভাগটিতে নারী স্বচ্ছন্দে পুরুষের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে। তাই সচরাচর নারীর আকাজ্ক্ষা হয় দুর্দমনীয়, তাহার মতবাদ হয় দুর্নমনীয়, তাহার সাধনা হয় দুর্নিবার। মানুষ তাহার কঠোর শাসন ও বলবত্তর আইনের বেড়াজাল দিয়া নারীর মননক্ষমতাকে খর্ব করিবার চেষ্টা করিয়াছে বটে; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। পাশবিক বলে পুরুষ যখনই নারীকে জয় করিতে গিয়াছে, তখনই সে নারীর অপূর্ব কৌশলের নিকট মাথা নত করিয়া পরাজয়ের গ্লানি লইয়া ফিরিয়াছে। আত্মমর্যাদা রক্ষার উপায়-উদ্ভাবনী-শক্তিতে, আপন ইচ্ছার শিরে সফলতার কনক-কিরীট শোভিত করিবার অনাড়ম্বর কূটবুদ্ধিতে, নারী

পুরুষের নিকট অজেয়। পুরুষমানুষ তাহার ‘সামান্য’ ইচ্ছাশক্তিতে অধিক আবেগপ্রবণ, অস্থিরচিত্ত ও উগ্র; নিজের উদ্দেশ্যসাধনের পথে সে সৎ ও অসতের বিচারবুদ্ধি প্রায়ই হারাইয়া ফেলে, কাজেই সিদ্ধির মণি-ময়ূখ হইতে কখনো কখনো সে দূরে সরিয়া যায়। নারী সহজাত-দিব্যদৃষ্টি (intuition), আত্মাববোধ ও স্থিরবুদ্ধিদ্বারা প্রায় ক্ষেত্রেই ভালমন্দ চিনিবার একটা সুন্দর ক্ষমতা লাভ করে বলিয়া, সর্বপ্রযত্নে ভালকে কাজে লাগাইয়া ও মন্দকে এড়াইয়া চলিয়া, সে আপন সাধনপন্থা অপেক্ষাকৃত সুগম ও সরল করিয়া লইতে পারে।

পুরুষ হইতে তাহারা যে দেহমনে দুর্বল, এ ধারণা প্রত্যেক রমণীরই আছে,—এমন কি, আধুনিক সভ্যতালোকপ্রাপ্তা মুক্তপক্ষ বিহঙ্গিনীবৎ স্বাধীনা পুরুষ-বিদ্রোহিণী মহিলাদেরও। তাহা সত্বেও সৃষ্টিরাজ্যে তাঁহাদের প্রয়োজনারতার পরিসর ও পুরুষ অপেক্ষা কোন্ কোন্ বিষয়ে তাঁহারা অধিকতর পারদর্শী, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা অতিশয় প্রখর। সেই-জন্য পুরুষের মনোরঞ্জন করিয়া, এমন কি তাহার দাসত্ব করিয়াও তাহাকে জয় করার মধ্যে তাঁহারা খুঁজিয়া পান্ একটা সুনিবিড় আত্মপ্রসাদ; দুর্বলও যে সবলের নিকট স্থলবিশেষে অনিবার্য হইয়া উঠে—এই অনুভূতিতে তাঁহারা পান আনন্দাভিভূত হইবার একটা অপরূপ উপাদান। প্রেম একটা যজ্ঞ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু জীবনটা যে একটা যুদ্ধ, সে বিষয়ে ত আর কোন সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য ভাবুকগণ কিন্তু প্রেম ও যুদ্ধকে প্রায় পাশাপাশি স্থাপন করিয়াছেন, এবং এই দুই ক্ষেত্রেই কোন কার্য যে অন্যায় নহে—তদ্বিষয়ে অনন্যমত হইয়াছেন। যাহা হউক, যুদ্ধকালে বলে যখন কার্যোদ্ধারের সম্ভাবনা থাকে না, তখন কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সাধুতায় যত সংগ্রামে জয়লাভ হইয়াছে, গায়ের জোরে তাহার অর্ধেকও হয় নাই। নারী-

প্রকৃতির মধ্যে তাই দেখি, কৌশল, ছলনা ও চাতুরীর একটু অভিনয়-সুলভ আতিশয্য। সংসার-সমরে ইহাই তাঁহাদের পরম ও চরম অবলম্বন।

চাণক্যের রাজনীতির মধ্যে একটা প্রধান উপদেশ হইল—"মনসা চিন্তিতং কর্ম, বচসা ন প্রকাশয়েৎ"। নারী এ উপদেশ সর্বক্ষেত্রেই স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া পালন করিয়া আসিতেছে। সেইজন্য নারী-মনের নাগাল্ পাইতে আমাদিগকে এত বেগ পাইতে হয়; তাহার চিন্তারাজ্যে বা ভাবজগতে প্রবেশ করার সাধ্য অতিবড় ধ্যানী পুরুষেরও কতখানি থাকিতে পারে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মন্ত্রগুপ্তি-রক্ষার ক্ষমতা স্ত্রীলোকের অসাধারণ। তাই রাজনীতিক্ষেত্রে নারী অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছে। শাসনকার্যে তাঁহাদের দূরদৃষ্টি, গভীর চিন্তা-শীলতা ও অসামান্য বিচারবুদ্ধির পরিচয় পুরুষের অনুরূপ পাওয়া না গেলেও, ন্যায়নিষ্ঠা, শৃঙ্খলাজ্ঞান, বীরত্ব, আত্মসম্মানবোধ, বিদ্যোৎসাহিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে তাঁহারা কখনো কুণ্ঠিত হন্ নাই। মেরী, ক্যাথারিন্, এলিজাবেথ, রাজিয়া, রাণী ভবানী, চাঁদবিবি, অহল্যাবাঈ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত এ বিষয়ে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে। ইঁহাদের রাজনৈতিক চিন্তার ধারা বা অদূরভবিষ্যতের কার্যক্রমের আভাষ মাত্র—তাঁহাদের নিকটতম আত্মীয় বা একান্তসমর্পিতপ্রাণ প্রেমিকও কখনো জানিতে পারে নাই।

রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের যতগুলি অপরাধ এযাবৎ বিচারাধিকরণের গোচরীভূত হইয়াছে, তাহার প্রায় সকলগুলির মধ্যেই নারীর প্রত্যক্ষ সহানুভূতি বা অসাক্ষাৎ অনুপ্রাণনা ছিল, অথচ বিস্ময় কোনটিতেই তাহার বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। আমাদের দেশে সন্ত্রাস-বাদীদলের কতকগুলি অপরাধের বিচার-কালে, যুবক আসামী রাজসাক্ষী

হইয়াছে বটে ; কিন্তু মৃত্যুদণ্ডের উদ্যত খড়্গ মাথার উপরে দোদুল্যমান জানিয়াও কোন যুবতী সমগ্র দলকে সংশ্লিষ্ট করিয়া অকপট স্বীকারোক্তি পর্যন্ত করিতে কদাপি রাজী হয় নাই। বিগত মহাযুদ্ধের সময় জার্মাণী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও ইটালীর গুপ্তচর-বিভাগে বহু রমণী নিযুক্ত হইয়াছিল, এ কথা ঐতিহাসিক সত্য। Ibanez-লিখিত "Mare Nostrum" (মারে নোস্‌ক্রম্)-এর ফ্রেয়া চরিত্র যে নিছক্ আকাশকুসুম নহে, ঈক্ষণীকা মাতাহরিই তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।

স্বমতপ্রতিষ্ঠার একটা শান্ত, সংযত অথচ সুনিশ্চিত প্রয়াস, আত্মবিশ্বাসের প্রতি অনন্ত নির্ভরতা, আপন অধ্যাত্মরাজ্য সম্বন্ধে একটা মহিয়সী আত্মগোপনতা—নারীকে আমাদের নিকটতম করিয়াও যেন দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। তাই নারীর সৃষ্টিশক্তির সূক্ষ্মজাল অন্তরের যে নিভৃততম প্রদেশটিতে বুনা হয়, তাহার মধ্যে পুরুষের জ্ঞানবুদ্ধির আলোকপাতের সকল চেষ্টাই এযাবৎ ব্যর্থ হইয়াছে। তাহার প্রকৃতি এমন একটা জটিলতা—এমন একটা রহস্যের কুহেলি দ্বারা আবৃত যে, সমগ্র সৌরজগতের গতিভঙ্গির মধ্যে লীলায়িত কেন্দ্রীয় নীতির মতোই তাহা যেমন দুর্বোধ্য, তেমনি দুর্ভেদ্য।

নারীত্বের করুণা-সলিলে অভিষিক্ত হইয়া সমগ্র জীব-জগৎ বাঁচিয়া আছে, শুধু বাঁচিয়া নাই—ক্রমোন্নতির সোপানশ্রেণী বাহিয়া উঠিবার শক্তি লাভ করিয়াছে। তাহার দানের পরিচয় আমরা হৃৎস্পন্দনের প্রতি তালে পাই, কিন্তু তাহার গ্রহণের পরিজ্ঞান সহজে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না—তাহা এমনি সূক্ষ্ম, এমনি নীরব, এমনি শান্ত। তাহার শাসন ও অধিকারের দাবীও স্নিগ্ধ, মধুর ও নির্বন্ধাতিশয্যময়। সেইজন্য নারীকে পুরুষ-প্রকৃতির মাপকাঠি দিয়া বিচার করিতে গেলে, অনেক সময় ভ্রান্তির গর্তে পড়িয়া মরিতে হয়।

গ্রীক্ ও লাতিন্ সাহিত্যে একটি শব্দের দ্বারাই (pupillae, kopai) 'তরুণী' ও 'আঁখিতারকা'—এই উভয় অর্থ প্রকাশ করা হয়। আমাদের ভাষায় তারা বলিতে আমরা নক্ষত্রও বুঝি, আবার দশ-মহাবিদ্যার অন্তর্গত অন্যতমা দেবীও বুঝি—যাহা নারীরূপেরই একটা প্রতীক মাত্র। মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রধানতম অংশ হইল চক্ষু। তাহার কেন্দ্রে বৈদেশিক কবিরা নারীর আসন-পীঠ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—'নারী নাচে পুরুষের আঁখির তারায়' ("A young girl was to be found in every man's eye"). কি চমৎকার কৌশলে নারী আমাদের আঁখি-তারকার মধ্যে থাকিয়া মোহন তুলিকা বুলাইয়া বিশ্বজগৎকে আমাদের নিকট সুন্দরতর করিয়া তুলে, কি ভাবে পুরুষকে সর্বস্ব দিয়া চাবিকাটিটি নিজের অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিয়া দেয়, কি যাদু দিয়া সে পুরুষকে 'হারাই হারাই সদা ভয় পাই, হারাইয়া ফেলি চকিতে'—এই ভাবধারা অভিভূত করিয়া ফেলে, তাহা ব্যক্ত করিতে গিয়া দার্শনিক নীৎসে নিজেই অব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

বাস্তবিকপক্ষে নারীর বাহিরের অবগুণ্ঠন তাহার দুর্জ্ঞেয় তমসাবৃত অতল অন্তরেরই symbol. সংস্কৃত অভিধানে 'মায়া' স্ত্রীপ্রকৃতির সূক্ষ্মতত্ত্ব বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গ; 'মোহ' পুরুষস্বভাবের অংশীভূত বলিয়া পুংলিঙ্গ। মোহের শেষ আছে, মায়ার শেষ নাই—উহা অনাদি, অনন্ত। তাই জনৈক জার্মান্ দার্শনিক (von Hippel) স্ত্রী-পুরুষের প্রকৃতি-পরিচয় একটি পংক্তিতে বড় মনোজ্ঞভাবে দিয়াছেন—"Woman is a comma, man a full-stop." পুরুষের প্রকৃতি অধ্যয়ন করিতে গিয়া, আপনি কোথায় আছেন-তাহা বুঝিতে পারেন; বুঝিতে পারেন যে, তাহার গোড়ায় আছেন, না মধ্যবর্তী স্থলে আছেন, না শেষে পৌছিয়াছেন; কিন্তু স্ত্রীলোকের বেলায় সর্বদাই

আপনাকে মনে করিতে হইবে—এখনো কিছু অধীত হইতে বাকী রহিয়াছে *।

নরনারীর প্রেম-জীবন ও যৌনবোধ সম্বন্ধে জ্ঞানও এই একটি ছত্রের নীতির মধ্য দিয়াই সুন্দর পরিস্ফুট করা যায় † !

* "With men, you know where you are—you have come to an end; but with woman there is some thing more to be expected." —Iwan Bloch in SEXUAL LIFE OF OUR TIME, p. 79.

† "The woman, having first to discover the man's love, will try to conceal her own emotion in the innermost recesses of her bosom lest the lover discover her feelings prematurely. The woman is, therefore, a comma in love affairs, the man is a full-stop; here, you know where you are; there, read further."—Dr. B. S. Talmey in LOVE, p. 156.

দ্বিতীয় প্রপাঠ

স্বাভাবিক যৌনবোধের মাপকাঠি

হাতুড়ে, কবিরাজী ও হেকিমি ঔষধওয়ালাদিগের অজস্র ঔষধ-পরিচয়-পুস্তিকা ও পঞ্জিকায় প্রদত্ত বিজ্ঞাপনে, পুরুষের যৌন-দুর্বলতা ও জননেন্দ্রিয় বিষয়ক নানাবিধ রোগের মনগড়া, বিকৃত নাম ও বিবরণ প্রচুর পরিমাণে তবু পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার যৌন-জীবনের স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থা কিরূপ—তাহার মোটামুটি একটি আদর্শই বা কেমন, তৎসম্বন্ধে কোনো আলোচনাই কাগজে বা মজলিসে প্রণালীবদ্ধভাবে চলিবার অবসর এ দেশে ঘটিয়া উঠে নাই। তবে এক-এক শ্রেণীর অল্প সংখ্যক বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে পর্দার আড়ালে অতি সংগোপনে ফিস্ ফিস্ করিয়া প্রায় এই সম্বন্ধে কিছু কিছু কথাবার্তা এবং হো হো করিয়া কিছুক্ষণের জন্য হাসাহাসি চলে বটে। কিন্তু তাহার মধ্যে চাল অপেক্ষা কাঁকর বেশী থাকায়, ঐ জ্ঞান পরিপাকের সহায়তা না করিয়া অযথা একটা বিষম বদ্‌হজমের সৃষ্টি করে।

স্ত্রীলোকের যৌনজীবন ও যৌনবোধের সুস্থতা বা স্বাভাবিকতা নির্ধারণ করা যত কষ্টসাধ্য, পুরুষের ক্ষেত্রে ততটা কষ্ট স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না। তথাপি সভ্যতার আলো পুরুষ যত বেশী পাইতেছে—ততই কাম-জীবনে তাহার বৈচিত্র ও বিপর্যয় অত্যন্ত বেশী করিয়াই ধরা পড়িতেছে; তদুপরি তাহার যৌন-শক্তিরও তারতম্য ঘটিতেছে। একটি বস্তুকে তখনই স্বাভাবিক বলিব, যখন সে তাহার গঠন-ধর্মের সকল ধারাগুলি মানিয়া চলে এবং তাহার বিভিন্ন উপাদানগুলির কর্ম-

ক্ষমতার গণ্ডীকে তাহার প্রকৃতি আপন গতি-পথে ডিঙ্গাইয়া চলে না। যখনই সে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করে, তখনই তাহাকে অস্বাভাবিক না বলিয়া উপায় নাই।

স্বাভাবিক মানুষ তাঁহাকে বলিব না, যিনি একটা নির্দিষ্ট আদর্শমতো দৈহিক গুরুত্ব ও দৈর্ঘ-প্রস্থতা কিংবা মানসিক প্রসার লইয়া সংসারে টিকিয়া আছেন। স্বাভাবিক বলিব তাঁহাকেই, যাঁহার দেহমনোরাজ্যে এমন একটা পরিস্থিতি বিদ্যমান—যাহার মধ্যে থাকিয়া তিনি তাঁহার সত্বার প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া ও তাহার নির্দেশ মানিয়া স্থিতিবৃদ্ধিজনক কার্যগুলি স্বচ্ছন্দে সাধন করিয়া যাইতে পারেন। শুধু দৈহিক বা মানসিক সংশ্লেষণে একটা নির্দিষ্ট পরিমাপ অনুযায়ী হইলেই যে স্বাভাবিক হওয়া যায় না, তাহার একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দিলেই এ সত্যটি ভালো করিয়া হৃদয়ঙ্গম হইবে।—বলিষ্ঠ ও পুষ্ট কলেজের ছাত্রদের মধ্যেও পৌরুষ-উত্তেজনাহীনতা দেখা যায়;—পালোয়ানদের মধ্যেও রমণাশক্ত ব্যক্তির অভাব নাই।

স্বপ্রকৃতির সর্ববিধ প্রয়োজন বা ক্ষুধা মিটাইবার জন্য, স্বাভাবিক ব্যক্তির শারীরিক ও আধ্যাত্মিক এমন অবস্থার অস্তিত্ব চাই যে, তাহা স্থান-কাল-পাত্রের পরিবেশের সহিত—সৃষ্টিসংবিধানের নিত্য পরিবর্তনের সহিত অল্পবিস্তর উপযোগীকৃত হইতে পারিবে এবং সামাজিক রীতিনীতি ও বিশ্ব-প্রাকৃতিক আইনের সহিত আপনাকে মানাইয়া লইয়া চলিতে পারিবে।

প্রত্যেক ব্যক্তির এই প্রয়োজন-সাধক সামর্থ বিভিন্ন বাহ্য বা অন্ত-প্রাকৃতিক পরিস্থিতির মধ্যে কমবেশী হইতে পারে। যেমন, একজন ষোল বৎসর বয়স্ক কিশোরের যে সামর্থ, একজন ষাট্ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের সে সামর্থ নিশ্চয়ই নাই; অথচ এই দুই জনের প্রত্যেকেই স্ব-স্ব পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সুস্থ বা স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন।

ছোটনাগপুরের ওঁরাও নামক পার্বত্য জাতি যদি আজ উত্তর মেরু

প্রদেশস্থ এস্কিমোদের সঙ্গে বাসস্থান অদলবদল করে, তাহা হইলে কেহই কোন দেশে গিয়া আরামে বাস করিতে পারে না। তারপব যদি উভয় জাতির মধ্যে বিবাহ-প্রথা চালানো যায়, তাহা হইলে বর ও বধূর মানসিক প্রগতি, অভ্যাস, আচার-ব্যবহার লইয়া রীতিমত কলহ, মারামারি লাগিয়া যাইবে। সূতার বাঁধন পড়ে বটে, প্রাণের বাঁধন আল্গা থাকিয়া যায়। আবার এই দুই জাতির কতকাংশকে যদি জার্মান দেশে লইয়া বসতি স্থাপন করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে সভ্য সমাজের আদব-কায়দার দাবী মিটাইতে কোন জাতিই সমর্থ হইবে না।...

সকল মানুষের যৌনবোধ বিষয়ে একটা সাধারণ বাটখারা চল্‌তি করা বড় দুঃসাধ্য ব্যপার। খবরের কাগজে, মাসিক পত্রের গল্পে, অন্তরঙ্গের মজ্‌লিসে, যৌন সংযোগ ও লিপ্সার যে সকল চিত্তাকর্ষক সংবাদ পাওয়া যায়, তাহার সকলগুলি যদি বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করি এবং ঐ ঘটনাসমূহের দ্বারা যদি আমরা কোন প্রকারে প্রভাবান্বিত হইয়া পড়ি, তাহা হইলে আমাদের অনেক সময় এই সিদ্ধান্তই মনে জাগিবে যে, ঘটনা-বর্ণিত চরিত্রগুলিই বুঝি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং আমরাই একান্ত অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া আছি! কিন্তু অনেক দেখিয়া, শুনিয়া, পড়িয়া এবং বহু লোকের জীবনেতিহাসের রহস্য-কন্দরে প্রবেশাধিকার পাইয়া, শীতল মস্তিষ্কে বসিয়া আমরা এই মীমাংসা করিতে পরিয়াছি যে, পৃথিবীর বেশীর ভাগ লোকই যৌনবোধ ও যৌন-জীবন বিষয়ে অল্পাধিক অসুস্থ বা অস্বাভাবিক, এবং সভ্য সমাজে অতি সামান্য সংখ্যক স্বাভাবিক মানুষই বিদ্যমান। যাহাহউক, আমরা পুরুষ ও নারীর বাল্য হইতে বার্ধক্য পর্যন্ত জীবনকালক্রমের যৌনবোধ ও লালসার একটা অতি সাধারণ রেখাচিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিব। উহাকে মানচিত্র বলিলেও বোধহয় বিশেষ অতিশয়োক্তি হইবে না।

তৃতীয় প্রপাঠ

বাল্যে যৌনবোধের স্বাভাবিক বিকাশ

অনেকের বোধহয় জানা নাই যে, মানবের যৌন-জীবনের আরম্ভ হয় তাহার জীবন-উন্মেষের সূত্রপাত হইতে। বাল্যকালে তাহার যৌন-প্রকৃতি যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া শরীরের সর্ব অঙ্গে ও কর্মেন্দ্রিয়ে ওতপ্রোত থাকে। মদনের পঞ্চ বাণ যেন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে উদ্দেশ্যহারা হইয়া এলোমেলোভাবে ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে; বরং মুলাধারে যে বাণটি থাকে, সেইটিই সর্বাপেক্ষা নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করে। তাই, আমরা দেখিতে পাই, সুস্থ শিশু অতিরিক্ত চঞ্চল, ক্রীড়াশীল ও উদ্দাম; উপস্থ ছাড়া অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আবশ্যকাধিক পরিচালন করিয়া, সে যেন তাহার অজ্ঞাত অসংহত যৌনলিপ্সার অসাক্ষাৎ চরিতার্থ সাধন করে। তারপর কৈশোরের মধুপগুঞ্জন সুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে, মনসিজ তাঁহার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পঞ্চ বাণ ধীরে ধীরে কুড়াইয়া, মাজিয়া-ঘষিয়া, তূণে আনিয়া একত্রিত করেন। তখন যৌন-জীবনের যুগ-যুগ-আরাধ্য 'রভস বসন্ত', তাহার অজস্র রূপ-রসের ডালি সাজাইয়া লইয়া, মানস-নিকুঞ্জে উদিত হয়!

শৈশব ও বাল্যকাল

যতদিন নর-শিশু অসহায়ভাবে বিছানায় প্রাকৃতিক বেগ বর্জন করে, ততদিন তাহার কোন বালাই নাই। কিন্তু, মনোবিশ্লেষণ-বিদ্যার জনক অধ্যাপক্ ফ্রয়েড্ বলেন যে, স্তনবৃন্ত চোষণ ও দংশন-লব্ধ সুখের মধ্যেও শিশুর যৌনবোধরূপী

বিভিন্ন কামকেন্দ্র

সর্পশিশু লুকাইয়া থাকে। ক্ষুধার তৃপ্তি হইলেও শিশু স্তনবৃন্ত চুষিয়া বা দংশন করিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসে কেন?—অস্ফুট অসংজ্ঞাত যৌনক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য! ক্রমশ চুষিকাঠি, রবারের চুবি বা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চুষিয়া সে আপনা আপনি এই দ্বিতীয় ক্ষুধার তৃপ্তিসাধন করে। সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে অবশ্য এই মতবাদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিবার উপায় নাই। যাহা হউক, মোট কথা, জন্মলাভের পর শিশুর কামকেন্দ্র অধিষ্ঠিত হয়—মুখে, পরে বিবর্ত্তিত হয়—গুহে। তারপর যখন সে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিতে অভ্যাস করে, তখন পিতামাতা উপদেশ না দিলেও নিজের সুবিধার জন্য ইন্দ্রিয়টি আপন হস্তে ধৃত করিতে শিখে। প্রত্যহ প্রতিবার প্রস্রাবের সময় এই অঙ্গটি তাহাকে তুলিয়া ধরিতে হয়, এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই দর্শন ও স্পর্শনেন্দ্রিয়-দ্বারা উহার সহিত শিশুর ঘনিষ্ঠ পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অভ্যাসের পর অতি ধীরে ধীরে তাহার কামকেন্দ্র গঠিত হইয়া উঠে—মূত্রনালীতে।

শিশুর আদি কামকেন্দ্র ওষ্ঠে বা মুখে

ইতঃপূর্বেই বলিয়া লইয়াছি যে, শিশুর প্রেম-জীবন আরম্ভ হয় আত্মকাম লইয়া। শিশুর জন্মক্ষণ হইতেই আত্মকামের আরম্ভ এবং ছয় সাত বৎসরের পূর্বে উহার অবসান হয় না। কেহ কেহ শৈশবে প্রেমজীবনের আরম্ভের কথা শুনিয়া হয়ত অবিশ্বাসের হাসি হাসিবেন। কিন্তু ঔদরিক ক্ষুধা ও যৌন ক্ষুধা যখন মহাবীর কর্ণের সহজাত কবচকুণ্ডলের মতোই মানুষের সহজসংস্কার (instinct) বলিয়া স্বীকৃত, তখন এ সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা সমীচীন হইবে কি? প্রথম ক্ষুধাটি থাকে অবশ্য পত্রপুষ্পে সুশোভিত বৃক্ষরূপে শিশুর মধ্যে আস্তৃত; দ্বিতীয়টী বীজরূপে ইহার সন্নিকটে প্রোথিত থাকিয়া, ইহারই মূল হইতে রস টানিয়া নিজের প্রাণশক্তিতে অক্ষুণ্ন রাখে এবং পুষ্টির পথে

চুপিসাড়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। স্বীয় প্রাণমৃত্তিকার স্বভাবদত্ত রস ও উর্বরাশক্তি ছাড়া বাহির হইতে কৃত্রিম সার প্রয়োগের ফলে, যৌনক্ষুধার বীজ অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে অঙ্কুরিত হইতে পারে বটে ; তবে একথা সত্য যে, কাম বলিতে লৌকিক ব্যবহারে আমরা যে অর্থ বুঝি, তাহা শিশুর ওই আত্মকামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। উহা যতদূর সম্ভব অস্পষ্ট, অস্ফুট্, ব্যাপক ও অতনুগত হইয়া থাকে। এই কাম খুব বেশী ভাবগতও নহে, অথচ যৌনেন্দ্রিয়ে কেন্দ্রীভূতও নহে। ঔদরিক ক্ষুধার রসে পরিপুষ্ট বলিয়া, তাহার সহিত ইহার মিতালি বড় ঘনিষ্ঠ ; তাই মনোবিশ্লেষক উভয় ক্ষুধার আদি প্রশমন-কেন্দ্র নির্ধারণ করিয়াছেন ওষ্ঠে বা মুখগহ্বরে। তাই তাঁহারা বলেন, প্রেমজীবনের এত বড় হৃদ্য উপাচার 'চুম্বন'—তাহা আহারেরই পরিমার্জিত প্রতীক্।

শিশু পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র লইয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয় ; তৎসহ, সাংখ্যদর্শন মতে, অবশ্য পঞ্চভূত, পুরুষ বা প্রকৃতির অংশ, মন ও অহঙ্কার ত থাকেই। জন্মের অব্যবহিত

জন্মকালীন্ মূলধন

পরে শিশুর মধ্যে মন বা বুদ্ধিবৃত্তি এক প্রকার সুপ্ত অবস্থায় থাকে বলিয়া, তাহার অহংজ্ঞান সমধিক শক্তিশালী না হইয়া পারে না। এই অহংতত্ত্বকে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ আখ্যা দিয়াছেন egoism বলিয়া. এবং এই egoর সহিত নিত্য তন্ত্ব-ভাব ও 'আমি আছি বলিয়াই জগৎ আছে', 'আমার তুষ্টিতে জগতের তুষ্টি', 'জগতের প্রতি আমার ভালবাসা—আমার প্রতি আমার ভালবাসার বিচিত্র প্রতিচ্ছবি'···এই সকল জ্ঞানের উপরই "আত্মকাম" বা 'Narcissism'এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

শিশুর কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রথমেই সচেষ্ট হয়—বাক্ অর্থাৎ মুখ এবং

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু। জন্মিয়াই সে কাঁদিয়া উঠে, তাহাতে বাগেন্দ্রিয় সচেষ্ট হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় কর্মেন্দ্রিয়ের গৌণ উদ্দেশ্য প্রথম শ্বাসগ্রহণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধিত হয়। নাসিকার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল যুগপৎ ক্রিয়া —গন্ধগ্রহণ; সে উদ্দেশ্যের জন্য উহা প্রস্তুত হয় আরও কয়েক দিন পরে। ক্রন্দন ও শ্বাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সে চক্ষু মেলিয়া চায়—চাহিয়া এক স্বপ্নলোকের রূপৈশ্বর্যের মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন দেখে। রূপের পরে সে পায় রস—মাতৃস্তননিঃসৃত অনাস্বাদিতপূর্ব ক্ষীরধার; তখনো মুখই ঐ রসগ্রহণের জন্য অগ্রসর হয় এবং জিহ্বা পিচ্‌কারীর নলদণ্ডের মত শোষণে সাহায্য করে। জিহ্বার স্বাদগ্রহণের ক্ষমতা নবজাত শিশুর মধ্যে তত ভাল করিয়া পরিস্ফুট হয় না; ইহার ইচ্ছাধীন নিয়ন্ত্রণ অথবা সূক্ষ্ম রসবোধশক্তি সে সময়ে থাকে না বলিলেই হয়।

যাহাহউক, শিশুর ক্ষুন্নিবৃত্তির সংস্কার সর্বপ্রথম স্তন্যপানের মধ্য দিয়া তাহাকে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শের সহিত যুগপৎ অল্পবিস্তর পরিচয় ঘটাইয়া দেয়। মাতার স্তনদ্বয় অথবা মাতৃমূর্তি সে সর্বপ্রথম দেখে; মাতার স্তন্য সে সর্বপ্রথম আস্বাদন করে; স্তন্যদান-কালে নিজ মুখোত্থিত চোষণ-শব্দ অথবা মাতার সোহাগবাণী সে প্রথম শ্রবণ করে; মাতৃগাত্র-নিঃসৃত অথবা মাতৃবক্ষোজাত গন্ধ সে প্রথম গ্রহণ করে এবং মাতার করকমলদ্বয় তাহাকে বুকের নিকট টানিয়া আনিয়া প্রথম স্পর্শানুভূতি দান করে। ভাবিয়া দেখুন, পরবর্তীকালে এই পঞ্চ তন্মাত্রের যুগপৎ সম্মিলন ও অনুভূতির মধ্য দিয়াই মানুষের যৌনক্ষুধার ও পরিতৃপ্তিসাধন হয়। এতদুপলক্ষে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ও একসঙ্গেই অল্পবিস্তর চেষ্টাবান্ হইয়া উঠে। উপনিষদ তাই নারীসঙ্গম সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানকে "পঞ্চাগ্নিবিদ্যা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন * এবং হিন্দু পৌরাণিক কবিগণ মদনদেবকে পঞ্চবাণে বিভূষিত করিয়াছেন।

* বৃহদারণ্যকোপনিষদ্; ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ২য় ব্রাহ্মণ, ৩৯১।১৩।

শৈশবে কর্মেন্দ্রিয়ের প্রথম চারিটি—বাক্, পাণি, পাদ্ ও পায়ু—প্রায় সম-সময়েই সচেষ্ট হয়। উপস্থের গৌণ উদ্দেশ্য অবশ্য মূত্রনিঃসারণের দ্বারা চরিতার্থতা লাভ করে বটে; কিন্তু তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য—যৌনসম্ভোগ ও প্রজননক্রিয়ার্থ বিনিয়োগ—সাধনের জন্য তাহাকে যৌবনোন্মেষ পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে হয়।

দর্শন ও স্পর্শন

যৌনাবেগ বিশ্লেষণ করিলে তাহার মূলে সর্বপ্রথমেই ধরা পড়ে—দৃষ্ট কোন সম বা বিষমজাতীয় জীবকে স্পর্শ করিবার আকাঙ্ক্ষা। যাহাকে কখনো চর্মচক্ষে দেখি নাই, অথবা যাহার সম্বন্ধে আমার কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই, তাহাকে কখনো ভালবাসিতে পারি না। আবার যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে কাছে পাইতে—তাহার স্পর্শসুখ উপভোগ করিতে ইচ্ছা করে। বৈষ্ণব কবির সেই-যে চিরস্মরণীয় ছত্র—'প্রতি অঙ্গ লাগি মোর প্রতি অঙ্গ ঝুরে'—তাহা স্পর্শলাভেরই উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষায়। বাস্তব প্রেমের প্রথম ধাপ হইল—দর্শন, পরবর্তী ধাপ হইল—স্পর্শন। আকৃষ্টি, সঙ্কল্প, মনন বা চিন্তন, চেষ্টা বা অধ্যবসায় প্রভৃতি এস্থলে ইচ্ছা করিয়াই উহ্য রাখিলাম। তারপর বিশেষ বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঘর্ষণ অথবা যৌনসংযোগ,—সে ত পরের কথা, রীতিমত পরিণতির অবস্থা!

আপাতত আমরা প্রেমকে পবিত্র অর্থাৎ যৌনলিপ্সা-পরিশূন্য অর্থেই প্রয়োগ করিতে চাহি। শিশু মাতা কিংবা মাতার প্রতিনিধিকে দেখে ও চেনে; পরে তাঁহাকে নিকটে পাইতে ইচ্ছা করে। সকল সময়ে ক্ষুধার জন্যই শিশু কাঁদে না। ক্ষুধার জন্যই হউক বা অন্য কারণেই হউক, শিশু যখন কাঁদে, তখন মাতা নিকটে আসিলেই তাহার ক্রন্দনের উদ্যত ফণা নিমেষে স্তিমিত হইয়া পড়ে; কোলে করিয়া গায়ে হাত বুলাইলে বা সস্নেহ করাঘাত করিলে, সে পরম আনন্দের আবেশে অনেক সময়ই ঘুমাইয়া পড়ে। প্রবল আত্মকামের প্রভাব পরিপুষ্ট হইয়া স্বার্থের

খাতিরে শিশুসন্তানের মাতা বা পিতার প্রতি যে আকর্ষণ, তাহা মূলত স্পর্শসুখেরই সকাতর ভিখারী ।...

শৈশব বা বাল্যকালে শিশুর মধ্যে যে যৌনক্ষুধা অপরিণত, বিমিশ্র অথবা তুরীয় অবস্থায় লুকায়িত থাকে, তাহা ঈষৎ সচকিত হইয়া জাগৃতির মৃত্তিকায় পদসঞ্চার করে—যখন পিতামাতার উপর একান্তনির্ভরতা তাহার কমিয়া আসে এবং আত্মকামের শাসনকবল হইতে সে মুক্ত হইয়া পড়ে। তখন সে সমকামের (Homosexuality) নিকট কবুলতি লিখিয়া দিয়া তাহাকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করে। সমকামের প্রতাপ সচরাচর অক্ষুন্ন থাকে সারা বাল্যকাল অর্থাৎ ছয় সাত বৎসর বয়স হইতে কৈশোরের শেষাশেষি পর্যন্ত। তারপর প্রতীয়মানত সে 'দেউলিয়া' অথবা ধীরে ধীরে নির্জীব হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে বালিকাদিগের কৈশোর (puberty) আরম্ভ হয় বারো বৎসর অন্তে এবং শেষ হয় পনেরো বৎসরে ; বালকদিগের আরম্ভ হয় চৌদ্দের শেষাশেষি এবং শেষ হয় সাড়ে সতের বা বড়জোর আঠার বৎসর বয়সে। তারপরই যৌবনের উন্মেষ।

আত্মকামের উপসংহার

সমকামের লৌকিক অর্থ হইল সমজাতীয়ের প্রতি সমজাতীয়ের আকর্ষণ, অর্থাৎ পুরুষের প্রতি পুরুষের এবং নারীর প্রতি নারীর প্রণয়াবেগ। ইহার মধ্যেও স্পর্শনের আকাঙ্ক্ষা উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে সত্য,—পরবর্তী যৌনজীবনে পরিদৃষ্ট অন্যান্য মানসিক বৃত্তিগুলি সাধ্যবস্তুকে ঘেরিয়া স্ফুটনোন্মুখ হইয়া উঠে, তাহাও সত্য ; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে "কামগন্ধ নাহি তায়" অর্থাৎ যৌনসম্মিলন অর্থে আমরা যাহা বুঝি, তাহার আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দীপনা সাধারণত ইহাতে অনুপস্থিত থাকে। কৈশোরের ছত্রে।তে সমকামের মধ্যে পশুবৃত্তির উন্মেষ হইতে পারে বটে ; কিন্তু প্রায়শ দৈহিক অসুস্থতা বা বাহ্য

সমকামের বিষফল

কার্যকারকতার প্রভাবে উহার এরূপ অকালবোধন ঘটে। তখন সমকামকে আমরা বলি "সমমেহন" (homosexual practice).

বাল্যকাল ব্যাপিয়া আত্মকাম ক্রমশ নির্জীব হইয়া পড়িলেও কৈশোরের প্রারম্ভে সে যৌনেন্দ্রিয়ের প্রতি জীবসত্বার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া ও তাহার মধ্যে একটা অপ্রাকৃত উত্তেজনা জাগাইয়া, মরণ-কামড় কাম্‌ড়াইবার প্রয়াস পাইতে পারে। এই উত্তেজনা প্রশমনের কায়িক চেষ্টার নাম "স্বমেহন" বা "পাণিমেহন" (Masturbation). এ অভ্যাসও বাহ্য প্রভাব বা দৈহিক অসুস্থতার আনুকূল্যে অতি সহজে বিগঠিত হইতে পারে। স্বমেহন ও সমমেহন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা অধ্যায়ান্তরে করা হইবে।

আত্মকামের বিদায়-অভিশাপ

অধ্যাপক মোলের মতে, চৈতন্যগত যে আবেগগুলি দিয়া যৌন প্রবৃত্তি গঠিত, তাহার মধ্যে প্রধানতম দুইটি আবেগের একটি হইল,—অপরলিঙ্গাত্মক কোন ব্যক্তির সহিত সংস্পর্শের ইচ্ছা (the impulse of contrectation); আর একটি আবেগ হইল,—এই সংস্পর্শের দ্বারা একটা বিশিষ্ট বস্তুগত ও নাড়ীগত * নিষ্কৃতিদানের ইচ্ছা (the impulse of detumescence). কোন ইচ্ছা বা প্রবণতাকে প্রকৃতপক্ষে আবেগে পরিণত করিতে গেলে, দুইটি গুণের আবশ্যক হয়:—প্রথম গুণটি কথিত ব্যক্তিকে এমন একটি কার্যে উদ্যোগী করিবে—যাহা

মোলের যৌনসংস্কার-বিশ্লেষণ

* Nerve এর প্রচলিত অর্থ আমরা 'স্নায়ু' বলিয়া ধরি; কিন্তু হওয়া উচিত 'নাড়ী'। বৈদ্যকশাস্ত্রে যেসকল স্থলে নাড়ী শব্দের ব্যবহার আছে, তত্তৎস্থলে প্রায়শ প্রাশ্চাত্য বিজ্ঞানের nerve এর তাৎপর্য বুঝায়। আয়ুর্বেদের 'বায়ু'কে অবশ্য কেহ কেহ nervous activity বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। নাড়ীতন্ত্র আমাদের দেহযন্ত্রের Telegraphic system. আমাদের ইন্দ্রিয়গত জ্ঞানসমূহ সর্বশরীরে আস্তৃত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নাড়ীতন্ত্রের সাহায্যেই মস্তিষ্কে নীত হয়, আবার দেহের বাহ্যাভ্যন্তরে সর্বপ্রকার পেশী-প্রচেষ্টার মূলেও এই নাড়ী।

ন্যায়শাস্ত্র বা হিসাব-নির্ণয়ের বিধান মানিয়া চলিতে নারাজ ; দ্বিতীয় গুণটি —ঐ কার্যসমাধান কালে কথিত ব্যক্তিকে উহার অব্যবহিত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সজাগ করিয়া দিবে। যৌন প্রবৃত্তি যে আবেগদ্বয় দিয়া প্রধানত তৈয়ারী, তাহাদের মধ্যে এই গুণযুগলের অভাব নাই। বলা বাহুল্য, যৌনপ্রবৃত্তি-প্রশমনক্রিয়ার 'অব্যবহিত উদ্দেশ্য'—আপনার সুখবোধ ; 'দূরতর উদ্দেশ্য'—অংশীদারের সুখসৃষ্টি এবং এই যুক্তসুখের সমুদ্রমন্থন করিয়া নবজীবনের সমুদ্ধার !

পূর্বেই বলিয়াছি, বালক বা বালিকার সমকামের মধ্যে তথাকথিত পাশবিক কাম না থাকিলেও, স্পশনাবেগ বহুলাংশে বিদ্যমান থাকে। ঐ

সমকামের অসম্পূর্ণতা

স্পর্শদ্বারা একটা নাড়ীগত নিস্তারসাধন (nervous discharge) হইতে পারে ; কিন্তু বস্তুগত নিঃস্রাব (অর্থাৎ শুক্রপাত) হয় না কিংবা যৌনেন্দ্রিয়গত সংযোগও ঘটে না। স্ত্রী-সংসর্গ সম্বন্ধে এ বয়সে কোন ধারণা না থাকাই স্বাভাবিক। কুসংসর্গে-পড়িয়া, জীবজন্তুর সঙ্গম সন্দর্শনে বা বংশানুক্রমিকতার (hereditary trait) প্রভাবে এ সম্বন্ধে বালকের মনে একটা কৌতূহল জাগিয়া উঠিতে বা ভাগবত একটা মোটামুটি জ্ঞান জন্মিতে পারে সত্য ; কিন্তু তন্নিমিত্ত আন্তরিক প্রণোদনা খুব অল্প ক্ষেত্রেই আসিতে দেখা যায়। কৈশোরের পূর্বে বীর্যজনন অসম্ভব বলিয়া বস্তুগত নিঃস্রাবের (material discharge) দ্বারা আবেগ প্রশমনের কথাই উঠিতে পারে না। তদুপরি, সমলিঙ্গাত্মক জীবের প্রতি এই আকর্ষণ স্বাভাবিক বিবর্তনের একটি ক্রম বলিয়া গণ্য হইলেও প্রকৃতির সৃষ্টিতত্ত্বের পরিপন্থী ; এজন্য উহা আত্মকাম অপেক্ষা এক ধাপ উচ্চতর হইলেও উহারই ন্যায় অসম্পূর্ণ।

যাহাহউক, সমকামী বালক বালকেরই সংসর্গ ভালবাসে এবং এককালে একটি বালককে অপেক্ষাকৃত বেশী পছন্দ করে—এ কথা সত্য। পাঠশালায়

বা বিদ্যালয়ে সেই বালকটির পাশে বসিতে সে ভালবাসে, তাহার সহিত একত্র পড়িতে, একত্র খেলিতে, একত্র বেড়াইতে ও গল্প করিতে তাহার বাসনা সদাই উন্মুখ হইয়া থাকে। ইহা তাহার সংস্পর্শাবেগেরই যে ফল—তাহা বলা বাহুল্য। বাল্যপ্রেম যখন ঘনীভূত হয়, তখন বড় জোর তাহারা চুম্বন ও আলিঙ্গন পর্যন্ত অগ্রসর হয়, তাহার পরে আর অগ্রসর হয় না—অগ্রসর হইতেও জানে না। ফ্রয়েডের মতবাদী

আদ্যানন্দ ও অন্তানন্দ

পণ্ডিতগণ প্রেমের বস্তুগত ব্যবহারকে স্থূলভাবে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; চুম্বন, আলিঙ্গন, চোষণ প্রভৃতি ক্রিয়াগুলির তিনি নাম দিয়াছেন fore-pleasure বা 'আদ্যানন্দ', ও প্রকৃত যৌনসংযোগের নাম দিয়াছেন end-pleasure বা 'অন্তানন্দ'। বয়স্ক ব্যক্তির প্রেম-ব্যাপারে আদ্যানন্দ যত নিবিড় হয়, অন্তানন্দ তদনুপাতে তত গভীর হয়। কিন্তু বালকবালিকার সমকামের পরিণতি ঐ তথাকথিত আদ্যানন্দ পর্যন্ত; তাহাদের আদি-অন্ত ঐ চুম্বনালিঙ্গন, পরস্পরের স্কন্ধে আরোহণ, পরস্পরকে উত্তোলন বা পরস্পরে কৃত্রিম 'কোস্তাকুস্তি'র মধ্যেই সন্নিবদ্ধ *।

যে দেশে বা যে সমাজে বালক-বালিকার একত্র অধ্যয়ন, একত্র কালযাপন ও একত্র সংমিশ্রণের অধিকতর স্বাধীনতা আছে, সে দেশেও

* "The end-pleasure is intensified the better accordingly as the fore-pleasure prepares for it. The fore-pleasure creates the wish for more. But in children there is no end-pleasure. The products of the sex-glands which are expelled with orgasm do not yet exist. The pleasure of the child, therefore, cannot be divided into fore- and end-pleasure. What satisfies the child, for example, kissing and caressing—changes its significance and becomes fore-pleasure after puberty."—Fritz Wittels in CRITIQUE OF LOVE, p. 52.

ছয়-সাত বৎসর হইতে তের চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত বালকগণ কদাচিৎ বালিকাকে ভালবাসিতে শিখে। বরং প্রকাশ্যে বা গোপনে তাহারা এই সময় বালিকাদিগকে ঘৃণা করে এবং সাধ্যমত এড়াইয়া চলে। সামান্য অজুহাতে তাহারা সমবয়স্কা ও কনিষ্ঠা ভগ্নী অথবা প্রতিবেশী-কন্যাদিগকে শাসন—অথবা শাসনের নামে নিপীড়ন করে; ইহার মধ্যে তাহারা যেন একটা গর্বমিশ্রিত আনন্দ উপভোগ করে। বালিকাদিগের সহিত একত্র শয়ন-ভোজন-ক্রীড়াদি করিলেও, তাহাদিগের প্রতি বালকের প্রায়ই কোন আকর্ষণ জাগে না। এই সময় বালকের প্রতি বালিকার জাগে একটা কৌতূহল—একটা বিস্ময়, বালিকার প্রতি বালকের জাগে একটা সংশয়—একটা প্রভুত্বের ভাব। কেন তাহা এখনি বলিতেছি। যদি কখনো কোন বালক অনুকূল ঘটনার আতিশয্যে কোন বালিকাকে ভালবাসিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহার মধ্যে একদিকে যেমন গভীরতা থাকে না, অন্যদিকে তেমনি লজ্জার ভাব থাকে না।

বাল্যে বালিকার প্রতি মনোভাব

কৈশোর বা যৌবনে যৌন-উত্তেজনা স্বাভাবিকভাবে উদ্বুদ্ধ হইবার বহু পূর্বেই পুরুষ-শিশু তাহার ইন্দ্রিয়ের উত্থানশীলতা সম্বন্ধে সজাগ হয়। তারপর গৃহে যদি কোন বালিকা থাকে, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য-বোধ অতি সহজেই পুংশিশুর মনের মণিকোঠায় জন্মগ্রহণ করে। তদুপরি, প্রস্রাবের সময় সে আপন ইন্দ্রিয় কর-ধৃত করিবার সুবিধা ভোগ করে, অথচ স্ত্রীশিশু (অসাধ্য ও অপ্রয়োজনীয় বিধায়) সে অধিকারে বঞ্চিত—এই সিদ্ধান্ত করিবার শক্তি তাহার মস্তিষ্কে উদ্ভূত হইতে দেরী লাগে না; এবং প্রধানত এই বিশিষ্ট চিন্তার ফলে পুরুষ-শিশুরা স্ত্রী-শিশু অপেক্ষা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ লবয়িা সর্বপ্রথম জ্ঞান করিতে সুরু করে।

স্ত্রী-শিশু ও পুরুষ-শিশু মীনকেতনের বাণ ও তূণ সম্বন্ধে সুগভীর অজ্ঞতা লইয়া জন্মাইলেও, স্ত্রী-শিশু অপেক্ষা কিছু পূর্বেই পুরুষ-শিশুর আপন 'তূণ' সম্বন্ধে অর্ধস্ফুট বোধ-শক্তি দ্রুততর জন্মাইতে দেখা যায়। যত শীঘ্র হোক্, আপনার পুরুষত্বের গর্বকে জয়ী ও জাহীর করা—খোকাদের যেন স্বভাবগত ধর্ম। পেনী বা ফ্রক্ ছাড়াইয়া পুরুষ-শিশুকে যখন পাঁচ হাতি ধুতি বা হাফ-প্যাণ্ট্ পরাইয়া দেওয়া হয়, তখন সে যে 'ব্যাটা-ছেলে'—সে সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা তাহার মনের মধ্যে গাঁথিয়া যাইতে দেরী লাগে না। তখন যদি তাহাকে 'মেয়ে' বা 'খুকী' বলিয়া নির্দেশ করা হয়, তাহাহইলে তাহার ক্ষোভ, অভিমান, আপত্তির আর অন্ত থাকে না! সে-যে 'পুরুষ'—এই সত্যপ্রতীতি জন্মাইতে, সে যে-কোন বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে।

প্রায় হিন্দু-বালকেরই 'অগ্রচ্ছদা' বা পুংযৌনেন্দ্রিয়ের অগ্রভাগের চর্মটি (prepuce or foreskin) থলির গুটানো মুখের মত আবদ্ধ অবস্থায় থাকে। অথচ উহার নিম্নে প্রস্রাবের ময়লা, 'শিশ্ন-বসা' প্রভৃতি সঞ্চিত হইয়া মাঝে মাঝে চুল্‌কাইতে থাকে। সেইজন্য অনেক সময় শৈশবে অনাবশ্যকভাবে ইন্দ্রিয়োত্থান ঘটে। বহুক্ষেত্রে Phimosis, Balanitis প্রভৃতি রোগাক্রমণে স্থানীয় প্রদাহ উপস্থিত ও মূত্ররোধ হইয়া শিশুর জীবন সংশয়াপন্ন করিয়া তুলে। তখন সামান্য অস্ত্রোপচার দ্বারা অগ্রচ্ছদা কাটিয়া শিশ্নমুণ্ডটি (glans penis) উন্মুক্ত করিয়া দিতে হয়। এই উপসর্গসমূহকে এড়াইবার জন্যই মুসলমান-সমাজে 'সুন্নৎ' এবং ইহুদী ও গোঁড়া রোমান্‌ক্যাথলিক্ সমাজে circumcision-প্রথা প্রচলিত আছে।

অগ্রচ্ছদা

বাল্যকালে সুন্নৎ হইলে ভবিষ্যৎ-জীবনে কি কি সুখ-সুবিধা পাওয়া যায়, তাহা অপ্রাসঙ্গিক হলেও মাত্র একটিরই উল্লেখ এস্থানে করিয়া যাইব।

অগ্রচ্ছদাবৃত শিশ্নমুণ্ড অত্যন্ত সংবেদনশীল বা ঘাত-কাতর হয়; সেইজন্য নারী-সহবাস-কালে প্রথম প্রথম পুরুষের কথঞ্চিৎ শীঘ্র বীর্যস্খলন হইয়া যায়। সাধারণত অগ্রচ্ছদাহীন লিঙ্গ অপেক্ষাকৃত কিছু বেশীক্ষণ রতিরণে যুঝিতে পারে। বস্তুত এই কারণেই কামচতুরা রমণীগণ, ইহুদী বা মুসলমান্ পুরুষদিগকে এত পছন্দ করেন। কিন্তু কর্তিতাগ্রচ্ছদা পুরুষের একটা মহৎ অসুবিধা আছে। বাল্যকাল হইতে শিশ্নমুণ্ড খোলা থাকায়, উহার বেদনাবোধ-শক্তির সঙ্গে সঙ্গে সুখবোধ-শক্তিও কমিয়া যায়। সুতরাং রমণ-কালে উঁহারা অপেক্ষাকৃত অল্প সুখ বোধ করেন।

তদুপরি মূত্রস্থালী (Bladder) অত্যন্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলে, কাপড়ের সহিত বা কোলে উঠিয়া শরীরেব সহিত একটু কঠিনভাবে ঘর্ষণ লাগিলে কিংবা উপুড় হইয়া শয়নের অভ্যাস করিলে, প্রায়শ বালকদিগের ইন্দ্রিয়োন্নন সংঘটিত হইতে দেখা যায়। সোহাগ-বশে অথবা শাসনকল্পে শিশুর জঙ্ঘা বা নিতম্বে ক্রমাগত আঘাতের ফলে তাহার উপস্থ-

সঙ্কোচন-বিস্তারণের কৌতূহল

স্থিত কামকেন্দ্র অতি সহজে উত্তেজনশীল হইয়া পড়িতে পারে। যে-কারণে হউক, এইরূপ অবস্থায় পৌছিলে, কখনো স্বাভাবিক কৌতূহল বশত, কখনো বা অগ্রচ্ছদার নিম্নদেশে কণ্ডূয়নেচ্ছা বশত শিশু হাত দিয়া অগ্রচ্ছদা উন্মুক্ত করিবার চেষ্টা করে এবং অনেক সময় অতি সত্বর কৃতকার্য হয়। বাল্যকাল হইতে বহু শিশুই অগ্রচ্ছদার সঙ্কোচন-বিস্তারণে একটা ক্ষীণ অনির্বচনীয় পুলক অনুভব করে; কেহ কেহ আবার এই সময় শুক্রনিঃসারণের প্রাকৃতিক প্রেরণার অভাব-নিবন্ধন, শুক্রাভাবে প্রস্রাব-নিঃসারণ দ্বারা উত্তেজনা প্রশমিত করে।

প্রস্রাব করিবার সময় ব্যতীত অন্য সময় ইন্দ্রিয় লইয়া নাড়া-চাড়া করিলে বা অগ্রচ্ছদা সঙ্কোচনের চেষ্টা করিলে, পিতা-মাতা বা আত্মীয়-

স্বজনের নিকট শিশু তিরস্কার বা প্রহার লাভ করে। কিন্তু তাহাতে তাহার কৌতূহল প্রদমিত থাকে না,—বরং সে মনে করে—ইহা একটা রহস্যময় বস্তু, যাহা লইয়া ক্রীড়া করা প্রকাশ্যে অনুচিত (পরন্তু অপ্রকাশ্যে নিষিদ্ধ নহে)! তখন গোপনতার আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া আর উপায় থাকে না।...এমন অনেক ক্ষেত্র দেখা গিয়াছে, যেখানে অনেকগুলি প্রায়-সমবয়স্ক বালক মিলিয়া বাগানে বা গৃহান্তরালে গিয়া, গভীর আনন্দাভিনিবেশের সহিত পরস্পরের ইন্দ্রিয়-পরীক্ষায় অথবা সতেজে মূত্রবর্জন ক্রিয়ায় নিমগ্ন,—তাহা লইয়া পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতাও চলে।...এইগুলি পুরুষ-শিশুর যৌন-জীবনের বাহিক বৈশিষ্ট। এমনি করিয়া কাহারো কাহারো অকালে কাম-বোধনের অস্ফুট উষালোক উন্মেষিত হইয়া উঠিতে পারে।

অভিভাবকের তিরস্কারের ফল

চতুর্থ প্রপাঠ

যৌনজ্ঞানে অকালপক্কতার প্রণালীসমূহ

জননেন্দ্রিয়ের প্রতি একটা অতিরিক্ত কৌতূহল অত্যন্ত অল্প বয়স হইতেই শিশু-মনে নীড় বাঁধে। বিশেষত সর্বদা যে জিনিষটিকে সংগুপ্ত রাখিবার জন্য প্রত্যেকে প্রাণপণ চেষ্টা করে, সেই জিনিষটার রহস্যান্তরাল আবিষ্কার করিবার ইচ্ছা ও উদ্যম মানবের সহজাত সংস্কার।…জননী শিশুকে লুকাইয়া যে

অজ্ঞতা-জয়ী আগ্রহ

খাবারের ঠোঙাটি সযত্নে ছিক্কার উপর তুলিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া দেন, শিশু-মন শত ধমক ও প্রহারের ভয় উপেক্ষা করিয়া, তাহারই মর্মস্থলে পৌঁছিবার একাগ্র উৎকণ্ঠায় ঘুরিয়া মরে—'লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা বারংবার ফিরে মুদ্রিত পদ্মের কাছে!' মাতা নিশ্চিন্তে গৃহকর্মে রত থাকেন; শিশু চেয়ারের উপর টুল্ রাখিয়া অতি সন্তর্পণে তাহার উপর উঠিয়া, ঢাকা উঠাইয়া দেখে—তাহার মধ্যে কি কি খাবার আছে। যে খোকা শুধু দেখিয়াই তৃপ্ত হইবার নহে, সে দুই চারিখানি তুলিয়া লইয়া, রসনার রস-নিবৃত্তি করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। পরদিন সকালে মাতা ঢাকা তুলিয়া দেখেন—তাঁহার অজ্ঞাতে সন্তানের নাগালের বহির্দেশস্থিত খাদ্যভাণ্ডারে বেমালুম চৌর্যবৃত্তি সাধিত হইয়াছে। '‘ভাবের ঘরে চুরি’র মতো, এরকম ভাণ্ডার-ঘরে চুরি তো বড় কম অপরাধ নহে!

কিন্তু এমনি করিয়াই পিতা-মাতার অজ্ঞাতে তাঁহাদের দুধের বাছারা গোপনতার যবনিকা তুলিয়া, নিগূঢ় জ্ঞান-ভাণ্ডারে চুরি করিতে উন্মুখ,

উন্মত্ত হয়,—কখনো চেয়ার হইতে পড়িয়া পা মচ্‌কাইয়া ফেলে, কখনো হয়ত ছিক্কার উপরে হাত চালাইতে কৃতকার্য হয়, কখনো আবার খাবারে হাত দিতে গিয়া বোল্‌তার কামড়ে কাঁদিয়া আকুল হয়। কিন্তু নগ্ন সত্যকে শ্লীলতার আবরণে ঢাকিয়া রাখিলেও সে মানা মানে না—বাধায় বিহ্বল হয় না।

অধ্যাত্ম-জগতে শিশুর যৌন জ্ঞান-লাভাকাঙ্ক্ষার চতুর্দিকে যেমন সামাজিক ও পারিবারিক রক্তচক্ষুর দৃষ্টি জড়ানো থাকে, আধিভৌতিক পরিমণ্ডলে তেমনি শিশ্নমুণ্ডটি (glans penis) প্রকৃত-প্রদত্ত অগ্রচ্ছদার চর্মদ্বারা ঢাকা থাকে। এই উভয় জগতেই এমন একটা সময় আসে, যখন এই লৌকিক বা বাহ্যপ্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা দূর করিবার জন্য তাহার সত্তার মধ্যে সর্বজয়ী একটা চেতনা—একটা সংবেদনা—একটা উন্মাদনা রণরণিয়া উঠে; তখন যে উৎস-মুখ হইতেই হোক্ তাহার পিপাসা প্রশমিত করিতে চেষ্টা করে। খুস্কীপূর্ণ মাথা চুল্‌কাইয়া উঠিলে মাথা চুল্‌কান হইতে শিশুকে নিবৃত্ত রাখা যদি সম্ভব, কিন্তু তাহাকে যৌনযন্ত্র সম্বন্ধে ভাবগত ও বস্তুগত ধারণালাভের স্পৃহা হইতে নিবৃত্ত রাখা সম্ভবপর নহে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

স্থানীয় কোন উপসর্গ না জন্মিলে, পুরুষ-শিশু সচরাচর বাল্যবস্থায় যৌন জ্ঞান-লাভের জন্য সাধারণত অতি চঞ্চল হয় না বটে; কিন্তু এই অকালপরিপক্কতা বহু পরিমাণে নির্ভর করে কুল-সংক্রামণ বা বংশপরম্পরাগত গুণের উপর। যাহার পিতা বা মাতা অথবা পিতা-মাতা উভয়ে যৌন-রসাস্বাদ অতি অল্প বয়সেই লাভ করিয়াছেন, তাহার মনে অকালেই একটা স্বাভাবিক যৌনস্পৃহা জাগিয়া উঠিতে পারে; এবং সামান্য আভাস, ইঙ্গিত বা সুযোগের ক্ষেত্র পাইলে, ঐ প্রসুপ্ত

যৌনজ্ঞানে পক্কতা বংশানুক্রমিক

প্রবৃত্তি প্রবল আকারে প্রকাশ পায়। বাল্যকালে বিবাহিত ও কৈশোরে সম্প্রযুক্ত পিতা-মাতার সন্তান অকালপক্কতার বীজ রক্তের মধ্যে লইয়াই জন্মগ্রহণ করে; এবং এইরূপ দম্পতির পরবর্তী সন্তানেরা উত্তরোত্তর বেশী অকালপক্কই হইতে থাকে। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমাদের দপ্তরে আছে।

তারপর এই অকালপক্কতা বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে—অন্যান্য অভিজ্ঞ সঙ্গীদের সহিত মিশিয়া। পিতামাতার সম্প্রয়োগের দৃশ্য দেখিয়া, তিনি চারি বৎসরের শিশুর মনে যৌন-কৌতূহল সহসা জাগিয়া উঠিতে পারে; এবং ঐ ছবির প্রতি নিমেষের দৃষ্টিপাতে তাহা তৎক্ষণাৎ তাহার অবচেতন মনের উপর চিরতরে মুদ্রিত (infantile fixation) হইয়া যায়। শত শাসন-অনুশাসনের সাবান-জলে সে দাগ আর উঠে না। রাত্রিকালে বেগবর্জনের নিমিত্ত জাগরিত পাঁচ বৎসরের শিশু, লণ্ঠনের স্তিমিত আলোকে, অসতর্ক পিতা-মাতার রতি-ক্রিয়া সন্দর্শনান্তর, কৌতূহলের-বশবর্তী হইয়া পাড়ার কোন ক্ষুদ্র বালিকার উপর উহার বিনিয়োগ করিতে যত্নবান হইয়াছে,—এইরূপ উদাহরণ সত্যকার জীবন হইতে আহরণ করিয়া দিতে পারি। বলাবাহুল্য, শিশুদের ধারণা-শক্তি যেমন প্রখর, অনুকরণপ্রবৃত্তিও সেইরূপ প্রবল।···

প্রায় সকল বালকই বাস্তব কাম-চরিতার্থতার দীক্ষা গ্রহণ করে—কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বা ঐ সম্বন্ধে সামান্য অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়কারী কোনো সমবয়স্ক বন্ধুর নিকট হইতে। সকল জ্ঞানের রাজ্যেই সেই এক ব্যবস্থা! এ জগতে সকলেই গুরু হইবার বা সাজিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করে। যে জ্ঞানে বা কর্মে মানুষ সুখানুভূতি পাইয়াছে, তাহা প্রচার করিবার স্পৃহা মানুষের স্বভাবধর্ম। কিন্তু সদ্‌গুরু যেমন আছেন, বদ্‌গুরুরও তেমনি অভাব নাই।

এমন অনেক বয়স্ক ব্যক্তি আছেন—যাঁহারা কচি বালকদিগকে যৌন-জীবনের কদর্য অভ্যাসগুলি শিখাইয়া দিয়া গভীর তৃপ্তি অনুভব করেন।

বয়োবৃদ্ধের নিকট হাতেখড়ি

এই সকল ব্যক্তি-যে সকল সময়ে অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা নিম্নপদস্থ হন্ কিংবা স্ত্রী-সঙ্গ-সুখ-বঞ্চিত থাকেন্—এমন কোনো ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। এই প্রবৃত্তি তাঁহাদের বিকৃত রুচি, অস্বাভাবিক মন ও রুগ্ণ দেহ-বিধানের পরিচয় দেয়। এ সম্বন্ধে পরে আরো কিছু আলোচনা করিব।

স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা, প্রোষিত-ভর্তৃকা বা বিরহোন্মাদিনী যুবতী বা বয়স্থা বিধবাগণও সময়ে সময়ে বালক বা কিশোরদিগকে যৌন-জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা দান করেন—এরূপ ঘটনা আমাদের দেশে বিরল নহে। ইহার দ্বারা গর্ভ-সঞ্চারের আশা নিবারিত হয়, লোকের সন্দেহ-বীজও অঙ্কুরিত হয় না এবং তাঁহাদের সুনামের হানি হইবার কোনো আশঙ্কা থাকে না। এরূপ অনেকগুলি ঘটনার বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

লেখকের জনৈক সহপাঠী (এম-এ পাশ করিয়া অধুনা কোনো স্বাধীন ব্যবসায় নিযুক্ত আছেন,) তাঁহার নিকট অকপটে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, চতুর্দশ বৎসর বয়ক্রম-কালে তিনি প্রতিবাসিনী কোনো বর্ষিয়সী বিধবার নিকট যৌন-সম্মিলন-কর্মে সর্বপ্রথম দীক্ষিত হন্। লেখকের পল্লীগ্রামস্থ কোনো দূর আত্মীয়, ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, পিতৃগৃহে অবস্থিতা কোনো বিবাহিতা যুবতী কর্তৃক ঐ ভাবে আমন্ত্রিত ও শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া স্বীকারোক্তি করিয়াছে।...

খুলনা জেলার নিভৃততম পল্লীর কোনো নিঃস্বা মধ্যবয়স্কা বিধবা তাঁহার স্বামীর ভিটায় সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালাইতে একাকিনী বাস করিতেন।

চূড়ান্ত নমুনা পার্শ্বের বাটীর দেবর-পুত্র সম্পর্কীয় একাদশ বৎসর বয়স্ক কোন জ্ঞাতি-বালককে রক্ষকরূপে লইয়া তিনি রাত্রে শয়ন করিতেন। বৎসর দুই নির্ঝঞ্চাটে যায়। তারপর মদনের শাসন সমাজের অনুশাসনকে ভ্রুকুটি-ভ্রুভঙ্গ করিতে আরম্ভ করে। ছেলেটি সঙ্গীদের নিকট হইতে অবশ্য যৌনবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু ভাবগত জ্ঞান লাভ করিয়াছিল। আত্মীয়া রমণীর রাগোদ্দীপক উপচারসমূহ অর্ধঘুমঘোরে সে প্রথমে স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ মনে করিতে করিতে ক্রমশ তাহাদের অন্তরের অন্তরাল দেখিতে পাইল। রমণী যখন উদ্যোগী হইয়া বালককে নিদ্রিত-জ্ঞানে তদ্দ্বারা সম্প্রয়োগের বাসনা মিটাইয়া লইতেন, তৎকালে সে জাগিয়া প্রথম কয়েকদিন মৃতের মতো পড়িয়া থাকিত, ভয়ে-বিস্ময়ে-আবেগে তাহার সমস্ত সত্তা স্তব্ধশ্বাস হইয়া রহিত। তারপর পরস্পরের চৌর্যবৃত্তি পরস্পরের নিকট একদিন ধরা পড়িয়া গেল; এবং তদবধি স্বচ্ছন্দে নিরঙ্কুশভাবে পারস্পরিক সম্মতিতে উভয়ের রিরংসা-যজ্ঞে প্রাত্যহিক আহুতি-দান চলিতে লাগিল।

কিন্তু অপ্রত্যাশিত ঘটনাই ঘটিয়া গেল! চতুর্দশ বৎসর বয়স্ক বালকের স্বচ্ছ তৃপ্তি-নির্ঝরে বিষাক্ত অঙ্কুর—পরীক্ষিতের ফলে সূক্ষ্ম সর্প-শিশুর মতো যে এমন করিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকে, তাহা আগে কে জানিত? …ছেলেটির বাড়ীর লোকের নিকট ব্যাপারটা আর অজানা রহিল না; স্বার্থের খাতিরে তাঁহারা আর এই ঘটনা হাওয়ার মুখে ছড়াইতে দিলেন না। বালকের পিতা কলিকাতায় ব্যবসা করেন। চারিমাস গত হইতেই এখানকার কোন আশ্রমে স্ত্রীলোকটিকে আনাইয়া, যথাসময়ে তাঁহার প্রসবকার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা হইল। তারপর তিনি গঙ্গাস্নান করিয়া তুলসীর মালা গলায় দিয়া, নামাবলী জড়াইয়া, তীর্থ-প্রত্যাগতা রূপে দীর্ঘ সাত মাস পরে পল্লীতে ফিরিয়া গেলেন। সুখের বিষয়, তাঁহার শুভ্র

মর্ম্মর-নির্ম্মিত সতীত্বের ফলকে সমাজ-শাসনের বিন্দুমাত্র আঁচড় পড়ে নাই !...

ইহা অত্যাধুনিক ইব্‌সেন্-বাদীদের অধ্যাত্ম-সমুদ্র-মন্থিত নিছক্ গল্প-কথা নহে,—সূর্যের মতো সত্য, প্রত্যক্ষলব্ধ ঘটনা। এইরূপ নিত্য কত শত ঘটিতেছে ! ইহা জীবনের অসন্দিগ্ধ অচ্ছোদ যবনিকার অন্তরালে—ভৈরব শাসন-তরঙ্গের অব্যবহিত নিম্নে, মানব-মনের অসম্বরণীয় স্বাভাবিক প্রেরণায় যে সকল প্রকৃত ঘটনা ঘটিতেছে—তাহারই একটি ! সংরক্ষণবাদীরা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইবেন যে, এই জাতীয় ঘটনা-সংশ্লিষ্ট নারীগণের বেশীর ভাগই নাটক-নভেল-বায়োস্কোপের প্রভাব-বিবর্জ্জিতা হইয়াই এই জাতীয় 'অপকর্ম্ম' সাধন করিয়া থাকে।...

রতি-রাজ্যে পুরুষই সাধারণত স্ত্রীলোককে প্রথম প্ররোচিত করে—এই ধারণা সর্বদেশে সাধারণের মনে প্রবল। যখনি বহির্বিবাহিকভাবে কোন নর-নারীর মধ্যে যৌন-সংযোগের ব্যাপার ধরা পড়িয়াছে, তখনই নারী নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিয়া, পুরুষের ঘাড়েই সমস্ত দোষ চাপাইয়া দিয়াছেন,—যদিচ ঘটনা সত্য হইলেও সামাজিক শাস্তির ভাগ তাঁহাকেই বেশী বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় ! আদালতে কন্যাদূষণের (abduction) যতগুলি মাম্‌লা উপস্থিত হয় এবং যাহার জন্য, ঘটনা প্রমাণিত হইলে, শতকরা আশীটি ক্ষেত্রে পুরুষ লোক সাজা পায়, সেগুলির পঞ্চাশাধিক কেসে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই পাপকার্যে সমান সম্মতি থাকে ;—হয়ত পূর্বরাগের লক্ষণগুলি অসহিষ্ণুতা বশত পুরুষই আগে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে এবং ভোগরাগের শেষ পর্যন্ত দেখিতে অবিমৃষ্যকারিতার সহিত অপর পক্ষকে ঘরের বাহিরে টানিয়া আনিয়াছে।

নারীর প্ররোচনা

পুরুষকে যে নারী সক্রিয়ভাবে প্রলুব্ধ করিতে পারে—ইহা অনেকের

নিকট অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু উহা কল্পনাপ্রসূত নহে। কলিকাতার কোন চিকিৎসক তাঁহার নিজ জীবনেতিহাস হইতে সংগ্রহ করিয়া কয়েকটি ঘটনা গ্রন্থকারকে বলিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়, কৈশোরে ক্রমাগত দুইটী বিবাহিতা স্ত্রীলোক কর্তৃক তিনি প্ররোচিত হইয়াছিলেন। একটি রমণীর সহিত তিনি একাদিক্রমে ছয় বৎসরকাল (২৯ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু-কাল পর্যন্ত) অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন; উভয় পক্ষের আত্মীয়-স্বজনগণ এ ঘনিষ্ঠতা স্নেহের নিদর্শন ভাবিয়া পরস্পরের অবাধ মিলনে কোনরূপ আপত্তি তুলিতেন না। শেষোক্ত স্ত্রীলোকটির স্বামী রেলওয়ে-গার্ড্ ছিলেন; সময়মতো স্বামী-সঙ্গলাভ তাঁহার ভাগ্যে বড় কমই জুটিত!

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোন কোন ভদ্রলোক বোধ হয় তাঁহাদের বাল্যকালের ঘটনাসমূহ স্মৃতিপটে জাগ্রত করিলে, দেখিতে পাইবেন যে, নিম্ন জাতীয়া কোন যুবতীর নিকট হইতে তাঁহারা যৌন-প্রকৃতির বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। নিতান্ত অজ্ঞ বালককে যৌন বিষয়ক অভিজ্ঞতা দানের এই যে নোদনা, ইহা যে শুধু নিম্ন শ্রেণীর যুবক-যুবতী বা প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার মধ্যেই নিবদ্ধ—এমন নহে, অনেক সময় উচ্চবংশজাতের মধ্যেও এ প্রেরণার অভাব ঘটে না। তবে উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষদিগের ভিতর আত্মসম্মান, শালীনতা ও সম্বিৎ-বোধ অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ থাকায় অথবা যথোচিত সুযোগ-সুবিধার দ্বার অপেক্ষকৃত অল্প উন্মুক্ত থাকায়, এইরূপ কামনা কাহারো মনে উদয় হইলেও সচরাচর সংসিদ্ধ হইতে পারে না।

পঞ্চম প্রপাঠ

পূর্বযৌবনের যৌন-জীবন

অধ্যাপক মোল্ যৌনপ্রবৃত্তির বিকলন-প্রসঙ্গে—স্পর্শনাভিলাষ এবং নাড়ীগত ও দৈহিক রসবিশেষের নিষ্কৃতিসাধনেচ্ছা নামক যে দুইটি আবেগের উল্লেখ করিয়াছেন, উহাদের ক্রমিক স্ফুরণের মধ্যপথে মানুষকে একটি বিশিষ্ট অবস্থায় উপস্থিত হইতে হয়—যাহার অভাবে শেষোক্ত আবেগটির উৎপত্তি অসাধ্য হইয়া পড়ে। হ্যাভ্লক এলিস্ প্রমুখ ইংরাজ যৌনবৈজ্ঞানিকগণ এই অবস্থার নাম দিয়াছেন—state of tumescence; বাঙ্গালায় ইহার নাম দেওয়া যাইতে পারে—"উদ্বেলাবস্থা"। প্রিয়জনের সংস্পর্শ-লাভ করিয়া অথবা তাহা সংস্পর্শসুখ কল্পনায় আনিয়া, তাহার বাক্য অথবা সঙ্গীত শুনিয়া, তাহাকে সন্দর্শন করিয়া অথবা তাহার আলেখ্য দেখিয়া, সমস্ত দেহ-মনে উদ্বেল অবস্থার উদ্ভব হয়; সমস্ত নাড়ীতন্ত্রে পুলকবেদনা-মিশ্রিত একটা দুঃসহ উন্মাদনা জাগে; সমস্ত দেহে দ্রুত রক্ত প্রবাহিত হয়—বিশেষ ভাবে দেহের কেন্দ্রস্থলে, দেহমস্থিত জীবনামৃতে শুক্রাধার পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, এমন কি লিঙ্গোত্থানও বহুক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে হইতে দেখা যায়। বাল্যকালের যৌনাবেগে এই উদ্বেলাবস্থা একপ্রকার অজ্ঞাত থাকে বলিলেই হয়। কিন্তু কৈশোর (মোটামুটি চৌদ্দ হইতে সাড়ে সতর বৎসর বয়স পর্যন্ত) এই অবস্থার প্রথম সূচনা করে।

উদ্বেলাবস্থা

কৈশোরের প্রারম্ভেই সকলের এ অবস্থা জাগে না, তবে উহার স্থায়িত্ব-

কালের মধ্যে যে জাগিবেই, তাহা ভূয়োদর্শনলব্ধ সত্য। যাহার জাগে না, তাহাকে স্বভাবগণ্ডীর বাহিরে—নিদানশাস্ত্রের বিষয়ীভূত করিয়া রাখা স্বচ্ছন্দে চলে। অন্যান্য দৈহিক ও মানসিক অবস্থার সহিত ইহাও কৈশোরের অন্যতম প্রধানতম বৈশিষ্ট। যাঁহারা রসশাস্ত্র (Chemistry) অধ্যয়ন করিয়াছেন, বৈদ্যুতিক শক্তিদ্বারা লীডেন্ জার প্রপূরিত করার উপমা প্রয়োগ করিলে, তাঁহারা উদ্বেলাবস্থার রহস্য সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শরীরে উদ্বেলাবস্থার উদ্রেক করিতে যতখানি সময় অতিবাহিত হয়, তদপেক্ষা অল্প সময় ব্যয়িত হয় উহার প্রশমন-কল্পে,—ঠিক যেরূপ লীডেন্ জার তাড়িৎদ্বারা পরিপূর্ণ করিতে যতখানি সময় লাগে, তদপেক্ষা অনেক কম সময় লাগে মৃত্তিকাস্পর্শে উহার নিস্তার-সাধনে। আত্মানন্দকে উদ্বেলাবস্থার অঙ্গীভূত করা চলিতে পারে, কারণ প্রায় ক্ষেত্রেই উহা এই অবস্থার পরিবর্ধন করে। বলা বাহুল্য, বিধিনির্দিষ্ট স্ত্রীসঙ্গম দ্বারাই উদ্বেলাবস্থার প্রশমন করিতে হয়। কিন্তু কোন সভ্যদেশেই কিশোর-বয়সী পুরুষ আইনসঙ্গতভাবে স্ত্রীসঙ্গম করিবার অধিকার পায় না, তদুপরি সুরত সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত আকাঙ্ক্ষাও এই বয়সে জাগে অতি অল্প কিশোরেরই। কাজে কাজে স্বভাবই কৈশোরিক উদ্বেলাবস্থার প্রসাদ-কল্পে প্রতিনিধিত্বসূচক কয়েকটি সান্ত্বনাকর প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছে।

লীডেন্ জারের উপমা

যখন ওষ্ঠের উপরিভাগে গোঁপের আভাষ পাওয়া যায়, যখন অণ্ডকোষদ্বয় স্ফীত হইয়া আপনার মধ্যে সরস সজীব শুক্রকীট উৎপাদন করিতে সুরু করে, যখন লিঙ্গমূল-দেশে সূক্ষ্ম রোমরাজী উদ্গত হইতে থাকে, গলার স্বর গাঢ় হইয়া উঠে, পুরুষোচিত বাহ্যাভ্যন্তরিক লক্ষণগুলি যখন পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ

কৈশোরের বৈশিষ্ট

করে, তখনি বুঝিতে হইবে, কৈশোরের বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট মানব-সত্তার প্রাসাদ-চূড়ে উড্ডীয়মান হইয়াছে। তখন হইতেই তরুণ মনে সত্যকার যৌনবোধ ধীরে ধীরে জাগ্রত হইতে ও যৌন-প্রেরণায় তাহার সত্তা স্বতই রণরণিতে থাকে। এই সময় শত অবধান, শত সুশিক্ষা, শত চেষ্টার দ্বারাও নবীন কামনার বিকাশের ধারা রুদ্ধ করা যায় না।

যাঁহারা বলেন যে, তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি নব জাগ্রত পৌরুষের এই স্ফুরণাগ্রহ ও তৎসহিত যৌনেন্দ্রিয়ের দুর্দমনীয় উত্তেজনা অনুভব না করিয়াই যৌবনের জয়মাল্য-ভূষিত তোরণ-দ্বার অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তাঁহাদিগকে একবার নিজেদের বিগত কৈশোরের দিবসগুলিকে স্মরণে আনিতে অনুরোধ করি। তবুও যদি তাঁহারা নিজের ধারণাকে অভ্রান্ত বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে স্বর্গত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর "শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ" ১ম ও ২য় খণ্ড এবং মহাত্মা গান্ধীর আত্মজীবনী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। অরণি-সঞ্জাত শুকদেব পুরাণ-কর্তাদের কল্পনা-জগতে চিরঞ্জীব হইয়া থাকিতে পারেন, বাস্তব জগতে তাঁহার স্থান নাই!

কৈশোরের অনিবার্য পরিবর্তন

সুতরাং কৈশোর, কি নর কি নারী, প্রত্যেকেরই জীবনাবর্তে একটা অতি প্রয়োজনীয় অবস্থা, মানব-জীবনের বিকাশ-পথে একটা অভিনব আত্মচেতনার অপরূপ পান্থশালা। বাল্যকালে যে আবেগ তাহার মনের জানালায় কখনো-সখনো উঁকিঝুঁকি মারিত, সে যাহাকে চিনিয়াও চিনিতে পারিত না, প্রচুর অসন-বসন-সুপ্তি-ক্রীড়ার মধ্যে সে যাহাকে প্রায় ভুলিতে পারিত, সেই আবেগ কৈশোরোন্মেষে আত্মপরিচয় দিয়া, তাহার প্রাণের দ্বারে সকাতর করাঘাত করিতে থাকে। কিশোর দ্বার খুলিয়া এই শাশ্বত অতিথিকে যেন সাদরে বরণ করিয়া লয়; তাহার

জীবনসত্তা যেন সমস্ত অনাহত তন্ত্রীগুলিতে সুরের পরশ লাগাইয়া গুঞ্জরিয়া উঠে—"প্রভাতে আজ কোন্ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে। আনন্দ-গান গা'রে, হৃদয়, আনন্দ-গান গা'রে!"

শৈশবে বা বাল্যে যে যৌনবোধ কতকটা প্রসুপ্ত বা অর্ধসুপ্ত অবস্থায় ছিল, যাহার রূপ ধরা পড়ে নাই, যাহার কর্মকেন্দ্র চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হইয়া ছিল, যাহার দুর্দমনীয়তা ছিল না—উদগ্র আকৃষ্টি ছিল না—স্থিরনিশ্চয়তা ছিল না, সেই যৌনবোধ কৈশোরে নিদিষ্টতার পাদভূমিতে নামিয়া আসে; উপস্থ, তাহার ক্রমবর্ধন, তাহার ক্রমপরিবর্তন, তাহার রূপ, স্পর্শ ও গন্ধ ঘেরিয়া একটা অতল জিজ্ঞাসা-মিশ্রিত এষণা বাসা বাঁধে—দিন দিন যাহার শক্তি প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠে। তবুও তাহার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে গড়িমসি করে একটা অসঙ্গতি ও অস্পষ্টতার ভাব; কারণ প্রায় সারা কৈশোর কাল জুড়িয়াই সমকাম ও বিষমকামের মধ্যে চলে একটা দারুণ দ্বৈতরণ,—উহাতে কে কখন্ জয়লাভ করে তাহার ঠিক নাই। সেইজন্য স্ত্রী ও পুরুষজাতির মধ্যে কিশোরের ভালবাসার দোলকযন্ত্র ক্রমান্বয়ে আন্দোলিত হইতে থাকে। সমকামে সমধিক অভ্যস্ত সে, সাত আট বৎসর ধরিয়া হৃদয়ে তাহার এই প্রবৃত্তি নীড় বাঁধিয়া আছে—শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে, সহজে উহা কি ছাড়িয়া যাইতে চাহে?

কৈশোরের যৌনবোধ

বস্তুত প্রথম প্রথম সমকামই জয়লাভ করে, তারপর তাহার প্রতাপ ক্রমশ স্তিমিত হইয়া আসে; তখন বিষমকাম বা নারীজাতির প্রতি যৌনাকর্ষণ জয়শ্রীমণ্ডিত হয়। কিন্তু কাহারো কাহারো সত্তা এই সাধারণ ও সনাতন ক্রমপরিবর্তনের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বসে; তাহাদের ক্ষেত্রে সমকামই বিজয়ী হয়। আবার কাহারো কাহারো মানস-শিবিরে

এই উভয়বিধ কামের মধ্যে একটা শান্তিসন্ধি স্থাপিত হয়; তাহারা একপ্রকার সমভাবেই পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তবে স্ত্রীলোকের প্রতি আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার দৈন্য দেখিয়া ও তাহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি তত সহজসাধ্য নহে বলিয়া, তাহারা হয়ত কখনো কখনো পুরুষের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে বেশী। অনুকূল অবস্থার মধ্যে কিশোরের এই আকাঙ্ক্ষা প্রকৃত যৌনাবেগযুক্ত হইয়া, নবজাগ্রত ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া প্রস্ফুরিত হইবার যখন প্রয়াস করে, তখই তাহার নাম হয় "সমমেহন"।

কিন্তু স্বভাবনির্দেশের নিকট যে ষোলো আনা মাথা নত করিয়া চলে, সে পনের ষোলো বৎসর বয়স হইতে নারীর প্রতিই সমধিক আকৃষ্ট হয়।

কৈশোর-যৌনাবেগের স্বাভাবিক পরিণতি

এই আকর্ষণের মধ্যে যৌনাবেগ মিশ্রিত থাকে সত্য; কিন্তু উহার পরিস্ফুরণ-পথে অনিশ্চয়তার কুয়াসা তখনো অনেকখানি ঘনীভূত থাকে বলিয়া, প্রকৃত যৌনসংযোগের ব্যগ্রতা কিশোরের মধ্যে বড়একটা দেখা যায় না *। উপস্থ ব্যতীত অন্যান্য ইন্দ্রিয় দিয়া উপভোগ করিতেই তাহার প্রাণ ব্যাকুল হয়। নারীর প্রতি এতদিনের উদাসীনতার তুহিন রাশি নবারুণ-রশ্মির পেলব উত্তাপে ধীরে ধীরে গলিয়া যায়; ঘৃণার পাত্রী তখন আরাধনার প্রতিমা হইয়া তাহার নয়নসম্মুখে ক্রমোজ্জ্বল হইয়া প্রতিভাত হয়।

* The first sexual sensations are of a quite indeterminate nature; something unconscious and obscure inclines the boy toward the female sex and makes it appear desirable. This desire is not concentrated especially on the sexual act as with an adult who is already experienced in these matters; it is more generalised and vague, although sensual.—"A. Forel in the SEXUAL QUESTION. p. 79.

স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে দেহগত যে সকল বৈশিষ্ট এই সময় পরিস্ফুট হইতে থাকে, তাহার প্রতি কিশোর-কিশোরী উভয়েই অত্যন্ত সচেতন হয় এবং অপরের দেহের যে সকল নববিবর্তিত লক্ষণসমূহ সাধারণত আবৃত থাকে, সেই সকলের প্রতি তাহাদের একটা দুর্বার অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহল সঞ্জাত হয়। গৃহপালিত জীবজন্তু, পক্ষী ও পতঙ্গের সম্ভোগ-দৃশ্য দেখিয়া কিশোর উহার তাৎপর্য বুঝিতে পারে এবং ঐরূপ কর্মে যে মানুষেরও অধিকার আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করে। অনাস্বাদিতপূর্ব আদিরসের অর্ধস্ফুট ধ্যান ও ধারণায় সে একটু-একটু করিয়া নিমগ্ন হয় বটে, কিন্তু উহার চরিতার্থতার চেষ্টা তাহার মধ্যে দেখা যায় খুবই কম। যদি বা কোনরূপ চেষ্টার ভাব থাকে, তথাপি তাহার ভিতর উদ্দেশ্যের অপরিষ্কতা, অভিজ্ঞতার অভাব ও আবেগের শ্লথমূলতা থাকে বলিয়া উহা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে না। কিশোর-কিশোরীর দেহে যৌবনোচিত পৃথক পৃথক লক্ষণগুলি যতই বিকশিত হইয়া উঠে, পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের তীব্রতা ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ বা সাধারণভাবে স্পর্শন—এই চারিটি ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতার জন্য পরিণত কিশোর ব্যাকুল হয়। উহাতেই তাহার আকাঙ্ক্ষা সম্যক্ চরিতার্থতা লাভ করে। একটি লাবণ্যময়ী যুবতী বা মুকুলিতস্তনা কিশোরীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাহার সর্বশরীরে আনন্দ-শিহরণ রণরণিয়া উঠে; তাহাকে পুনঃপুন দেখার আকাঙ্ক্ষা যেন মিটে না, হাজার বার দেখিয়াও তবু তাহার সমস্ত সত্তা যেন গুমরিয়া বলে—'নয়ন না তিরপিত ভেল।' প্রিয়ার গান বা তাহার কণ্ঠস্বর শুনিবার, হয়ত তাহার সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার জন্য তাহার প্রাণে কামনা জাগে; তাহাতেই তাহার যৌনাবেগ পরিতৃপ্ত হইতে পারে। নহেত তাহার ভিজা চুলের গন্ধটুকু আঘ্রাণ করিতে, অঞ্চলখানি স্পর্শ করিতে, তাহার করতলে

আপন হস্তখানি ন্যস্ত করিতে তাহার ভাল লাগে; তাহার বেশী কিছু সে চাহে না। কোন কোন পরিপক্ক কিশোর যদি বেশীদূর অগ্রসর হয়, তাহাহইলে ভাবোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নারীরূপ ধ্যান করিতে করিতে হয়ত একান্তে গাহিতে পারে—"একটি চুমার লাগি আমার পরাণ কাঁদে হায়।" কিন্তু কিশোরকালের মধ্যে ক্রমাগত চতুরিন্দ্রিয়দ্বারা নারী সম্বন্ধীয় জ্ঞান আহরণ করিতে করিতে, অথবা পরিণত বালিকার সংস্পর্শ ঘন ঘন লাভ করিতে করিতে, পুরুষের পঞ্চমেন্দ্রিয় সহজে উদ্দীপিত হইয়া উঠিতে পারে, এবং সত্যকার যৌনসংযোগের মধ্য দিয়া তাহার বাসনা স্ফূর্তিলাভের উদ্যোগ করিতে পারে। কৈশোর-বিবাহ না হইলে, আমাদের সমাজে অবশ্য এরূপ পৌনঃপুনিক স্ত্রী-সংস্পর্শ লাভের বড়-একটা সুযোগ ঘটে না।

এস্থলে পুরুষের কৈশোর সম্বন্ধে আরও দুইটি-একটি কথা বলা আবশ্যক। কিশোরীর ন্যায় কিশোরের মধ্যেও লজ্জাভাব প্রায় সমান ভাবেই জাগে।

লজ্জাশীলতা ও ভাবুকতা

বয়স্ক পুরুষ ও সর্ববয়সের স্ত্রীলোকের নিকট —বিশেষভাবে সমবয়সী বা ঈষৎ কনিয়সী বালিকার সম্মুখে তাহার সরমসঙ্কোচ জাগে সমধিক পরিমাণে। এমন কি, সময়ে সময়ে, বালকের লজ্জা বালিকার চেয়ে বেশী পরিস্ফুট দেখা যায়; কোন কোন ক্ষেত্রে সমবয়স্ক বালকের সহিত আলাপ-পরিচয়ে বালিকাকেই অধিকতর অগ্রসর দেখা যায়। এক্ষেত্রে বুঝিতে হয় যে, ঐ কিশোরের মধ্যে পৌরুষ বীজ আশানুরূপ পরিস্ফুট হয় নাই, অথচ অন্তরে যৌনবোধ রীতিমত মাথানাড়া দিয়া উঠিয়াছে। মানুষের—বিশেষ করিয়া নারীর লজ্জাশীলতার মনোবৈজ্ঞানিক কারণ সম্বন্ধে আমাদিগকে অতঃপর একটি পৃথক অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে হইবে। কৈশোর জীবনে এককভাবে বা কোনরূপ অবৈধভাবে রেতঃপাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে, পুরুষের

লজ্জাশীলতা নিবিড়তর হইয়া উঠে—এমন কি গুরুজনের নিকটও; সেই সঙ্গে ভয়কাতরতা আসিয়া যোগ দিতে পারে। আবার অনেকের বাহিরের ক্রিয়া-চাঞ্চল্য ও সামাজিকতা-ভাব স্পষ্ট হ্রাস পায়। পিতামাতা কিন্তু সাধারণত এই সকল লাজ-বিনম্র বালকদিগকে সৎ বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এই অভ্যাস পরিত্যাগ করিলে অথবা বিবাহের কিছুদিন পরই লজ্জাধিক্যের কুয়াসা দ্রুত কাটিয়া যায়; তখন সে গুরুজনের নিকট কতকটা মাথা খাড়া করিতে পারে, রমণী-সমাজেও অনেকটা অসঙ্কোচে পরিভ্রমণ করিতে পারে।

তারপর আর এক কথা। এই বয়সে সকল বালকেরই সৌন্দর্যবোধ ধীরে ধীরে জাগ্রত হয়; শুধু রমণীর রূপে নহে, বাহ্য প্রকৃতির সর্ববিধ প্রাতিভাসিক বিকাশের প্রতি তাহার মন মুগ্ধ হইয়া পড়ে। চিন্তারাজ্যে সত্যই তাহার একটা অভিরাম বিপ্লব আরম্ভ হয়। অনেকেই কাব্য, সঙ্গীত, সুকুমার সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রতি আকৃষ্ট হয়; দ্বিদলমধ্যস্থ তৃতীয় চক্ষু সন্তর্পণে উন্মীলিত হয়, নূতন ভাব-জগতে তাহাদের নবজন্মলাভ হয়। লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, ষোল-সতের বৎসর বয়সে সকল কিশোরই অল্পবিস্তর কবি ও ভাবুক হইয়া পড়ে *। অবশ্য অশিক্ষিতের মনে এই ভাবুকতার উদ্দীপনা আসে নিতান্ত নগণ্য পরিমাণে। কাহারো কাব্যরস

* "There appears to me to be no doubt that in the youth or the maiden the awakening of sexuality induces an individualization and invigoration of artistic perception. Hand in hand with the first love of youth, somewhere about the sixteenth or seventeenth year, the sense of grace and beauty in the landscape, the appreciation of the charm of poetry, painting and music, are strengthened and refind to such a degree, that in comparison, with what is now felt, all earlier experiences and enjoyments seem to be as nothing."—J. Volkelt in ÆSTHETICS, Vol. I. p. 523 (Munich, 1905).

অন্তরের মধ্যেই উৎসারিত, ফেনায়িত ও সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে, কাহারো বা কাগজে-কলমে সমূর্ত হইয়া প্রকাশ পায়। এই কবিত্বের ভাব সারা যৌবনকাল ব্যাপিয়া অপ্রতিহত গতিতে বহিয়া চলে; অনেক সময় বিবাহের কিছু পরে অথবা দুই একটি সন্তান-সন্ততি হইলে, তবে স্তিমিত হইয়া আসে *।

সাহস

কৈশোরের পরিবর্তনগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিলে, যৌবনপ্রারম্ভে পুরুষের স্বভাবের মধ্যে একটা বিশিষ্ট গুণ বিকশিত হইয়া উঠে—সাহস বা অগ্রগামিতা। যৌনবোধ যাহার যত বেশী পরিস্ফুট হয়, তাহার তত সাহসের আধিক্য দেখা যায়। তদুপরি যদি এই সময়ে কোন প্রকারে নারী-সহবাসের রসাস্বাদন সে করিতে পায়, তাহাহইলে আর কথাই নাই। নারী-সহবাসেও পুরুষের এই গুণটি অত্যন্ত কাযে লাগে। 'মিন্‌মিনে', সাহসহীন পুরুষ কোন নারীর নিকটই মনোরঞ্জক হইতে পারে না। অত্যন্ত কামাসক্তা রমণীও পুরুষের সম্মুখে অনিচ্ছা বা ঔদাসীন্যের মনোরম অভিনয় করেন—শুধু তাহার এই সাহসের পরীক্ষা করিতে। কৈশোরের শেষে বা যৌবনসূত্রপাতে সাহসিকতা-গুণের বিকাশ হওয়ার জন্য শক্তিচর্চা, বিপজ্জনক ব্যায়াম, শ্রমসাধ্য ক্রীড়াপদ্ধতি, ও গৃহ-বাহিরের নানারূপ অভিনব কর্মিষ্ঠতার প্রতি বহু যুবার মন প্রধাবিত হয়। ইহাদ্বারা যৌনবোধ-বিকাশের পথে বিশেষ বাধা পড়ে না, তবে উহার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যসাধনের চেষ্টা কতকটা প্রদমিত অবস্থায় থাকে। গৃহকোণে

* "Most puberty candidates are poets or at least rimers. Every youth considers himself a Walt Whitman or a Longfellow.... Happily, the rhyme manufacturing business is not so lucrative, and the vast majority of youthful aspirants does not survive the baby-stage of versification."—Dr. Joseph Tenenbaum M. D. in THE RIDDLE OF SEX, p. 31.

যে যত একান্তে বসিয়া দিন কাটায়, তাহার মনে যৌনবিষয়ক চিন্তা তত অধিক পরিপূর্তি লাভ করে; এমন কি, অধ্যয়ন বা নিদিধ্যাসন-কালে ও সামান্য রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও সে বস্তুগত প্রেমের নানাবিধ দিবাস্বপ্ন দেখিতে ছাড়ে না।

যৌবনের প্রথমভাগে চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি পায় সত্য, কিন্তু তাহাকে যথাসাধ্য অকার্যকর করিবার জন্য যুবক নিজেই নানাবিধ উপায় আবিষ্কার করে। তদুপরি, তাহার চিন্তাধারার মধ্যে সম্ভবনীয়তা, অসম্ভবনীয়তা, সত্য, স্বপ্ন, আবেগ ও উদ্বেগের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ হয়,—কাজেই উহার গভীরতাও হয় অল্প, উহাতে সুব্যবস্থিতিও থাকে সামান্য। সাধারণ বুদ্ধি, বিপদে স্থৈর্য ও সূক্ষ্ম বিচার-শক্তি তখনো জন্মে না। তথাপি আত্মশক্তির উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস আসে; কখনো কখনো প্রচলিত সামাজিক্ বা রাষ্ট্রিক্ ব্যবস্থার প্রতি উপেক্ষার ভাব জাগে। সেইজন্য একজন আমেরিকান্ লেখক বলিয়াছেন—"Puberty is revolutionary. Youth questions authority and destroys idols."

বিদ্রোহী যৌবন

সচরাচর সতের আঠার বৎসর বয়সের মধ্যে আমাদের দেশের কোন কোন কিশোর ('অধিকাংশ যুবক' কথাটি ব্যবহার করায়ও বিশেষ ক্ষতি নাই) মনে মনে একটি বালিকাকে ভালবাসে। এই ভালবাসা শহরের ইট-পাথর অপেক্ষা পল্লীর স্নিগ্ধ প্রকৃতি-ভবনে জন্মলাভ করে ও বর্ধিত হইবার সুযোগ পায় অতি সহজে; এবং ঐ ভালবাসার মধ্যে সকল ক্ষেত্রে সম্ভোগের বাসনাই যে প্রধান আসন অধিকার করে—একথা বলা চলে না। এই ভালবাসার স্রোত কখনো কখনো বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত সমান টানে বহিয়া চলে। অনেক সময়ই ইহাদের মধ্যে সহজভাবে ভালবাসার

প্রেমের উন্মেষ

কথাবার্তা, উচ্ছ্বাসপূর্ণ পত্রালাপ অথবা ঘনিষ্টভাবে মেশামিশি হয় না। কখনো বা স্নেহের সম্বোধনে, সামান্য আঁচে-ইসারায়, নগণ্য উপহার কিংবা অনুকূল আচার-ব্যবহার দ্বারা এই প্রেম স্ফূর্ত্তি লাভ করে, এবং প্রায়শ 'দাদা' সম্বোধনের অন্তরালে ইহার প্রত্যক্ষ সংবিৎ আত্মগোপন করিয়া থাকে। সামাজিক শাসন, পারিবারিক প্রভাব এবং আধ্যাত্মিক ভাব-ভূয়িষ্ঠতা, অতিরিক্ত সঙ্কোচশীলতা অথবা সুবিধার অভাব আবার উৎসাহী যুবকের সুরত-স্পৃহাকে অধিকাংশ স্থলে সংযত করিয়া রাখে। যাহা হউক, এই নূতন প্রেমিক তাহার সাধনার বস্তুর সুনজরে পড়িবার ও তাহার তুষ্টি-বিধানের সুযোগ লাভের জন্য বিধিমত চেষ্টা করে; এবং অপর পক্ষের সামান্য ইসারায় তাহাকে একান্ত নিজস্ব ভাবিয়া চরিতার্থ হইয়া যায়।

বালিকার নিকট হইতে কার্যে, বাক্যে বা ইঙ্গিতে কোনরূপ আশ্বাস না পাইয়াও কোনো কোনো যুবক তাহার প্রেম-নির্ঝরকে তদভিমুখী করিয়া রাখে। বালকের মনোগত প্রেমের আদর্শের সহিত যে বালিকাটি সব চেয়ে বেশী খাপ্ খায়, বালক তাহাকে দূর হইতেই ভালবাসে; দূর হইতেই তাহার হাসি দেখিয়া জগৎ মধুময় দেখে—কান্না দেখিয়া বিশ্ব তমসাবৃত জ্ঞান করে। নিমেষের জন্য তাহাকে কাছে পাইলে, আনন্দে আত্মহারা হয়। শয্যায় শুইয়া তাহার রূপ ধ্যান করিতে করিতে নিদ্রা যায়, নিদ্রাকালে তাহারই স্বপ্ন দেখে। তাহার নামে কবিতা লেখে অথবা লিখিবার চেষ্টা করে; নচেৎ প্রেমের কবিতা বা উপন্যাস একনিবিষ্টচিত্তে পাঠ করে। সুযোগ পাইলেই সে অত্যন্ত অকৃত্রিম বন্ধুর নিকট তাহার মহান্ প্রেম ও প্রেমিকার মধুময় কাহিনী স্বপ্ন-রঙ্গীন কবিত্বের ফুল-ফল-পল্লবে ভূষিত করিয়া ব্যক্ত করে,—তাহার পুলক-বেদনার ইতিহাস সারাদিন ধরিয়া বলিয়াও যেন শেষ হইতে চাহে না! আবার কেহ কেহ এবিষয়ে অত্যন্ত তুষ্ণীভাবাপন্ন ও অন্তর্মুখী

হয় ; কেহ কেহ বা নিজের মনোভাব গোপনের জন্য নারীর প্রতি একটা বাহ্য তাচ্ছিল্য, উদাসীনতা বা উপহাসের মুখর অভিনয় করিয়া থাকে ।

আত্মরক্ষা ও আত্মপালন মানুষের সহজাত সংস্কার ; তাহার নিম্নেই হইল—আপন প্রেমভাজনদিগের রক্ষা ও পালনের স্থান । এই সংস্কারের বশবর্তী হইয়াই পৌরুষ-প্রণোদিত যুবা অপরের লুব্ধ দৃষ্টি হইতে তাহার সেই রক্তমাংসময়ী মানস-প্রতিমাকে রক্ষা করিবার এবং অন্ততপক্ষে মনে মনে তাহাকে পুরাপুরি নিজস্ব ভাবিয়া আত্মগৌরব লাভের চেষ্টা করে। এইজন্য তাহাকে সর্বদা সতর্ক ও সজাগ থাকিতে হয়। এই সময় মন সহজে সন্দেহ-প্রবণ ও ঈর্ষাপ্রসূ হইয়া উঠে। প্রেমাবেশ তেমন গভীর হইলে, ছলে-ছুতায় সন্দেহভাজনকে সে জব্দ করিতেও সচেষ্ট হয় ; সম্ভবপর হইলে, প্রেমপাত্রীর সম্মুখেই তাহাকে ভূপাতিত করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠে। ইহাই হইল প্রাথমিক প্রেমের গৌণ সাহস ; এবং এই গৌণ ও মুখ্য সাহস-বোধ পুরুষেরই একচেটিয়া।

প্রেমে ঈর্ষার ভাব

ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে জানা যাইতেছে যে, শতকরা পঁচানব্বই জন বাঙ্গালীর বিবাহ আঠার হইতে পঁচিশের মধ্যে হইয়া থাকে। কিন্তু চৌদ্দ হইতে সাড়ে-সতের আঠারর মধ্যে পুরুষের বিবাহ শতকরা মাত্র দুইজনের হয় ; সম্প্রতি "সর্দা বাল্য-বিবাহ-নিরোধ আইনের" প্রভাবে ইহাও অচল হইতে বসিয়াছে। সুতরাং চৌদ্দ হইতে আঠারর মধ্যে তরুণদিগের যে যৌনবোধ সঞ্জাত এবং পুঞ্জীভূত হয়, তাহার তো স্ফূর্তিলাভের একটা প্রণালী চাই ! বয়লারের মধ্যে ক্রমাগত গরম বাষ্প জমিতে থাকিলে, একসময় তাহা ফাটিয়া যায় ; সেইজন্য বৈজ্ঞানিকগণ বয়লারের মাথায় 'সেফ্‌টি ভ্যাল্‌ভ্‌' নির্মাণ করিয়া

দৈহিক উদ্বেলাবস্থার 'সেফ্‌টি ভ্যাল্‌ভ্‌'

দিয়াছেন,—আশঙ্কাজনক অতিরিক্ত বাষ্প তাহার মধ্য দিয়া বাহির হইয়া যায়।

সমাজের মতে, কেবলমাত্র স্ত্রীসংসর্গের মধ্য দিয়া বীর্যপাত স্বভাবসঙ্গত ও আইন-সঙ্গত এবং বিবাহের দ্বারাই স্ত্রীসংসর্গ করা ধর্মানুমোদিত অনুষ্ঠান। কিন্তু যখন সাধারণ ক্ষেত্রে চৌদ্দ হইতে আঠারর মধ্যে বিবাহ বা স্ত্রী-সংসর্গের উপায় নাই, তখন সমাজের এই বিধানকে মানিয়া চলা কিশোরের পক্ষে কষ্টকর। তাই ইহার বিরুদ্ধে তাহার অন্তঃপ্রকৃতি অসহিষ্ণু ও বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তাহার অন্তঃপ্রকৃতি তখন বয়লারের 'সেফ্‌টি ভ্যাল্‌ভ্‌' খুলিয়া দেন,—পুঞ্জীভূত দৈহিক ও মানসিক বাষ্পের প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশকে বহিষ্কার করিয়া দিবার নিমিত্ত।

স্বপ্নদোষ

চৌদ্দ-পনেরো হইতে অন্তত পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত পুরুষলোকের বাধ্যতাজনিত ব্রহ্মচর্য পালন করিবার কালে, মাঝে মাঝে আপনাআপনি বীর্যপতন হইয়া থাকে। জাগ্রত অবস্থা অপেক্ষা নিদ্রার অবস্থায় এইরূপ বীর্যপাত হওয়া অধিকতর স্বাভাবিক। সাধারণত কোনো কামোদ্দীপক স্বপ্নের পরিণামে লিঙ্গোত্থিত হইয়া এই রেতস্খলন সংঘটিত হয় বলিয়া ইহার নাম 'স্বপ্নদোষ' রাখা হইয়াছে।

কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বপ্নদোষ আদৌ কোনো স্বপ্নের সহযোগিতা না পাইয়াই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আধুনিক ইয়োরোপীয় শারীর-বৈজ্ঞানিকগণ (একমাত্র Eulenburg ব্যতীত সকলেই) একবাক্যে স্বীকার করেন যে, স্বপ্নদোষ কৈশোর বা যৌবনে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—যদি উহা একটা সঙ্গত গণ্ডীর মধ্যে সংঘটিত হয়। অধ্যাপক ফার্‌ব্রিঙ্গার, বয়স, সুস্থতা ও অবস্থা বিশেষে প্রতি মাসে পনের বা দশদিন অন্তর নিদ্রাকালীন্ অনিচ্ছাপ্রসূত শুক্রক্ষরণ সম্পূর্ণ বৈধ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রফেসর লোয়েন্‌ফেল্ড্‌ আবার সপ্তাহে একবার স্বপ্নদোষ

হওয়াকে স্বাভাবিক সীমানার মধ্যে টানিয়া আনিয়াছেন। আমাদের মতে, বয়স ও দেহগঠন হিসাবে, কৈশোর ও যৌবনে যাবৎ নিয়মিত স্ত্রীসঙ্গমের ব্যবস্থা না ঘটে, তাবৎ প্রতিমাসে দুই বা তিনবার স্বপ্নদোষ সম্পূর্ণ স্বভাবসঙ্গত—অবশ্য যদি ইহার সহিত বীর্যস্খলনের অন্যবিধ কোন কৃত্রিম উপায়ানুসরণ না থাকে। এইরূপ স্বপ্নদোষের পরদিন যে দুর্ব্বলতা ও অবসাদ আসে, তাহা আমরা অকারণ উদ্বেগের ফলে নিজ মনে সৃজন করি।

অনেক বৃদ্ধলম্পটতপস্বী ও অকুণ্ঠিত স্বার্থপর ঔষধ-ব্যবসায়ী, এই প্রাকৃতিক প্রশমন-ব্যবস্থাকে সাংঘাতিক ব্যাধির লক্ষণ বলিয়া প্রচার করে; অপরিণতবুদ্ধি যুবকগণও ইহাদের মনবিমোহন কুহক-বাণী অকপটে বিশ্বাস করেন। কিন্তু যাহারা এই বয়সে স্বেচ্ছায় আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মচর্যকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সিদ্ধগুরুর উপদেশ মতো কামনা-বহ্নির শ্বাসরুদ্ধ করিয়া সাধন-মার্গে উঠিতে গিয়াছেন, তাঁহারাই সাক্ষ্য দেন যে, বিধিমতো নিয়ম-পালন ও সাধ্যমতো প্রতিরোধ-চেষ্টা সত্ত্বেও প্রকৃতির এই কল্যাণকর ব্যবস্থাকে উল্টাইয়া দেওয়া সুসাধ্য হয় নাই।

এই তো গেল মানুষের আপন ইচ্ছা ও চেষ্টার বহির্ভূত একপ্রকার বীর্যপতন। ধর্ম-শাস্ত্র না বলিলেও চিকিৎসাশাস্ত্র একটা সীমার মধ্যে এইরূপ বীর্যপতন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়া বিধান দিয়াছেন। স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে এই সীমার একটা মোটামুটি ধারণা উপরে দিলাম। ঐ সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা, কিংবা এই স্বাভাবিক শুক্র-নিঃসারণের প্রতি অহেতুক আশঙ্কা জন্মাইয়া দেওয়ার ফলে, আমাদের দেশের যুবক সম্প্রদায়ের কতখানি অনিষ্ট হইতেছে, তৎসম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার করা—বক্ষ্যমান্ পুস্তকের অধিকার-বহির্ভূত।

যৌবনের উন্মেষে একদিক দিয়া জননযন্ত্রগুলি ও শুক্রপ্রবাহ

যেমন পরিপুষ্ট হয়, অন্যদিকে মনোরাজ্যে একটা বিদ্রোহের চাঞ্চল্য-ভাব প্রকট হইয়া উঠে; একটা অনিরুক্ত বাসনা—একটা অস্পষ্ট প্রসার-পিপাসা—একটা অনিরুদ্ধ আত্ম-ব্যয়ের আগ্রহ, তখন সমগ্র মানস-সত্তাকে আলোড়িত করিয়া তুলে। ভিতরকার আত্মপ্রণোদনায় হউক, অথবা বহিরাগত জ্ঞানের দ্বারা হউক, নারীরূপের বস্তুগত দিক্‌টির প্রতি, তাহার আকর্ষণের যোগ্যতম কেন্দ্রটির প্রতি তাহার নয়নোন্মোচিত হয়। স্রষ্টার ইচ্ছার সহিত সে আপনাকে যুক্ত করে—সৃষ্টির মাদকতায় সে অধীর হইয়া উঠে। বিশ্বের সমস্ত নারীপ্রকৃতির অন্তরে ডুবিয়া সে তাহার সকল রহস্যের মুক্তাপ্রবাল ছাঁকিয়া তুলিতে চায়। সে যেন নিজেকে নিজের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারে না—যেন পূর্ণিমার তরঙ্গোচ্ছ্বসিত সিন্ধু! চতুর্দিকে সে যে-সকল বিধিনিষেধের বেড়া দেখে, তাহা নির্ম্মমহস্তে ভাঙ্গিতে চাহে। তাহার সর্ব কর্মপ্রচেষ্টারই উপর একটা অপূর্ব উদারতা, অতৃপ্তিকর উল্লাস, ধ্বংস ও সৃষ্টির একটা ছন্দোহীন ব্যাকুলতার ছাপ লাগিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে" এই অবস্থাটি সুন্দর প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে:—

যৌবনোন্মেষে মানসিক প্রগতি

"জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠিছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।
থর থর করি' কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে',
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।"

ষষ্ঠ প্রপাঠ

স্বমেহন

এক্ষণে পুরুষের যৌনবোধকে সকল দিক্ দিয়া সম্পূর্ণভাবে অধ্যয়ন করিতে হইলে, নারীর অনুপস্থিতি সত্বেও তাহার স্বেচ্ছাকৃত বীর্যপাতন বিষয়টিকে আমাদের আলোচনার আমলে আনিতে হইবে। স্থূলভাবে দুইটি শীর্ষে বিষয়টিকে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একটির নাম—'স্বমেহন', 'পাণিমেহন' বা 'হস্তমৈথুন' (self-abuse, auto-eroticism, masturbation); অন্যটির নাম 'সমমেহন' বা 'বিযোনি-মৈথুন' (male homo-sexuality)

বাহ্য জগতের প্রভাব ও আন্তরিক প্রেরণা—ইহার যে-কোন-একটি বা উভয়বিধ কারণই তরুণকে বীর্যপাতনে প্রবৃত্তি দিতে পারে। এতদ্ব্যতীত

উত্তেজনার প্রণালী

দেহগত কোনো স্থানীয় কারণেও কামের বোধন হওয়া বিচিত্র নহে। দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ—প্রধানত এই তিনটি ইন্দ্রিয়ের পথ দিয়া বাহ্যজগতের প্রভাব মস্তিকে বা মনের মণিকোঠায় উপস্থিত হয় এবং যৌন-চিন্তার স্পন্দন জাগাইয়া জীবসত্তার বীণা-তার ঝঙ্কৃত করিয়া তুলে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, কোনো তরুণীর মুখ, কোন নিখুঁত নগ্নভাস্কর্য, কামকেলিমণ্ডিত কোনো চিত্র, সাধারণত রমণীর যে সকল অঙ্গ আবৃত থাকে—তাহার একাংশ দর্শন, কোনো রমণী-কণ্ঠের সঙ্গীত, কলহাস্য বা প্রীতিপূর্ণ বচন শ্রবণ, কোনো দয়িতের অঙ্গ-পরশন—কৈশোর-যৌবনে কামোত্তেজনা উৎপাদনে সহায়তা করিতে পারে।

মূত্রস্থালীর (bladder) মধ্যে অত্যধিক মূত্র জমিলে, জননেন্দ্রিয়-সন্নিধানে দক্র, পাঁচড়া, পামা, চুল্‌কানি প্রভৃতি জন্মানোর জন্য কণ্ডূয়ন করিলে, মোটা বা খস্‌খসে কাপড়ের ঘর্ষণ লাগিলে, মলকোষ্ঠে অত্যধিক কৃমির উৎপাত হইলে, রাত্রে চিৎ বা উপুড় হইয়া শুইলে, অথবা কিছুক্ষণ হস্তদ্বারা লিঙ্গ নাড়াচাড়া করিলে, উহা উচ্ছ্রিত হইয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা অপরিপক্ক সুখবোধ হয়। সকলেরই এই সুখানুভূতিকে নিবিড়তর ও যথাসাধ্য স্থায়ী করিবার স্বতই ইচ্ছা জন্মে। শুক্রক্ষরণ-দ্বারা সেই ইচ্ছার সাময়িক চরিতার্থতা না হওয়া পর্যন্ত কোনো স্বাভাবিক মানুষের পক্ষেই নিশ্চেষ্ট, নিরুদ্বেগ থাকা কঠিন।

স্বমেহন বা পাণিমেহনের সংজ্ঞা পাঠকদিগের নিকট অজ্ঞাত না থাকিলেও বহু পাঠিকার বোধ হয় জানা নাই। প্রধানত আপন হস্ত ও

স্বমেহনের সংজ্ঞা

গৌণত অন্য অঙ্গ বা দ্রব্য-সাহায্যে নিজের যৌন-যন্ত্র হইতে বীর্য নিঃসারণ করিয়া উত্তেজনা প্রশমনের নাম—"স্বমেহন"। সম্পূর্ণ আত্মপ্রয়োজনীয়তার খাতিরে পরস্পরের মধ্যে সন্ধি করিয়া, একে যখন হস্তদ্বারা অন্যের বীর্যস্খালন করিয়া দেয়, তখন তাহাকে বলে 'পারস্পরিক পাণিমৈথুন'। সাধারণত দ্বাদশ বৎসর বয়স পর হইতেই লিঙ্গমূলস্থ কাউপার গ্রন্থি, পৌরুষ গ্রন্থি, প্রভৃতি যন্ত্রের মধ্যে রস-সঞ্চার ও উহার এক বা দুই বৎসর পর হইতে শুক্রকীট্ ও তৎসংক্রান্ত গাঢ় রস উৎপন্ন হয়। স্বমেহনের অভ্যাস কাহারো কাহারো দ্বাদশের পূর্বেও হইতে দেখা যায়। স্বমেহন-প্রণালী দ্বারা এই সকল বালকের বীর্যনির্গম হয় না বটে, তবে একটা নির্দিষ্ট সময়ের হস্ত-ঘর্ষণের পর তাহারা চরমানন্দের * (orgasm) অনুভূতি লাভ করে।

* যৌনোত্তেজনার প্রশমন-ক্রিয়ার শেষ অবস্থায় আসে 'চরমানন্দ'; উহার পরই আসে তৃপ্তি, প্রতিনিবৃত্তি ও অবসাদের ভাব। তৎকালেই স্ত্রী-পুরুষের nervous ও

যাহারা দ্বাদশ বা ত্রয়োদশে ইহাতে অভ্যস্ত হয়, তাহাদের চরম সুখের সময় মূত্রনালী হইতে কেবল পৌরুষ ও কাউপার গ্রন্থির পাংলা রস নির্গত হয়—তন্মধ্যে শুক্রকীট্ ও তজ্জনিত গাঢ় রস থাকে না। কিন্তু ইহাদেরও চরমানন্দের (orgasm) ভাব যথাযথ আসে · তারপরই অবসাদ ও নিদ্রালুতা আসিয়া পড়ে।

যাহাহউক, নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় যে, চৌদ্দ হইতে আঠার বৎসরের মধ্যে কোনো-না-কোনো সময়ে বা উহার আদ্যন্তকাল স্বমেহনের অভ্যাস জগতের সর্বত্র প্রচলিত আছে। পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্য, অর্ধসভ্য ও অসভ্য দেশের লোকসমূহের মধ্যে ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে, স্বমেহন দ্বারা আত্মকাম চরিতার্থতার অভ্যাস জীবনের প্রথমভাগে অস্থায়ীভাবে থাকে শতকরা ষাট্ হইতে নিরনব্বই জন লোকের মধ্যে। কুকুর, বানর, ঘোটক, হস্তী, ষণ্ড প্রভৃতি জন্তুর মধ্যে স্ত্রীসঙ্গমের অভাব ঘটিলে, তাহারা অনেক সময় স্বমেহনের দ্বারা রেতঃপাতে তৃপ্তিলাভ করে। আমাদের দেশে সাধারণত তের হইতে পনের বৎসর বয়সের মধ্যে এই অভ্যাস জাত হয়; আঠার হইতে কুড়ির মধ্যে প্রতিনিবৃত্তি আসে। স্থানীয় কোন অস্বাস্থ্যকর দুর্বার উত্তেজনা বা অন্তরের আবেগজনিত সুখের প্রেরণার বশবর্তী হইয়াই যে সকলে স্বমেহনের স্বরূপ চিনিয়াছিলেন, তাহা নহে। অনেক সময় কোন অকালপরিপক্ক সমবয়সী বা বয়স্ক বন্ধু স্বমেহনরূপ মায়ালোকের সন্ধান দিয়া দেয়; কথনো বা বাটীর কর্মচারী, পাচক, চাকর, এমন কি শিক্ষক ও আত্মীয়ও

স্বমেহনের বয়স ও শিক্ষাপ্রণালী

---

material discharge হয়; কিন্তু material discharge-এর অভাব বা বিঘ্ন ঘটিলে, শুধু nervous discharge-ই হইতে পারে। অতঃপর 'চরমানন্দ' বিষয়ে কতকগুলি নূতন কথা স্ত্রীলোকের যৌনবোধ-প্রসঙ্গে বলা হইবে।

নির্দোষ বালককে এই অভ্যাসে দীক্ষিত করে। দেশাচার তথা শাস্ত্রের চক্ষে—সুতরাং সমাজ ও পরিবারের চক্ষে, এই অভ্যাস নিন্দার্হ ও ঘৃণ্য ; সেইজন্য এই অভ্যাসের চারিদিকে নিবিড়তম লজ্জা ও সংগোপনতার যবনিকা পড়িয়া আছে।

কেবল তাহাই নহে, এরূপ উদ্দেশ্যহারা শুক্রব্যয়—মনুষ্যত্বের সর্বরুদ্র আত্মগ্লানির জনক। কিশোরের ঐতিহ্যগত নৈতিক বুদ্ধি—এই অভ্যাসকে ঘোরতর অপরাধ বলিয়া মনে করে এবং ধরা পড়িবার আশঙ্কা তাহার মনে দিবানিশি রাজত্ব করে। আত্মগ্লানির তিনটি প্রত্যক্ষ কারণ এখানে নির্দেশ করা প্রয়োজনীয় মনে করি।—(১) শুক্রের মহামূল্যতা সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণা, (২) শুক্রব্যয়ের পরমোদ্দেশ্য-সাধনের ব্যর্থতা সম্বন্ধে একটা সহজ বিশ্বাস, (৩) উহা আত্মকামের অতিস্থূল আধিভৌতিক বিকাশ—হীন স্বার্থসাধনার একটা নিতান্ত নির্লজ্জ অভিব্যক্তি বলিয়া বোধ। সুতরাং স্বমেহনের দ্বারা দেহ-মনের ভীষণ ক্ষতি সাধিত হইতেছে, ঈশ্বরের নিকট না জানি কি ভীষণ অপরাধই করিতেছি,—এইরূপ জ্ঞান কিশোরের কোমল হৃদয়ে ভয়াবহ দুশ্চিন্তার দাবাগ্নি জ্বালাইয়া দেয় ; এবং ওই দুশ্চিন্তা স্বমেহন হইতে ক্রমশ তাহাকে অতি ধীরে দূরে সরাইয়া লইয়া যায়। তথাপি দুর্নিবার নৈসর্গিক প্রবণতা বা কঠোর অভ্যাসের সম্মোহন-শক্তি এবং সামাজিক শাসনের ভয় ও আত্মানুশোচনার মধ্যে যে ভীষণ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, সেই দ্বন্দ্বের জের চলে বহুদিন ধরিয়া ; এবং মূল স্বমেহনজনিত ক্ষতি অপেক্ষা এই দ্বন্দ্ব-ঘটিত অব্যবস্থিতিই তাহাকে বেশী কাতর করিয়া তুলে।

স্বমেহনে আত্মগ্লানি ও দুশ্চিন্তা

জগতের শ্রেষ্ঠ দেহ-বৈজ্ঞানিকগণ, মনোবৈজ্ঞানিকগণের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া আজ বলিতেছেন, কৈশোরে পরিমিত মাত্রায় স্বমেহন করিলে

কোন ক্ষতিই হয় না; এবং অপরিমিতভাবে ও দীর্ঘকাল ধরিয়া এই অভ্যাসে রত থাকিলেও যতটা ক্ষতি হয় বলিয়া আমরা প্রচার করি, সত্যই ততটা ক্ষতির আশঙ্কা করা মূর্খতা। স্বমেহনের বিষময় পরিণাম সম্বন্ধে বিবিধ গালগল্প, সচিত্র বিজ্ঞাপন ও পুস্তিকাদি প্রচার-দ্বারা বালকের মনের মধ্যে যে ভয় ও আত্মগ্লানির [illegible] অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হয়, তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতেই সে নির্জীব, ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এই অভ্যাস পরিত্যাগ করিবার পরও বহুদিন পর্যন্ত আমাদের মনে অতীতের স্মৃতি সলজ্জ অনুশোচনা জাগাইয়া তুলে। যৌবন-উষার এই অপরিহার্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে আমরা অনেকেই বার্ধক্যের জরা-ক্লৈব্যের কারণ খুঁজিয়া মরি। এমন কতকগুলি কেস্ আমরা জানি, যেখানে ব্যক্তিবিশেষ জীবনে কখনো স্বমেহন অভ্যাস না করিয়াও চল্লিশে ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথচ অন্যজন কৈশোর-যৌবনে খুশীমতো বীর্যক্ষয় করিয়া, পঞ্চাশোর্ধে বহাল্-তবিয়তে রহিয়াছেন।

মানসিক দ্বন্দ্ব

স্বমেহন সম্বন্ধে বহুবিস্তারিত যুক্তিতর্কের অবতারণা করিবার অবকাশ এখানে নাই। অত্যধিক পাণিমেহন দ্বারা কতটা ক্ষতি ও অল্প পাণি-মেহনে কতটা উপকার হয়—তাহার পরিমাপ করা অথবা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া উহার গুণাগুণের বিচার করাও এখানে সম্ভবপর হইবে না। তবে বহুদর্শীতা ও গভীর অধ্যয়নের বলে বলীয়ান্ হইয়া আমরা বলিতে পারি, চৌদ্দ-পনেরো বৎসর বয়স হইতে স্বাভাবিক যৌনসম্বন্ধ স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত মাসে তিন-চারিবার কৃত্রিম উপায়ে শুক্রক্ষেপণ করিলে, সুস্থ শরীর-মনের কোন ক্ষতিই করে না; তা' ছাড়া এতদ্বারা স্বপ্নদোষের হস্ত হইতে প্রায় নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। বয়স ও সুস্থতা হিসাবে ইহাপেক্ষা

স্বমেহনের নির্দোষতা

ঘন ঘন স্বমেহনেও আধ্যাত্মিক বা আধি-ভৌতিক কোন স্পষ্ট অপকার করিতে নাও করিতে পারে—যদি উহার সহিত আত্মগ্লানির আতিশয্য ও বংশগত রোগপ্রবণতা না থাকে *। যাহারা গভীর অনুতাপ ও তীব্র নির্বেদ্-বশে প্রাণপণ শক্তিতে স্বমেহন-লিপ্সাকে বন্ধ রাখিবার চেষ্টা করে, অথচ সম্পূর্ণ কৃতকার্য হয় না, তাহারাই স্বপ্নদোষের দ্বারা আক্রান্ত হয় বেশী। এমনি করিয়া প্রকৃতিদেবী দ্বিগুণ প্রতিশোধ লন। স্বপ্নদোষ পাণিমেহন অপেক্ষা খুব অল্প ক্ষতিকারক, এ কথা কোনো বৈজ্ঞানিকেরই বলিবার স্পর্দ্ধা হয় নাই।

সকলের ধাতু-প্রকৃতি সমান নহে। কেহ একরাত্রে একবার সহবাসেই ক্লান্ত হইয়া পড়েন, আবার তাঁহারই সমবয়সী কোনও বন্ধু হয়ত উপর্যুপরি

কোন্ ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক

দুই-তিনবার রমণেও নির্জীব হইয়া পড়েন না। সেইরূপ একই বয়সের একজন বালক দিনে একবার স্বমেহনে তৃপ্ত ও শ্রান্ত হইতে পারে, অন্যজন হয়ত তিনবারেও সেইরূপ বোধ করে না। রীতিমত প্রাসঙ্গিক

* "At the present day all experienced physicians who have been occupied in the study of masturbation and its consequences hold the view that moderate masturbation in healthy persons, without morbid inheritance, has no bad results at all. It is only excess that does harm ; but even excess in healthy person does less harm that in those with inherited morbid predisposition,"—I. Bloch, OP. CIT. p. 422.

"In itself, masturbation is not a menace to health. It is a substitute for sexual intercourse, and if repeated at regular intervals, is far from having the disastrous effects that scare-mongers are wont to picture. Only all too frequent abuse continued for many years may finally effect the general health."—J. Tenenbaum, OP. CIT. p. 253.

না হইলেও উল্লেখ করা ভাল যে, নিম্নলিখিত চারিটি কারণে স্বমেহন অল্প-বিস্তর ক্ষতির কারণ হইয়া পড়ে :—

(১) স্বভাবত অসুস্থ, রোগ-প্রবণ, দুর্বল ও চৌদ্দ বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালকগণ যখন এই অভ্যাসে রত হয় এবং এই অভ্যাস যখন পাঁচ-ছয় বৎসরের অধিককাল স্থায়ী হয়।

(২) প্রত্যেক মন্দ অভ্যাসের মতো ইহা যখন নেশায় দাঁড়াইয়া যায় এবং ভিতরের স্বয়ম্ভূব প্রেরণার অপেক্ষা না করিয়া ক্রমাগত বাড়িয়া যায়।

স্ত্রী-সহবাস অপেক্ষা স্বমেহন অধিকতর সুলভ ও সহজসাধ্য হওয়ার জন্য কোনো কোনো বালক একটা অনিরুদ্ধ কৌতূহল ও দুর্দান্ত ব্যগ্রতার সহিত বহু বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত ইহার পরিচালনা করে ; কেহ কেহ দিনের মধ্যে চারি-পাঁচ বার পর্যন্ত অবিশ্রান্ত আচরণের ফলে ক্রমাগত নাড়ীতন্ত্রের অবসাদ (nervous exhaustion) ঘটিতে থাকে ; কাযেই ঐ অবসাদ বিদূরিত হইবার সময় না ঘটায়, একটা স্থায়ী নাড়ীজনিত দুর্বলতা (nervous debility) দেখা দিতে পারে। স্বাভাবিক স্ত্রী-সহবাস বা স্বপ্নদোষ অপেক্ষা এই ব্যাপারটিতে নাড়ীগত ও চিন্তাগত ব্যায়াম অপেক্ষাকৃত বেশী হয় এইজন্য যে, প্রায়ই পাণিমেহনের সময় কোন অনুপস্থিত দয়িতের চিত্র মানসনেত্রের সম্মুখে পরিস্ফুট রাখিতে হয়। কল্পনা ও বাস্তবে মিশোনো এ মেহনে পরিশ্রম ও অবসাদ একটু বেশী হওয়া কিছু বিচিত্র নহে।

[স্বভাবদুর্বল বালকের অত্যধিক পাণিমৈথুন কি কি ক্ষতি সাধন করিতে

"If what the quacks and ignoramuses tell us about its dangers be true, humanity ought to have passed into oblivion long ago or at least ought to have entirely degenerated. But we are still alive, hale and healthy."—B. S. Talmey. OP. CIT. p. 237-38.

পারে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ বক্ষ্যমান পুস্তকে অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল।]

(৩) বিলম্বিত অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে যদি পুষ্টিকর আহার্য, স্বাস্থ্যকর বাসস্থান ও নিয়মিত দৈহিক ব্যায়ামের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকে।

(৪) অনুকম্পাপূত মধুর উপদেশ ও আত্মবিশ্বাসের বীজ ছড়াইয়া, অতি ধীরে ধীরে এই অভ্যাস দূর করিবার চেষ্টা না করিয়া, যদি ভৎসনা, প্রহার, ঘৃণা, ভয়-প্রদর্শন বা পরিণামের ভয়াবহ করাল চিত্রাঙ্কন প্রভৃতির দ্বারা ত্বরিৎ তাহার মুলোৎপাটন করিতে যাওয়া হয়।...

মনে রাখিবেন,—স্বতজাগরিত কামোত্তেজনাকে কৃত্রিম উপায়ে প্রশমন করা—সকল শক্তি প্রয়োগে তাহাকে নিরুদ্ধ করিতে যাওয়ার চেয়ে বড় বেশী নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক নহে!

সপ্তম প্রপাঠ

সমকাম ও সমমেহন

অনুশীলনকল্পে এস্থলে পুনরায় উল্লেখ করিয়া যাই,—মানুষ জন্মিয়াই সর্বপ্রথম নিজেকে ভালবাসিতে শিখে। আত্মপ্রীতি ও আত্মকাম তাহাকে স্বার্থপর, স্বাভিমুখী ও অপরের সুখদুঃখের প্রতি উদাসীন হইতে শিক্ষা দেয়। শিশু—মাতা, পিতা বা ভ্রাতাকে সর্বপ্রথম চিনে, তাহাদিগকে ভালবাসে, সর্বদা তাহাদের সঙ্গে কামনা করে সত্য; কিন্তু এই প্রেমের মধ্য দিয়া সে নিজের অহংকার (Ego) সম্বন্ধেই সচেতন হয়। 'আমি আছি তাই তুমি আছ'—এই জ্ঞানে সে নিজেকে মহিমামণ্ডিত করে। তাহার দৃষ্টি হয় ক্ষুদ্র, তাহার বুদ্ধি হয় অবোধ্য, তাহার জ্ঞান হয় সীমাবদ্ধ; তাই সে দুনিয়ার সর্বত্র শিশ্‌মহলের মত যে সকল দর্পণক সন্নিবদ্ধ দেখে, তাহার মধ্যে কেবল নিজ রূপেরই সহস্র প্রতিফলন দেখিতে পায়। এই সংস্কারের বশেই, অপরের বিনা উপদেশেও কিশোর স্বমেহন বা পাণিমেহন করিতে প্রণোদিত হইতে পারে। তারপর একটা কালক্রম আসে, যখন সে পরের সুখের প্রতি সচেতন হয়। এই সময় তাহার আত্ম-প্রীতির কেন্দ্র যেন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া, একাংশ অপরের ওপর প্রতিফলিত হয়; পরকে প্রীত করিয়া নিজে প্রীত হইবার একটা অপরিস্ফুট আকাঙ্ক্ষা তাহাকে পাইয়া বসে। ইহাই তাহার প্রেমের অঙ্কুর।

প্রেমের আদ্যাবস্থা —আত্মকাম

এই অঙ্কুর সে বপন করে সর্বপ্রথম সমলিঙ্গাত্মকের প্রাণে। তখন যেন তাহার প্রেমমার্গের গায়ত্রীমন্ত্র হয়—'তুমি আছ আর আমি আছি।' ব্যষ্টি-জীবনে প্রেমের ক্রমবিকাশ-পথে সোপান সমজাতিক্ প্রেম বা সমকাম একটা অপরিহার্য ধাপ *। জ্যোতির্ময়-কান্তি তরুণ তাপস ঋষ্যশৃঙ্গ গভীর বনে একমাত্র পিতা বিভাণ্ডকের সহিত তপশ্চর্যায় নিযুক্ত ছিলেন; কামের বিচিত্র উপাদানসমূহ হইতে তিনি আবাল্য বহুদূরে লোক-সমাজের বাহিরে ছিলেন। তথাপি

দ্বিতীয় অবস্থা—সমকাম

অঙ্গ-রাজকন্যা শান্তার (মতান্তরে—বারাঙ্গনা-কন্যার) বিলাস-বিভ্রম ও চটুল লীলা-লাস্য দেখিয়া, ক্ষণিকের মধ্যে অতনু অনঙ্গ তাঁহার মনের মধ্যে শিহরণ জাগাইয়া তুলিল। বিভাণ্ডক-মুনির নিকট কিশোর তাপস যখন তাঁহার হৃদয়ের এই অপরূপ ভাবান্তরের বিষয় বলিলেন, তখন প্রথম প্রেমের উপলক্ষটিকে সহজ জ্ঞানের বশে পুরুষ (সুতঃ সুরানাম্) বলিয়াই বর্ণনা করিলেন।...

তারপর কালক্রমে যৌনজীবনের পরিণতি ঘটে বিষমকামে (heterosexuality). উচ্চতর সাধন-হর্ম্যের যেমন ধ্যান, ধারণা ও সমাধি তিনটি অনিবার্য সোপান, ইহাও অনেকটা তেমনি। কেহ কাহাকেও

* "In the course of this development there are supposed to be stages in which the individual's own body is the chief loved object, in which others of the same sex are the chief object of love and eventually members of the other sex. The normal individual is supposed to pass through all these stages and to come out a fully heterosexualized person 'on whom the sex instincts find expression and eventually become subordinate to other functions."—Prof. E. S. Conklin in PRINCIPLES OF ABNORMAL PSYCHOLOGY, p. 154.

ছাপাইয়া উঠিতে বা ক্রমভঙ্গ করিতে পারে না। কিন্তু পরিণতবয়সেও আত্মকাম ও সমকাম মানবমন হইতে একেবারে মুছিয়া যায় না; তাহারা হ্রস্ব ও হৃতপ্রতাপ হইয়া সচেতন মন হইতে অচেতন বা অবচেতন মনের কোণে গিয়া লুকাইয়া থাকে; স্বাভাবিক মানুষ বাহ্যত তাহাকে প্রায় ভুলিতেই বসে। এ যেন ঠিক—বাগানে মরসুমী ফুলের গাছ জন্মিল, ফুলের শোভায় সকলকে মুগ্ধ করিয়া তাহারা ঝরিয়া পড়িল, গাছগুলিও মরিয়া গেল; মানুষ কয়েকটি শুষ্ক ফুল হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া, একটা কৌটায় পুরিয়া তাকের এক কোণে তুলিয়া রাখিয়া দিল।...

সমাধিতে যেমন দুই অবস্থা—সবিকল্প ও নির্বিকল্প যোগ, প্রেমেরও তেমনি দুই অবস্থা। একটি, পূর্ণ আত্মদান—অহংতত্ত্বের অবলোপ, যেন চিনি চিন্তা করিতে করিতে চিনিতে মিশাইয়া যাওয়া; আর একটি, নিজের অহংকারকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একাংশ প্রেমাস্পদে সমর্পণ করা, যেন নালী কাটিয়া এক পুকুরের অর্ধেক জল অন্য এক পুকুরে চালাইয়া দেওয়া—যাহাতে দুইয়েরই পৃথক অহংবোধ বজায় রাখিয়া উভয়ের সংযোগ সাধন করা যায়। প্রথম শ্রেণীর প্রেম জগতে বিরল; স্বার্থপর সংসারে দ্বিতীয় শ্রেণীর মিলনাকাঙ্ক্ষাই অতি সাধারণ। অপরের সুখবোধের প্রতি অনুকম্পা না রাখিয়া, নিজের সুখভোগের চেষ্টাই মানুষের (বিশেষ করিয়া পুরুষ মানুষের) মধ্যে বেশী দেখা যায়। প্রেম যখন খুব উন্নত হয়, তখন 'তুমি আছ বলিয়া আমি আছি'—এই বোধ জন্মিতে পারে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত সেই 'কাচা আমি' ও 'পাকা আমি'র ব্যাখ্যা এস্থলে অনেকাংশে প্রযোজ্য। যাহা হউক, ইহা নিশ্চিত যে, আত্ম-কামের বীজ কোন কালে মরিয়াও মরে না।

প্রেমে সবিকল্প ও নির্বিকল্প ভাব

আবার সমলিঙ্গাত্মক জাতি ব্যতীত মানুষ কর্মক্ষেত্রে এক পা-ও

চলিতে পারে না। কি আফিসে, কি ক্রীড়াবাসরে, কি ভ্রমণে, কি অভিযানে, কি জ্ঞানাহরণে, কি ধর্মরাজ্যে, পুরুষ পুরুষের সাহচর্য্য ব্যতীত বাঁচিতে পারে না। সেইজন্য সমকামের অসাক্ষাৎ প্রভাব হইতে কোন কালেই মানুষ মুক্ত হইতে পারে না। দার্শনিক প্লেতো তাই রমণীর প্রতি ভালবাসাকে নীচ পাশবিক বৃত্তি বলিয়া অভিহিত করিয়া, পুরুষের বাহ্য ও আন্তরিক সৌন্দর্যের উপাসনাকেই পুরুষের পক্ষে আদর্শ প্রেম (Platonic love) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আন্তঃপুরুষিক প্রেম সকল স্থলে, সকল শ্রেণীর মধ্যে, সর্ববয়সেই দেখা যায়। পরিণত বয়সে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণের মধ্যে হয়ত রূপতৃষ্ণার সূক্ষ্ম অনুভূতি গোপনে সঞ্চারিত হইলেও হইতে পারে; কিন্তু তৎপ্রতি সর্বদা একটা গুণগ্রাহিতার ভাব, পরস্পরকে উপলব্ধির ভাব, অথবা অহেতুক দুর্বলতার ভাব থাকিতে দেখা যায়। Friendship অথবা favouritism—যাহাই বলা যাক্ না, উহার মূলে সংগুপ্ত থাকে সমকাম; তাহাতে স্পর্শনাবেগও থাকে, আনন্দবোধও থাকে,—তবে সাধুতার ছদ্মবেশে, ধীর শান্ত সংযতভাবে! জার্মান্ কবি গেটে তাঁহার সুবিখ্যাত পত্রাবলীতে এই আন্তপুরুষিক প্রেমভাবটি একটি ছত্রে চমৎকার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—"Let it be admitted that this love is seldom pushed to the highest degree of sensuality, but rather occupies the intermediate region between inclination and passion*."

সমকামের অসংজ্ঞাত বিকীরণ

সর্বদেশেই দেখা যায়, একটা বয়স-সীমা পর্যন্ত তরুণে-তরুণে, তরুণী-তরুণীতে ভাবাবেগপূর্ণ ভালবাসা জন্মে। সে ভালবাসা অনেকস্থলে বেশ গভীরত্ব ও স্থায়িত্ব লাভ করে এবং কামপরিশূন্য হয়। এই ভালবাসারই

* GOETHE'S LETTERS, vol. vii, p. 314 (Weimer, 1890)

সামাজিক পরিভাষা 'বন্ধুত্ব' ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা 'সমকাম'। কিন্তু কোনো কোনো স্থলে, তাহার মধ্যে উৎকট যৌনাবেগ প্রশমন-সঙ্কল্প লইয়া প্রকট হইয়া উঠে। তাহার ফলে আসে উদ্বেলাবস্থা এবং তাহার ফলেই বিযোনি-মৈথুনের উৎপত্তি। যাহারা কৈশোর বা যৌবনে বিযোনি-মৈথুন রত হয়, তাহাদের প্রায় সকলেই বিবাহ করিলে বা স্থায়ীভাবে স্বাভাবিক মৈথুনের রসাস্বাদী হইতে পারিলে, এই অভ্যাস চিরকালের তরে পরিত্যাগ করে। কেহ কেহ আবার সমভাবে দুই প্রকার মৈথুনে আসক্ত (উভকামী) হইয়া থাকে। দুই একজন কেবল ঐ অস্বাভাবিক অভ্যাসকেই চিরকাল যৌন-তৃপ্তির একমাত্র প্রণালী বলিয়া জ্ঞান করে।

সমকামের আবহমানতা

অনেক যৌন-বৈজ্ঞানিক ও সমাজতাত্ত্বিক্ এই ব্যাপারটির সুসঙ্গত আলোচনা করা দূরে থাকুক, নামোল্লেখ করিতে অল্লাধিক ঘৃণা বোধ করেন। কিন্তু বিজ্ঞানের চর্চায় লজ্জা বা ঘৃণার স্থান নাই। চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে গিয়া শব-ব্যবচ্ছেদে সঙ্কুচিত হইলে, অথবা ফৌজদারী উকীল হইয়া নারী-হরণ ও বলাৎকারের নথীপত্র গ্রহণে আপত্তি করিলে তো চলিবে না।

সচরাচর দেখা যায়, রূপের মোহে পুরুষ যত সহজে আকৃষ্ট হয়, রমণী তত সহজে হয় না। প্রথম দর্শনে প্রেমের সঞ্চার এযাবৎ যত পুরুষের হইয়াছে, তদপেক্ষা রমণীর সংখ্যা কম। কিন্তু ক্রমাগত দর্শনে বা গুণের পরিচয়ে বা বিশিষ্ট গুণবত্তার অভিনয়েও রমণীর হৃদয় সহজে প্রেমপ্রবণ হইয়া উঠে। সমজাতীয়ের মধ্যে পুরুষলোক যতটা শীঘ্র পরস্পরের প্রীতি-পরায়ণ ও কল্যাণকামী হইয়া উঠেন, রমণীর ততটা শীঘ্র হইতে পারেন না।

পাঠকগণ শুনিয়া নির্বাক্ হইবেন,—গ্রীসের এমন একদিন ছিল,

যখন উচ্চনীচ সকলেই বিশ্বাস করিত যে, ভালবাসার প্রতিদান বালক যেরূপ দিতে পারে, বালিকা সেরূপ পারে না। গ্রীসে বাল-ধর্ষণ ও সমমেহনের দুরন্ত ক্ষুধা, এককালে স্বাভাবিক বলিয়া সমাজ গ্রহণ করিয়াছিল। দুই হাজার বৎসরাধিক কাল পূর্বে ক্রীট্‌দ্বীপ ও এথেন্স্‌কে কেন্দ্র করিয়া, এই বিষাক্ত বিলাসিতা পশ্চিম-এসিয়ার ও পূর্ব-ইউরোপেও ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দার্শনিক-প্রবর সোক্রেতিস্‌ য়্যাল্‌সিবিয়াদিসের সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া কিরূপ প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন, পরিশেষে তিনি কি অপরাধে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় অনেকেরই অবিদিত নাই *। রোমের শুধু ইতর ও ভদ্রসমাজে নহে, জুলিয়াস্‌ সীজার, অগস্‌টাস্‌, ক্লডিয়াস্‌, ট্রাজান্‌, হ্যাড্রিয়ানের মতো রাষ্ট্রনেতা ও নৃপতিকুলের মধ্যেও এই কুপ্রবৃত্তির দুষ্টব্রণ বিসর্পিত হইয়াছিল। সাত হইতে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেও ব্যাবিলোনিয়া, ফিনিসিয়া, য়্যাসিরিয়া প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতার মর্মকোষেও এই কদভ্যাসের কীট প্রবেশ করিয়াছিল। মুশার বিধানে বিযোনি-মৈথুনকারীর পাপের শাস্তি কিরূপ হওয়া উচিত, তাহার উল্লেখ আছে। তদানীন্তন কালের এশিয়া মাইনরের Sodom নামক শহরে এই অভ্যাস নাকি প্রতি গৃহে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল; পরিশেষে শহরটি নাকি বিধাতার অভিশাপে ধ্বংস হইয়া যায়। Sodomy শব্দের উৎপত্তি হয় এই Sodom শহরের নাম হইতে।

বেশীদিনের কথা নহে, অস্কার ওয়াইল্ড্‌ বাল-ধর্ষণের মাম্‌লায় পড়িয়া

* "Alcibiades, the spoiled youth and friend of Socrates, is an example of a philosopher's intimacy which scandalized public opinion and aroused the anger of his jealous spouse, Xantippe, the prototype of all shrews."—THE RIDDLE OF SEX, pp. 296–97 (New York, 1930). আরো Thoinot ও Weysse-প্রণীত

যেরূপ জগৎ-প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, 'ডি প্রফান্ডিস' লিখিয়া বোধ হয় ততটা হইতে পারেন নাই। ১৯০৭ সালে কৈজর উইল্‌হেল্‌মের দরবারে বোমা-বিস্ফোরণের ফলে যে জগৎপ্রসিদ্ধ 'ইউলেনবুর্গ্‌ ট্রায়াল্‌' অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কল্পনাতীত কদর্য যৌন-জীবনের গূঢ় রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল; নামজাদা সামরিক কর্মচারীরাও সমমেহী বা বালধর্ষী ছিলেন, তাহা সাক্ষ্যপ্রমাণে বাহির হইয়া পড়ে। নিঃসংশয়ে জানা গিয়াছে, জগতের কতকগুলি প্রসিদ্ধ কবি ও শিল্পী এই অস্বাভাবিকতার ঘোর উপাসক ছিলেন। আমাদের দেশের কয়েকজন জীবিত ও মৃত লোকপ্রিয় সাহিত্যিক, সংবাদপত্রসেবী, বৈজ্ঞানিক, ভূম্যধিকারী ও কবি এবং ব্যায়াম-কুশলী ব্যক্তিকে এই কদভ্যাসানুরক্ত বলিয়া জানা গিয়াছে; এমন কি, উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের একজন প্রথিতযশা অভিনেতা বালমেহনের ভক্ত ছিলেন।

Dr. Magnus Hirschfeld-এর মতে, কুড়ি হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের মধ্যে জার্মানীর যে সকল অধিবাসী আছে, তাহাদের শতকরা দুইজনই 'সমমেহী'; ইহা ব্যতীত উভকামীদিগের (bisexual) সংখ্যাহার শতকরা চারিজন। অধ্যাপক হ্যাভলক্‌ এলিস্‌ স্বতন্ত্র হিসাবে এই দুই শ্রেণী মিলাইয়া ইয়োরোপের সমমেহীর গড়্‌পড়্‌তা হার শতকরা পাঁচজন ধরিয়াছেন।

আমাদের দেশে এরূপ অপরাধীর সংখ্যা কত তাহা নির্ণয় করিবার প্রণালীবদ্ধ চেষ্টা এ পর্যন্ত কেহ করেন নাই; আমরা কিছুদিন পূর্বে আরম্ভ করিয়াছি। তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতবর্ষের হার জার্মানী বা ইউরোপের কোনো দেশ অপেক্ষা বেশী বা কম হইবে না। দিক্‌ হিসাবে

MEDICO-LEGAL MORAL OFFENCES নামক পুস্তকের Homosexual offences অধ্যায় দেখুন (Davis & Co. 1927).

ভারতে পূর্ব অপেক্ষা পশ্চিমে, উত্তর অপেক্ষা দক্ষিণে, স্থান হিসাবে পল্লী অপেক্ষা শহরে, সম্প্রদায় হিসাবে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদিগের ভিতর এই অভ্যাস বেশী প্রচলিত বলিয়া মনে হয়। বাল-ধর্ষণের ঘটনা অন্যান্য সভ্যদেশের ন্যায় আমাদের দেশে বিরল নহে ; এরূপ অপরাধী মাঝে মাঝে ধরা পড়িয়া দণ্ড পায়।

অস্থায়ী সমমেহী

অস্থায়ীভাবে স্ত্রী-সহবাস-বঞ্চিত হইল, অনেকে (নিম্ন শ্রেণীর সৈন্য, পাহারাওয়ালা, কয়েদী, জাহাজের খালাসী, প্রবাসী যুবক, পাচক, খানশামা, ভৃত্য এবং স্কুলের শিক্ষক ও গৃহ-শিক্ষক পর্যন্ত) প্রয়োজনীয় কদভ্যাস-বোধে সমমেহনের শরণ লন। পুনরায় অবস্থার পরিবর্তন হইলে, তাঁহারা স্বাভাবিক যৌন-সম্মেলনে প্রত্যাবর্তন করিয়া, পূর্ববৎ প্রসাদ লাভ করেন। কোনো স্থলে আবার সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক কারণে দরিদ্র ও অশিক্ষিত লোক একটি 'লৌণ্ডা' রক্ষা করে। যেমন, আনাতোলিয়ার তুর্কী কৃষকগণ কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাই অল্প খরচে যৌনপ্রবৃত্তি মিটাইবার উৎকৃষ্ট ফিকির বলিয়া মনে করে *।

যাহাহউক, সূক্ষ্ম যৌন-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লইয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, কিশোর বয়সে অস্থায়ীভাবে (চৌদ্দ-পনের হইতে সতের-আঠারর মধ্যে) স্বমেহন বা পারস্পরিক সম্মতিজনিত সমমেহনকে খুব অস্বাভাবিক বা দণ্ডনীয় মহাপরাধ বলা চলে না। পরন্তু কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, ইহাদ্বারা তাহারা অদূর ভবিষ্যতের

* These people, when asked why they practised such a thing forbidden by the Koran, answer, "Effendim, what should I do ? I am poor and can't afford a wife. I have to take what I can get."—CRITIQUE OF LOVE, p. 205 (The Mecaulay Co., 1929).

বিষমমেহনের (heterosexuality) জন্য ব্যবহারিকভাবে প্রস্তুত হইতে পারে *। স্বমেহনের অভ্যাস যেরূপ কুসঙ্গীর শিক্ষার অভাবেও স্বয়ং গঠিত হইতে পারে, সমমেহনাভ্যাস সেরূপভাবে উৎপন্ন হয় বলিয়া আমাদের জানা নাই। গভীর ভালবাসার অভাবেও ব্যাপকভাবে সমমেহনের অভ্যাসে কোনো কোনো বালককে রত হইতে দেখা যায়। প্রায় স্থলে এইরূপ আচরণ, অকালে আত্যন্তিক কামবোধনের স্পষ্ট লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। অত্যন্ত ধীর বুদ্ধির সহিত এই কামোৎসাহকে মহত্তর প্রণালীর মধ্যে সঞ্চালিত করিয়া দিতে হয়।

আমরা এমন কতকগুলি সমমেহীর কথা জানি, যাহারা কোন নারীর নিকটই উদ্বেলাবস্থা প্রাপ্ত হয় না, তাহাদের প্রতি কোন আকর্ষণই অনুভব করে না। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইহাদের তিনচতুর্থাংশই বিবাহিত। লেখক এমন দুইটি প্রৌঢ় ভদ্রলোকের বিষয় অবগত আছেন, যাঁহারা নিজেদের পায়ুকাম-প্রশমনের জন্য দুইজন যুবককে ভালবাসেন, এবং এই একদেশদর্শী ভালবাসা এতদূর গড়াইয়াছে যে, তাঁহারা যুবকদ্বয়দ্বারা আপন আপন স্ত্রীকে উপভুক্ত করাইতেও পশ্চাৎপদ নহেন (এক ব্যক্তির আবার দ্বিতীয় পক্ষের পরমসুন্দরী যুবতী স্ত্রী!)। বলা বাহুল্য, এই ভদ্রলোকদ্বয় তাঁহাদের কিশোর কালের অভ্যাসের নিকট চিরকালের জন্য দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে স্ত্রীউপাদান সমধিক পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, তাই ইঁহারা যৌন-জীবনে স্ত্রীঅংশ অভিনয় করিতে ভাল-

* "Dr. Otto Gross in his interesting study entitled 'Drei Aufsatze Uber den inneren Konflikt' maintains that in our cultural life, the homosexual components fulfill the function of preparing the individual for better harmony later with the opposite sex."—From Wilhelm Stekel's FRIGIDITY IN WOMAN, Vol. ii. p. 290.

বাসেন। কাহারো কাহারো সমকাম সমমেহনের মধ্য দিয়া স্ফূর্তিলাভ করিতে চাহে না সত্য, কারণ উহা সচেতন মনের তলায় থিতাইয়া থাকে। তাঁহারা সংসারে যথারীতি স্বামীর ভূমিকা অভিনয় করিয়া যান্—নিয়মিত পুত্রকন্যার জন্মদানও করেন; কিন্তু নিজের অজ্ঞাত-সারে একটি বন্ধুর প্রতি এমনভাবে মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে, বন্ধুটি তাঁহার স্ত্রীর প্রেমের অংশীদার হইলেও তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন না। এরূপ চরিত্র আধুনিক কালের কতকগুলি উপন্যাস-নাটকে অঙ্কিত হইয়াছে। প্রেমবৈজ্ঞানিকগণ ইহার নাম দিয়াছেন—"The Beloved Triangle" বা "The Eternal Triangle."

আমাদের দেশের স্কুল ও কলেজে সমমেহনাভ্যাস কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত খুব দ্রুতগতিতে প্রসার-লাভ করিতেছিল; শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে সম্প্রতি এই অভ্যাস কতকটা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। যুবক-যুবতী ও কিশোর-কিশোরীদিগের অবাধ মেলামেশার ফলে এই অভ্যাসের প্রভাব কিছু কমিতে পারে বটে, কিন্তু একেবারে নির্মূল হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। যাহাহউক, ভরা যৌবন বা তৎপরবর্তী কালে সমমেহনের বদ্ধমূল প্রবৃত্তি বা অভ্যাস নিতান্ত অস্বাভাবিক ও চিকিৎসার যোগ্য।

সমমেহনে এক পক্ষ কামিক অর্থাৎ সক্রিয় এবং অন্য পক্ষ ভৌগিক অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় থাকে। যাহারা সক্রিয় সমমেহী, তাহারা সাধারণত একটু বেশী বয়সী, অধিকতর শক্তিশালী, অপেক্ষাকৃত কম লাজুক হয়, এবং নিজেদের আচরণে আপন সঙ্গী-সম্প্রদায়ের মধ্যে গৌরব বোধ করে। ভৌগিক বালমেহীরা অপেক্ষাকৃত নমনীয়মনা, দুর্বলদেহী ও অত্যন্ত লাজুক্ হয়। অবশ্য এ নিয়মেরও বিপর্যয় দেখা যায়। বিশেষত

দ্বিবিধ সমমেহী কামিক ও ভৌগিক

অধিকবয়স্ক কামিক সমমেহীরা প্রায়শ ভৌগিক সমমেহীর ন্যায় লক্ষণাক্রান্ত হয়। আবাসিক বিদ্যালয়ে, পুলিস ও সৈন্যদের ব্যারাকে, মঠে ও জেলে অনেক সময় 'পারস্পরিক সমমেহী' দেখা যায়। একই ব্যক্তি সমভাবে বা বয়সের পরিবর্তনে ভৌগিক ও কামিক—উভয়বিধ সমমেহী হইতে পারে।

যাহাহউক, এ সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনা করিয়া, পুস্তক ভারাক্রান্ত করিবার প্রয়োজন নাই। তবে ইহাই আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পুরুষের যৌনবোধ-প্রসঙ্গে সমমেহন একেবারে অস্বাভাবিক বা উপেক্ষার বিষয় নহে।

অষ্টম প্রপাঠ

পূর্ণবয়সে যৌনবোধ

নারীর যৌনবোধ-প্রসঙ্গে পুরুষের যৌন-বোধের অনেক তথ্যই আপনা-আপনি প্রকাশ পাইবে। পুরুষের যৌনবোধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে গেলে, একটি পরম বৈশিষ্ট ধরা পড়ে যে, জগতের সকল দেশের সকল সাধারণ নারীর যৌন-জীবনের অন্তস্থলে যেমন একটা সঙ্গতি ও সমরূপতার ধারা বহে, সকল পুরুষের যৌন-জীবন কিন্তু সেরূপ নহে ;—ইহার বৈচিত্র, বৈষম্য ও তারতম্য এত অধিক যে, তৎসম্বন্ধে একটা সাধারণ নিয়ম-সূত্র তৈয়ারী করা বড় কঠিন ব্যাপার।

যৌন-বোধে বৈচিত্র

ইহার একটা কারণ আছে। এখনো জগতের অধিকাংশ নারীই একইপ্রকার গার্হস্থ জীবন, একই আবেষ্টনী, একই আচার-ব্যবহার, প্রথা ও মতবাদ, একই কার্য ও চিন্তা-স্রোতের মধ্যে, তাঁহাদের অন্তর্মুখী মন লইয়া, জীবন অতিবাহিত করেন। স্থান, কাল, বংশানুক্রম, অর্জিত শিক্ষার প্রভাবে তাঁহাদের স্বভাবের মধ্যে প্রতীয়মানত যত বৈচিত্রই সংঘটিত হউক না কেন, মনোবিদের নিকট তাহার একটা সৌসাদৃশ্য ধরা পড়ে ; বিশেষভাবে তাঁহাদের যৌনবোধের পরিণতির মধ্যে তাল-গতি-মাত্রার কিছু পার্থক্য থাকিলেও যেন সুরের একটা একত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

কিন্তু পুরুষের মন বহির্মুখী—কর্ম বহুরূপী—জ্ঞানের প্রণালী বহুবিধ।

তাহার বিদ্যা, তাহার বুদ্ধি, তাহার উপজীবিকার ক্ষেত্র, তাহার চিন্তার ধারা পরস্পর বিভিন্ন। কাযেকাযেই সকল পুরুষের যৌন-বোধ সমান প্রণালীতে বিকশিত হয় না ;

তাহার কারণ

এমন কি, একই পরিবারের অন্তর্গত দুই জনের যৌন-জীবনের সাধারণ ভিত্তি খুঁজিতে গিয়া ব্যর্থমনোরথ হইতে হয়। এই প্রসঙ্গে পুরুষ ও নারীর দেহগত একটা পারস্পরিক পার্থক্যের উল্লেখ করিয়া গেলে বোধ হয় খুব অশোভন হইবে না। দশটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষের যৌন-যন্ত্রের মধ্যে দৈর্ঘে-প্রস্থে, গঠন-ভঙ্গিমায় যতখানি পার্থক্য থাকে, দশটি পূর্ণবয়স্কা রমণীর যৌন-যন্ত্রের মধ্যে ততখানি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

মনোবৈজ্ঞানিক কিন্তু হঠিবার পাত্র নহেন। পরস্পরের ভিতর এই অদ্ভুত বৈষম্যের মধ্য হইতেও তাঁহারা দুই-চারিটি সাধারণ গুণ টানিয়া বাহির করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সেগুলি সকল পুরুষের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য না হইলেও অধিকাংশের প্রতি বটে। নিম্নে সেই গুণগুলি লইয়াই একটু আলোচনা করা হইবে।

পুরুষের যৌনাবেগ সহজ-জননশীল। খড়ের গাদা আতপ-তপ্ত হইয়া যেমন আপনাআপনি অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠে অথবা একটা খড় জ্বলিলে সমগ্র স্তূপ যেমন অল্পক্ষণে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া যায়, এবং একবার জ্বলিলে তাহাকে নির্বাপিত করার সময় পাওয়া যায় না—এ আবেগ ঠিক তেমনি। এই আবেগের গভীরতা কম, মনের উপর প্রভাব কম ; অথচ উন্মাদনা বেশী, চাঞ্চল্য বেশী, ব্যাপকতা বেশী। শশকের মতো তাহার প্রথম গতি অতি দ্রুত, কিন্তু স্তব্ধ অবসন্ন হইয়া যায় অতি শীঘ্র। আবার যৌনক্ষুধার উপাদান পুরুষ যেমন গোগ্রাসে গিলিয়া নিশ্চিন্ত হয়, নারী তেমনি তাহা একদিকে মৃগের ন্যায় ধীরে ধীরে চর্বণ করে, অন্যদিকে গাভীর মতো অবসর-সময়ে রোমন্থন করে।

মিশর ও ব্যাবিলোনিয়ায় এককালে মাতৃকৃতন্ত্র সমাজ ছিল; রমণী তখন দেশের দণ্ডমণ্ডের কর্ত্রী ছিলেন। ভারতেও কিছু দিনের জন্য মাতৃকৃতন্ত্রের প্রচলন হইয়াছিল; কি কি কারণ বশত তাহা লোপ পাইল—সে সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব। কিন্তু যুগযুগান্তের ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া, এখনো ত্রিবাঙ্কুর ও মালাবার উপকূলের হিন্দু পরিবারের মধ্যে, হিমালয়ের উত্তরাংশে, পলিনেশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার কয়েকটি উপজাতির সমাজে মাতৃকতন্ত্রের শাসন জাগিয়া আছে। স্ত্রী বা পুরুষ যখনই সমাজ-রাষ্ট্রের অধিনায়ক হইয়াছেন, তখনই আপন জাতির সুখ-সুবিধার মুখ চাহিয়া আইন-কানুন্ প্রণয়ন করিয়াছেন, প্রতিপক্ষের স্বাধীনতাকে পাকে-প্রকারে খর্ব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই পক্ষপাতদুষ্ট শাসনের চাপে পড়িয়া, দেশ ও যুগ-বিশেষে এক এক জাতির স্বাভাবিক যৌন-বোধ অত্যন্ত খর্ব ও অভ্যাসসাপেক্ষ হইয়া পড়িয়াছে।

ভোগরাগে পুরুষের স্বাধীনতা

ভোগতৃষ্ণা মিটাইবার জন্য পুরুষ আমাদের দেশে (শুধু আমাদের দেশে বলি কেন, আধুনিক সকল সভ্য দেশেই) যতখানি অবাধ অধিকার পাইয়াছে, যৌন-বোধকে স্বভাবসঙ্গত ছন্দ দিবার যেরূপ সুযোগ পাইয়াছে, ইচ্ছামতো রসাস্বাদের পাত্র-নির্বাচনে যেভাবে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, স্ত্রীলোক যদি সেরূপ পাইত, তাহাহইলে তাহাদিগের যৌন-জীবন কিরূপ দাঁড়াইত বলা যায় না। তবে পুরুষের মতোই তাহাতে একটি জটিল বৈষম্য ও বৈচিত্র দাঁড়াইত—সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে আমেরিকা ও উত্তর ইয়োরোপীয় দেশগুলিতে নারী-স্বাধীনতার নামে যে স্বেচ্ছাচার উত্তরবিহারের ভূমিকম্পের মত পৃথিবীর চিন্তাশীল সমাজ-হিতৈষীদিগের মস্তিষ্করাজ্য

আলোড়িত করিতেছে—যে স্বেচ্ছাচার সহস্র শতকের প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তিমূল শ্লথ করিয়া দিতে বসিয়াছে, তাহার অব্যবহিত ফলাফল সম্বন্ধে সন্ধান লইতে গিয়া, এই সত্যই আমাদের চক্ষে সর্বপ্রথম ধরা পড়ে যে, তথাকার নারীর যৌনজীবনে বহুবিধত্ব ও অভূতপূর্ব বৈজাত্য দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। আমাদের দেশ সম্বন্ধে এ কথা বলিবার এখনো ঠিক্ সময় আসে নাই।

নারীকে যৌন-বিষয়ক স্বাধীনতা দেওয়ার বিরুদ্ধে অনেক পণ্ডিত নানারূপ হৃদয়গ্রাহী যুক্তি প্রদর্শন করেন; আমরা পুরুষ বলিয়া যুক্তিগুলি আমাদের এত হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু শিক্ষিতা নারীও আপন সমাজে অনুরূপ হৃদয়গ্রাহী যুক্তি-সহযোগে পুরুষকে যৌন-স্বাধীনতা দেওয়ার কুফল সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিতে পারেন। মনে হয়, নরনারীত্বের বহির্ভাগে অবস্থিত একজন পক্ষপাতশূন্য প্রতিভাবান বিচারকই উভয় পক্ষের সওয়াল্ শুনিয়া, যথোপযুক্ত রায় দিতে পারেন,—অন্য কেহ নহে।

যাহাহউক, সমাজ-রাষ্ট্রিক্ আইন-কানুনের মারপ্যাঁচের জন্যই হৌক অথবা আপন কর্মক্ষেত্র বহির্জগতে বিস্তৃত থাকার জন্য হৌক্, পুরুষের যৌন-বোধ একবার জাগিলে তাহা শাসন মানে না; বলির খড়্গের ন্যায় একবার উদ্যত হইলে তাহা অভীষ্টের স্কন্ধে নিপতিত না হইয়া তৃপ্তি লাভ করে না।

উত্তেজনার বাহ্য উপাদান

বাহ্য জগতের অনুপ্রাণনা পুরুষ যতটা পায়, নারী ততটা পায় না। সেইজন্য বাহ্যভাবে প্রণোদিত হইয়া (externally stimulated) পুরুষ কামপীড়া অনুভব করে নারীর চেয়ে বেশী। বাহ্য প্রণোদন অর্থে যাত্রা, বায়োস্কোপ, থিয়েটারে কামভাবময় দৃশ্যাদি দেখিয়া, রিয়েলিষ্টিক্ উপন্যাস বা আদিরসাত্মক কাব্য পড়িয়া,

রাস্তা-ঘাটে সুন্দরী নারীর রূপ দেখিয়া বা তাঁহাদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া, ছলাকলাময়ী নারীর নগ্ন বা অর্ধনগ্ন চিত্র বা ভাস্কর্য দেখিয়া, কাহারো মুখে সম্ভোগের অতিরঞ্জিত গল্প শুনিয়া, সন্নিকটে পশু-পক্ষী বা লম্পটের রমণাদি লক্ষ্য করিয়া, যে আবেগ মানব-মনে চাঞ্চল্য উপস্থিত করে।

দুই শ্রেণীর বিবাহার্থী যুবক

আমাদের দেশের অধিকাংশ যুবকই বিবাহের পূর্বে নারী সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে না, এমন কি সহবাসের ভাবগত মূল তত্বও তাহারা নির্ভুলভাবে অধিগত করিতে পারে না। (১) ইহারা কৈশোরের যৌন-জীবন আরম্ভ করে স্বমেহন বা সমমেহন দ্বারা এবং বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত তাহারা এই অভ্যাসগুলিকেই যৌনতৃপ্তির সাময়িক পন্থা বলিয়া জ্ঞান করে। এই সকল যুবকের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। (২) আর কতকগুলি যুবক আছে, যাহারা বেশ্যা, অর্ধবেশ্যা বা দুশ্চরিত্রা রমণী-সহযোগে নিধুবনের বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান লাভ করে। ইহাদের সংখ্যা বাঙ্গালা দেশে অবশ্য অপেক্ষাকৃত অল্প। যাহাহউক, এই দুই শ্রেণীর যুবকই বিবাহের পর কিছুদিন পর্যন্ত,—কেহ কেহ আজীবনকাল,—পত্নী লইয়া সুখী হইতে পারে না। রূপোপজীবিনীর নিকট অবিবাহিত যুবকের যে শিক্ষা-লাভ হয়, তাহা পরবর্তীকালে কামকলায় অশিক্ষিতা নববধূর সহিত যোগসূত্র স্থাপনের জন্য তাহাকে প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে না *। অপূর্বরমিতা কিশোরী বধূ যেন তাহার আদর্শের বহু দূরে

* "The company of prostitutes often renders men incapable of understanding feminine psychology, for prostitutes are hardly more than automata trained for the use of male sexuality. When they look among these for the sexual psychology of woman, they find only their own mirror."—Prof. Forel in OP. CIT.

দণ্ডায়মানা বলিয়া বোধ হয়। তখন ক্ষুব্ধ অধীর যুবক তাহাকে মনোমত করিয়া লইবার জন্য নিম্নলিখিত দুই প্রকার উপায়ের শরণাপন্ন হয়।

কেহ হয়ত স্ত্রীর প্রতি বারবণিতার ন্যায় আচরণ করিতে লাগিয়া যায়; ছলা-কলায়, রতিবিষয়ক নির্লজ্জতায়, বাকপটুতায়, সজ্জা-চটুলতায় তাহার স্ত্রীর একান্ত অপকৃষ্টি তাহাকে পীড়া দেয়। প্রেমের পাঠশালায় এই বর্ণপরিচয়বিহীনা মেধাশূন্যা ছাত্রীটিকে অতি সত্বর তাহার বহুকালের অভ্যস্ত কাম-জীবনের সহযোগিনী করিয়া লইবার জন্য সে রুদ্র শিক্ষকের আসন পরিগ্রহ করি। অ-প্রেমের অর্থাৎ সাধারণ বিদ্যার পাঠশালায় সচরাচর যে শিক্ষা-কৌশল ও পদ্ধতি প্রচলিত আছে, এক্ষেত্রেও তাহাই দ্বিগুণ প্রাবল্যের সহিত প্রযুক্ত হয়। বিবাহ-জীবনের এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রের বুদ্ধিবৃত্তির মাপকাটি যে সমান নহে, তাহা ছাত্রীর চেয়ে শিক্ষক ভুলিয়া যান বেশী। যে পাঠ আয়ত্ত করিতে ছাত্রীর পাঁচ দিন সময় লাগে, শিক্ষক তাহা পাঁচ ঘণ্টায় আয়ত্ত করাইয়া দিতে ব্যগ্র হন্; কাযেই শিক্ষার দাগ মুখে লাগে—বুকে গিয়া বসে না।

স্নুরতাভিজ্ঞ যুবকের ব্যবহার

এই অধ্যাপনার মধ্যে মিষ্ট কথা, উপচার-উপহার, অনুনয়-বিনয়ের স্থান থাকে অতি সামান্যই,—রক্তচক্ষু, দন্ত-বিকাশ, তিরস্কার, বল-প্রয়োগ, পরিত্যাগ বা পুনরায় বিবাহ করিবার অথবা চিরকালের জন্য পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দিবার ভয়-প্রদর্শন, ক্ষেত্রবিশেষে প্রহার পর্যন্ত চলে। স্বামীর লালসা-যূপকাষ্ঠে আত্মবলিদানের আশঙ্কা-জনিত অনিচ্ছা—বধূর রূপগুণের বিশেষত্বগুলি নিষ্প্রভ করিয়া দেয়। স্বামীর বিরাগ ও অপছন্দের উচ্চ অভিযোগ সারা বাড়ীতে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। সধবা বা বিধবা

ননদ ও শ্বাশুড়ী কারণ অনুমান করেন এবং বধূর অপারদর্শিতা অবাধ্যতার লক্ষণ বলিয়া বিশ্বাস করেন। করালবদনা শ্যামারূপ স্মরণ করিয়া তাঁহারা শাসন-সমরে লাগিয়া যান। ইহাতে স্বামী ও দেবর সোৎসাহে যোগদান করেন; ভ্রাতৃজায়ারা যুদ্ধের রশদ্ যোগান; শ্বশুর ও ভাসুর হয়ত মৌন সম্মতি দান করিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকেন। কাযেই এই অকরুণ গুরুমহাশয়দের প্রতি যদি নববধূর মন অপ্রসন্ন হইয়া উঠে, তাহার বিরুদ্ধে যদি নিপীড়িতা ছাত্রীটি বিদ্রোহের ধ্বজা উড্ডীন করে, ওই স্বার্থপর ধৈর্যহারা অকৌশলী পতির বিপক্ষে তাহার মনের পটভূমিকায় একটা স্থায়ী বা অস্থায়ী বিতৃষ্ণার ছায়াসুষমা ফুটিয়া উঠে, তাহাতে বিস্ময় মানিবার তো কোনো কারণ নাই!

আবার কোনো যুবক নবীনা রূপযৌবনবতী পত্নীর যৌন-জীবন বিষয়ে দুর্জ্ঞেয় অজ্ঞতা ও কামক্রীড়ার প্রতি দুর্লঙ্ঘ্য সঙ্কোচ দর্শন করিয়া, তাহাকে দেবী-জ্ঞানে সম্মানের সমুচ্চ বেদীর উপর উপবেশন করাইয়া, পাদমূলে শ্রদ্ধাবনত নেত্রে দাঁড়াইয়া থাকে। ছলাকলাময়ী সহস্র-জন-পরিসেবিতা বারনারীর সহিত এতকাল মিশিয়া, তাহার দেহমন অপবিত্র হইয়াছে; এই কলুষিত নিঃশ্বাস অনাঘ্রাত কুসুমে লাগিলে তাহা বুঝি অকালে শুকাইয়া যাইবে!—এই ধারণার বশবর্তী হইয়া, সে প্রেমজীবনের সর্বাপেক্ষা মহৎ অভাবটি ছাড়া তাহার স্ত্রীর সকল অভাবই পূর্ণ করে, উপাদানের সন্নিকটে থাকিয়াও তৃষ্ণাকে সে সসঙ্কোচে কণ্ঠে পুষিয়া রাখে। শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকেও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিবাহিতা বালিকার মনের মণিকোঠায় যখন দেব মনসিজ জাগ্রত হইয়া উঠেন—তখন তাহার সর্ব দেহ যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই পুরুষের স্পর্শ-সুখ কামনা করে, এ সত্যকে এই শ্রেণীর বিবাহিত যুবক উপেক্ষা করেন।... তাহারা বুঝে না যে, ভক্তি—ভগবানকে নিকটে পাইলেই সন্তুষ্ট

হয়, প্রেম—প্রেমিককে আপনার মধ্যে না পাইলে (
পারে না!

প্রত্যেক বিবাহার্থী পুরুষের স্মরণ রাখিতে হইবে
বিষয়ে একদিকে অসহিষ্ণু আগ্রহ ও আত্মপ্রাধা
অন্যদিকে কঠিন উদাসীনতা ও অতিভক্তির
প্রাপ্তবয়স্কা পত্নীর প্রেমজয়ের প্রবল পরিপন্থী

প্রেমার্চনায় চিরন্তন বিস্রম্ভন

বিষয় প্রত্যেক সদ্যোবিবাহিত
করাইয়া দিতে চাই যে, বিবাহ-সংস্কার দ্বারা বা প্রেমার্চনা-উপচারাদির দ্বারা কোনো রমণীকে একবার আপনার আয়ত্তের মধ্যে আনিয়াই পুরুষ জয়ের গৌরবে যেমন আত্মহারা, তেমনি নিশ্চিন্ত হইয়া পড়েন; রমণীর রাগ-সঞ্চারের জন্য তাঁহার আর কিছু নূতন কর্তব্য আছে—এ বিশ্বাস তাঁহার থাকে না! কিন্তু পত্নীই হউক বা উপপত্নীই হউক, আমরণকাল প্রত্যেক উপক্রমের পূর্বে নারীর ভাবোন্মেষের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে বিস্রম্ভন (courtship) করিতে হইবে! এই নীতিটি পুরুষই সর্বাগ্রে ভুলিয়া যান এবং [illegible] Ever-ready Battery [illegible] ন্যায় জ্ঞান করেন। নারী কিন্তু বিবাহের পর অন্তত কিছুকাল পর্যন্ত স্বামীর রাগ-সঞ্চার ও প্রেমোদ্রেকের জন্য যথারীতি চেষ্টা করেন। বৈকালে চুল বাঁধা, গা ধুইয়া ভালো কাপড়খানি পরা, পায়ে আলতা দেওয়া, মুখে স্নো মাখা ইত্যাদি প্রসাধন, বা রাত্রে স্বামীর পা টিপিয়া দেওয়া, চুল টানিয়া দেওয়া বা গাত্রে সুড়সুড়ি দেওয়া প্রভৃতি চিরাচরিত রাগোদ্রেকের লক্ষণ।

ভাবগত বা বস্তুগতভাবে কোনো জ্ঞান সঞ্চয় না করিয়াই, যুবক বা

যুবতী—কাহারও বিবাহ-জীবনে প্রবেশ করা উচিত নহে,—পৃথিবীর প্রধান মনীষীদিগের এই অভিমতের সহিত আমরা একাত্ম না হইয়া পারি না। বিবাহের পরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনো বোধ না লইয়া বিবাহ করার ফলে কোটি কোটি স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরকে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে অসুখী ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন, এরূপ সহস্রাধিক দৃষ্টান্ত আমরা বিদেশী পুস্তকে পাঠ করিয়াছি এবং আমাদের দেশের শত শত ঘটনার বিবরণ স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি।

যৌনজ্ঞানে পুরুষের মূর্খতা

রসজ্ঞা যুবতী অর্থাৎ যে রমণীর যৌনবোধ পরিপূর্ণভাবে জাগ্রত হইয়াছে, তিনি মনে মনে যৌনজ্ঞানে অনভিজ্ঞ লাজনম্র পুরুষের চেয়ে ওস্তাদ্ বীরপুরুষকেই কামনা করেন বেশী *। এমন কি, কোন সযত্ন-পালিতা, শিক্ষিতা, স্বাধীনা সুন্দরী যুবতী, দরিদ্র, অসচ্চরিত্র অথচ নির্ভীক্, স্বাস্থবান যুবককে উপস্থিতমতো তাঁহার প্রতি একান্ত মনোযোগী দেখিতে না পাইলেও, ক্ষোভের চেয়ে লোভের মাত্রা তাঁহার জাগে বেশী; সেরূপ পুরুষের নিকট তিনি আত্মদান করেন অতি সহজে ও বিপুল আগ্রহে। ইহার সাক্ষ্য দেয়—"শেষপ্রশ্নের" মনোরমা, এবং বাস্তব জীবনের আরো শত সহস্র চরিত্র। গী স্থ মোপাসাঁও "Une Vie" গল্পে এমনি একটি মেয়ের অতি করুণোজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়াছেন।

আকৈশোর সাধ্যমতো ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া ও স্বেচ্ছায়

* "Complete abstinence during youth is not the best preparation for marriage in a youngman. Women divine this and prefer those of their wooers who have already proved themselves to be men with other women.—" Prof. Freud in 'SEXUALE PRBLEME.'

বীর্যপাত না করিয়া যে সকল যুবক পরিণয়ের গন্ধগীতিময় নাট্মন্দিরে প্রবেশ করে, তাহারা প্রথম রাত্রেই যৌনাবেগের রুদ্ধমুখ এমনভাবে খুলিয়া দিতে পারে যে, তাহারই অনুরূপ অজ্ঞা, অপক্কা পত্নী বেচারী বিস্ময়ে নির্বাক্ ও বেদনায় বিহ্বল হইয়া পড়ে। কত নববিবাহিত পুরুষ যোনিনালির অবস্থান না জানায়, বধূর মলকোষ্ঠ বা মূত্রনালীর মধ্যে যৌনযন্ত্র সজোরে প্রবেশ করাইতে গিয়া, অথবা দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রচণ্ড আবেগে অক্ষতযোনি পত্নীকে সম্ভোগ করিতে গিয়া, তাঁহাদের ঐ অংশকে আহত ও রক্তাক্ত করিয়া দিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। জার্মাণীর একজন চিকিৎসক এক বৎসরের মধ্যে নব বিবাহিতার গোপন অঙ্গে রমণজনিত বিভিন্নরূপ আঘাতের প্রায় দেড়শত কেস্ দেখিয়াছেন।

অজ্ঞতার কুফল

আমাদের দেশে এ সকল প্রতিবেদন চিকিৎসকের কর্ণে পৌছিবার— এমন কি 'সখী-কর্ণাবধি ব্যস্থতম্' হইবারও উপায় নাই; তাই বেশী উদাহরণ দেওয়া সুসাধ্য নহে। লেখকের এইরূপ আকৈশোর ব্রহ্মচারী কোনো বন্ধু এম্-বি পাশ করিয়াও, ফুলশয্যার রাত্রে, কুমারীর যে সতীচ্ছদ্ (hymen) বলিয়া ভগনালী-মুখ একটা পাৎলা পর্দা থাকে, এবং যাহা প্রথমাভিগমনের সময় অতি সন্তর্পণে শিশ্নাগ্র-দ্বারা ভিন্ন করিতে হয়, তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন্। নবপরিণীতা পত্নীটি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হইতেন, তাহা হইলে চিকিৎসকের ডিগ্রী পাইবার তাঁহার কোনরূপ সম্ভাবনাই ছিল না। যাহা হউক, এই প্রমাদের ফলে যে রক্তপাত হইল, তাহা একখানি দুগ্ধধবল তুর্কী-তোয়ালের খানিকটা অংশ রঙ্গীন করিয়া দিল। এই ঘটনার কথা বিবৃত করিয়া, উপসংহারে এই বন্ধুটি হাসিয়া বলিলেন, "সেই রাত্রেই স্ত্রী নিজের ব্যথা ভুলে, বাথ্‌রুমে গিয়ে

একটিমাত্র দৃষ্টান্ত

তোয়ালেখানি কেচে ঘরের ভিতর মেলে দিলেন্—পাছে সকালে কেউ দেখে ফেলে! দেখ, আমাদের দেশের মেয়েরা গোড়া থেকেই কেমন careful, কেমন sacrificing হয়!"···আর পুরুষরা—বিশেষত ওই তথাকথিত কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচারী টাইপের পুরুষরা-যে কিরূপ careless ও exacting হয়, বন্ধুবর তাহার উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গেলেন !!

বিবাহিত যুবকের আর একপ্রকার অজ্ঞতার দৃষ্টান্তের সহিত লেখক পরিচিত। যে সকল যুবক বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত পাণিমৈথুন, সমমেহন প্রভৃতির দ্বারা নিজেদের যৌনক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের কেহ কেহ প্রথম স্ত্রী-অভিগমনের রাত্রে উত্তেজিত আগ্রহে স্ত্রীকে বক্ষে নিপীড়ন করিয়া, নিজেদের সামর্থ সম্বন্ধে হঠাৎ একটা সশঙ্ক সন্দেহের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে। পূর্বে হয়ত তাহারা কোন কবিরাজী বা হাতুড়ে ধাপ্পাবাজের ঔষধের প্রচারপুস্তিকায় পাঠ করিয়াছিল অথবা কোন অবিচক্ষণ বন্ধুর নিকট শুনিয়াছিল যে, যাহারা কৈশোরে হস্তমৈথুনাদিতে অভ্যস্ত, তাহারা স্ত্রীসঙ্গমে অপারগ্ হয়··· ইত্যাদি, সেই স্মৃতি তাহাদের অবচেতন মন হইতে অকস্মাৎ মিলনের এই মহামাহেন্দ্রক্ষণে গুপ্ত ঘাতকের ন্যায় নিঃসাড়ে বাহির হইয়া আসে। ইহার ফলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের পুরুষাঙ্গ শিথিল হইয়া যায়,—ব্যর্থতা ও বিড়ম্বনার দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, সে পাশ ফিরিয়া, শয্যার একপ্রান্তে শুইয়া পড়ে; সারারাত্র হয়ত অনিদ্রায় কাটে। প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীও একটা উদ্বেগমিশ্রিত কৌতূহলে যে পরিকল্পনার সত্যপরিণতির প্রতীক্ষা করিতেছিল, সহসা তাহার অপ্রত্যাশিত সংহরণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যায়।

প্রথম অভিগমনে অসামর্থ

এই প্রকার পুরুষত্বহীনতা যে সম্পূর্ণ মানসসঞ্জাত ও অচিরস্থায়ী, এ

বিশ্বাস কে তাহাদের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিবে? এই অকৃতকার্যতার অভিজ্ঞান, হতাশা, লজ্জা ও রাত্রিজাগরণের অবসাদের সহিত মিশিয়া, পর-রাত্রিতেও তাহাদের সুষুম্না নাড়ীর উত্তেজনাকেন্দ্রকে আরো অসাড় করিয়া দেয়; শত চুম্বন, শত আলিঙ্গন, শত হস্তবিলেপনেও নতশির শিশ্ন আর উচ্ছ্রিত হয় না। ব্যর্থতার দুশ্চিন্তা যত নিবিড় হয়, ততই এই মানসিক পুরুষত্বহীনতা বৃদ্ধি পায়; অথচ আশ্চর্য যে, ঠিক্ সঙ্গমোপক্রমের সময়টি ব্যতীত অন্য সময়ে অল্পায়াসেই লিঙ্গ সুদৃঢ় হইতে দেখা যায়। ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই এই অসামর্থ সারিয়া যায়। নচেৎ কোন চিকিৎসক বন্ধুর নিকট পরামর্শ লইতে হয়; তাঁহার ঔষধের সঙ্গে ভরসার যে অমোঘ আশ্বাস-বাণী মিশ্রিত থাকে, তাহাই এই শ্রেণীর রোগীদের উপর বিস্ময়কর ক্রিয়া করে। কোন কোন পাশ্চাত্য চিকিৎসক পাত্রবিশেষে Hypnotic suggestionএরও আশ্রয় লন্। সদ্যোবিবাহিতের এই নিবার্য দুর্বলতা সর্বদেশেই কত লোককে যে ক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছে, স্ত্রীর প্রতি—রমণী জাতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ করিয়া দিয়াছে—বৈরাগ্যবসনে মঠে-আশ্রমে আত্মগোপন করিতে প্ররোচিত করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

আবার অনেক সময় বধূ মনোমত না হইলে,—তাহার প্রতি একটা বিতৃষ্ণার ভাব জাগ্রত থাকিলে, এইরূপ মানসিক পুরুষত্বহীনতা হইতে দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে ভয়চকিতা, অনুৎসুকা কিশোরী-স্ত্রীর যোনিদ্বারে আক্ষেপ হইয়া (vaginismus) এমন একটা স্থানীয় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে যে, কামকাতর স্বামী তাঁহার সাধনাগ্র শত চেষ্টায়ও প্রবেশ করাইতে অপারগ হন্। উপর্যুপরি এইরূপ ব্যর্থ প্রয়াসের পরিণামেও তাঁহার সাময়িক লিঙ্গশৈথিল্য দেখা দিতে পারে। যে সকল কিশোরীর সতীচ্ছদের চর্ম রীতিমত পুরু—সহজে ছিন্ন হইতে চাহে না,

তাহাদিগের যোনিনালীর মধ্যে লিঙ্গ ক্রমাগত প্রবেশাধিকার না পাইয়াও অবশেষে নিরুপায় হইয়া অতিশীঘ্র স্তিমিত হইয়া পড়ে। কোন কোন দুর্বলনাড়ী (nervous) ও ভাবপ্রবণ যুবক স্ত্রীর নিকট হইতে ক্রমাগত কায়িক ও বাচনিক বাধাদানচেষ্টার সম্মুখীন্ হইতে হইতেও ঐরূপ অস্থায়ী লিঙ্গশৈথিল্যের দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারেন। লেখক এমন দুই তিন জন পুরুষকে তাঁহার পরামর্শাগারে পাইয়াছেন—যাঁহারা দ্বিতীয়া স্ত্রীর সহিত ক্রমাগত কয়েকদিন উপক্রমচেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন। প্রথমা স্ত্রী যে ঘরে যে শয্যায় শয়ন করিতেন, তাঁহার ব্যবহৃত যে দ্রব্যটি যেখানে যেমনটি ছিল, প্রায় তেমনি রহিয়াছে, তাঁহার শত স্মৃতিবিজড়িত পরিবেশের মধ্যে, আনন্দাবেশের কণ্ঠ শোকবাষ্পে রুদ্ধ হইয়া পড়া অত্যন্ত স্বাভাবিক।···আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, উদ্বেলাবস্থার আকস্মিক আতিশয্য বা অধিকক্ষণ স্থায়িত্ব কার্যকালে শিথিললিঙ্গতা কিংবা অকালস্খলনের (premature ejaculation) সহায়তা করে। বহুস্থলেই এই উপসর্গগুলি উপশাম্য।

বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের স্বভাবের পার্থক্য

এই সূত্রে বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের একটা গুণগত পার্থক্যের কথা উল্লেখ করিতে হইবে। সদ্যোবিবাহিত পুরুষ তাঁহার স্ত্রীর (বিশেষত যে স্ত্রী প্রথম অভিগমনের যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়া, স্বামীর তুষ্টির জন্য একটা অবলীলার ভাব বজায় রাখেন, তাঁহার) অতীত কামজীবন সম্বন্ধে সর্বদা সন্দিগ্ধচিত্ত, এবং তিনি বিবাহের কতদিন পূর্বে আত্তঋতু দর্শন করিয়াছিলেন এবং পাড়ার কোন যুবককে তিনি কখনো সুনজরে দেখিয়াছিলেন কিনা···সময়-অসময়ে ইত্যাকার প্রশ্নে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন। অরমিতা, প্রেমানভিজ্ঞা ও অস্পৃষ্টা কিশোরীকে পত্নীরূপে পাওয়া—সকল পুরুষেরই কাম্য। কিন্তু এ বিষয়ে সমঝদার

পত্নীমাত্রই সচরাচর অত্যন্ত উদারহৃদয়, স্বামীর অতীত যৌনজীবন-কাহিনী শুনিবার আগ্রহ তাঁহার কোনকালেই জন্মে না। জামাতার স্বভাব-চরিত্র পূর্বে ভালো ছিল না শুনিয়া, আত্মীয়-স্বজনের মনে দুঃখ জাগিতে পারে; কিন্তু পত্নী শুধু বিচার করিয়া দেখেন—অতীতে স্বামী যাহাই থাকুন, বর্তমানে তিনি তাঁহাকে সুখী করিতে পারিতেছেন কিনা। তাহা হইলেই যথেষ্ট। পরিস্ফুট যৌনজ্ঞানসম্পন্ন বিবাহার্থী পুরুষ কিন্তু সুন্দরী বালবিধবাকে বিবাহের মধ্য দিয়া তদ্রূপ আকাঙ্ক্ষা করিতে পারেন না। যুগযুগান্তের সমাজব্যবস্থার সম্মুখে শিরাবনমন হয়ত এই প্রবৃত্তির ভিত্তিমূল কতকটা গঠন করিয়াছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একজন কামান্ধ যুবক বা রসজ্ঞ প্রৌঢ় ঐরূপ কোন বালবিধবার সহিত বহির্বিবাহিক রমণ করিতে মোটেই অনিচ্ছুক নহেন; এমন কি, একজন দুশ্চরিত্রা বাল-বিধবাকে রক্ষিতা রাখিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি পশ্চাৎপদ হয় না।

দৃষ্টির গোচরীভূত কোন নারীকে স্বামীর প্রেম-ভাগিনী দেখিতে পাইলে, নারীর কিন্তু ক্ষোভ-রোষের অন্ত থাকে না। তাঁহার নিয়মিত কামনা মিটাইয়া, স্বামী চক্ষুর অগোচরে অন্যা স্ত্রীতে রত হইলে, ততখানি দুঃখ বা ঈর্ষার কারণ হয় না, যতখানি হয়—স্বামী আর এক নারীকে বিবাহ করিয়া, তাঁহারই সংসারের মধ্যে ঠাঁই দিলে! স্বামীগৃহে সতীনের ঘর—বিশেষরূপে 'বোন্-সতীনের ঘর' করার মতো এত বড় অভিশাপ ভারতবর্ষীয় নারীর পক্ষে আর দ্বিতীয় নাই। পুরুষ কিন্তু এ সকল বিষয়ে অন্যরূপ। তাঁহার স্বার্থপরতার সীমা নাই। পত্নীর অতীত, বর্তমান্ ও ভবিষ্যৎ—তাহার প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ কার্য্যাবলী লইয়া তাঁহার কারবার। হিসাবে কোথাও কিছু গরমিল হইলেই তাঁহার ব্যবসা-পাট্ যেন টলমল করে!

পুরুষ যৌন-সম্ভোগের স্থান-কাল-পাত্র পরিবর্তনে অল্পবিস্তর প্রয়াসী।

শুধু তাহাই নহে, একই প্রণালীতে একই কায়দা-কানুনে নিত্য কাম-

পুরুষ নূতনত্বপ্রয়াসী

চরিতার্থতা করিতেও তাহার মন মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বহুগমনাভিলাষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি (polygamous instinct) অধিকাংশ পুরুষের সচেতন:বা অবচেতন মনে লুক্কায়িত থাকে। অনেকের পক্ষে ইহা দমন করা অসম্ভব। শিক্ষা ও সংযমের দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে দমন করা সম্ভবপর হইলেও মন হইতে উহার মূল একেবারে উৎপাটিত করা যায় না। নিতান্ত চরিত্রবান স্বামীর চিত্তও কোন-না-কোন সময়ে একটা অনুকূল ক্ষেত্রের মধ্যে পড়িয়া এই প্রবৃত্তির উদ্যত অঙ্কুশ দ্বারা নির্মমভাবে নিপীড়িত হইতে পারে। ইচ্ছা এত প্রবল হয় যে, বারেকের জন্যও উহা ফলবতী করিতে পারিলে, তিনি যেন পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। অথচ এতদ্বারা তাঁহার স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা বা পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব নষ্ট করিতে চাহেন না।

স্ত্রীকে সর্ববিষয়ে সুখী করিয়া, তাঁহার অজ্ঞাতসারে স্বামী নিয়মিতভাবে বা মাঝে মাঝে তাঁহার নূতনত্বের পিপাসা অন্য নারীতে অভিগমনদ্বারা চরিতার্থ করিয়াছেন বা করিতেছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে বিরল নহে। আমরা দেখিয়াছি, চিররুগ্ণতা, দুরারোগ্য মনোবিকার, বহুপুত্রবতীত্ব, রূপহীনতা, গতযৌবনত্ব প্রভৃতি বহুবিধ কারণ স্বামীকে বেশ্যা-বা দুশ্চরিত্রাসক্ত করিয়াছে ; কিন্তু তজ্জন্য তিনি কখনো পত্নীর প্রতি অমনোযোগী, দায়িত্বজ্ঞানশূন্য ও বীতরাগ হন নাই। পুরুষ প্রেম ও কামকে পৃথক করিয়া দেখিতে পারে, নারী পারে না। সেইজন্যই এক নারীকে বহুকাল ধরিয়া ক্রমাগত উপভোগ করার ফলে, তাহার প্রতি পুরুষ যৌন-বোধশূন্য হইতে পারে ; মনে মনে অন্য নারীর সহবাস কামনা করিতে পারে। "অভাগ্যের ঘোড়া মরে, ভাগ্যবানের বধূ মরে"—এই হাস্যরসাত্মক

প্রবচনের মধ্যেও পুরুষের সংগুপ্ত মনোবৃত্তির একটা আন্তরিক প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরন্তু এ সকল বিষয়ে পুরুষ নারী অপেক্ষা বেশী স্বার্থপর, অবিবেচক ও অবিমৃষ্যকারী।

নারী অধিকতর সংরক্ষণশীলা

নারী স্বভাবত সংরক্ষণপন্থী, পুরুষ সংস্কারপন্থী। রীতিমত প্রেমাসক্ত ও তৃপ্তপ্রাণ পুরুষ তাহার প্রেমিকার পার্শ্বে বসিয়া, আর এক সুন্দরীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া, তাহাকে আন্তরিক-ভাবে কামনা করিতে পারেন,—রমণী পারে না। পঞ্চান্ন বৎসরের জীবিতদার বৃদ্ধ একটি দ্বাদশবর্ষীয়া লাবণ্যবতী বালিকার প্রতি দৃষ্টিমাত্র কামভাব পোষণ করিতে পারেন, ঐ বয়সের সধবা বৃদ্ধা একটা চতুর্দশ বৎসরের বালকের প্রতি সহসা তদ্রূপ করিতে পারেন না। ইহার কারণ আর কিছু নহে,—নারী প্রেম ও কামকে একপ্রকার অভিন্নই দেখেন, অথবা একটিকে অপরটির অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া মনে করেন। কামশূন্য প্রেমকে তাঁহারা বরং প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইয়া যাইতে পারেন, কিন্তু প্রেমশূন্য কামকে তাঁহারা প্রায়ই বরদাস্ত করিতে পারেন না। পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর বয়স্কা একটি নারী কয়েকটি ছেলেপুলের জননী হইয়াও হঠাৎ একদিন এক অল্পপরিচিত পুরুষের হাত ধরিয়া নিরুদ্দেশ-যাত্রা করে,—আমরা কারণ খুঁজিতে হয়রান্ হইয়া পড়ি। এরূপ ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তই প্রায় নির্ভুল যে, স্বামী মহাশয় কোনদিন কামে বা প্রেমে তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই!

যৌবনে যৌনক্ষুধা

সাড়ে সতের বা আঠার বৎসর হইতেই পুরুষের যৌবনের সূত্রপাত। গুরুজন ব্যতীত কাহারো তখন আর তাহাকে 'খোকা' বা 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিবার উপায় নাই। তাহার আত্মসম্মান-বোধ, আত্মবিশ্বাস, আত্ম-

চেতনার সিংহদ্বার তখন উন্মুক্ত হইয়াছে ; তখন সে সমস্ত জগৎটাকে তাহার মুঠার মধ্যে—জীবনটাকে লঘুত্রিপদী ছন্দের মত মধুর ও নৃত্যদোদুল্—কালপ্রবাহকে অপরিবর্তনশীল বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে ; তখন সে অশ্রুকে করে ভ্রুকুটি—শাসনকে করে উপেক্ষা—আলস্যকে করে উপহাস। ইহাই হইল যৌবনের স্বভাব। সাধারণত আমাদের দেশের ভদ্রলোকের ছেলেরা প্রায় এই সময়টিতে স্কুলের অধ্যয়ন শেষ করিয়া কলেজে পড়িতে আরম্ভ করে। ছেলেদের মনোবৃত্তির ওই আকস্মিক পরিবর্তন দেখিয়া, তজ্জন্য অভিভাবক আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-দীক্ষা ও আবেষ্টনীর স্কন্ধে দোষারোপ করেন ; কিন্তু বুঝিতে পারেন না যে, উহা যৌবনেরই স্বতোৎসারিত ভাবধারা ও জ্ঞানের অখণ্ডনীয় পরিণতি। যাহাদের আঠার উনিশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়, তাহাদের মধ্যে যৌবনের সকল পরিবর্তনগুলি বিকশিত না-ও হইতে পারে এবং যৌবনের এই বিশিষ্ট ধর্মটি আশানুরূপ-কাল স্থায়ী না-ও হইতে পারে।

একুশ বৎসরের মধ্যে বিবাহদ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে যৌনসম্বন্ধ স্থাপন না করাই উচিত। স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক কোন প্রণালীর মধ্য দিয়া যৌন-প্রবৃত্তির পরিচালনা সুরু করার পর প্রথম কিছুদিন পর্যন্ত উহা সকলপ্রকার বৈধ সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে থাকে ; তখন তাহার ফলাফল সম্বন্ধে কোন সংশয়ই মনের কোণে স্থান পায় না,—কেবল বর্তমানের আনন্দানুভূতিতে প্রাণ ভরপুর হইয়া থাকে। অথচ কোন বাঙ্গালী যুবকেরই একুশ বৎসরে বা তাহার পূর্বে যৌবনোচিত ক্রমিক বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হয় না ; কাহারো কাহারো বা সাড়ে চব্বিশ বা পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত দৈহিক ও মানসিক উন্নতি প্রলম্বিত হয় ; তারপর উহা একরূপ বন্ধ হইয়া যায় বলিলেও চলে। সুতরাং একুশ হইতে সাড়ে চব্বিশ বৎসর বয়সের মধ্যে

যৌনজীবন-যাপনের সূত্রপাত করিলে, শরীর-মনের কোন ক্ষতিসাধন করিতে পারে না। তদুপরি এই সময়টি পুরুষের প্রখর যৌনাবেগ ও যৌনসুখানুভূতির শ্রেষ্ঠ কাল। এ সময়ে কায়মনোবাক্যে সংযম, স্বাস্থ্য ও মনঃসাম্য রক্ষা করিয়া চলা বড় সোজা কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে।

রোগ-প্রবণতা, পারিবারিক বিপর্যয়, অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তা, গুরুজনের অনিচ্ছা, প্রবাসে উচ্চতর অধ্যয়ন প্রভৃতি নানা কারণে ভদ্রঘরের যুবকের পক্ষে একুশ হইতে পঁচিশের মধ্যে পরিণয় না-ও ঘটিতে পারে। কিন্তু তাহাতে প্রলোভনের পথ কণ্টকাকীর্ণ হয় না; কারণ এই বয়স কিশোরী, যুবতী বা প্রৌঢ়া—সকল জাতীয় স্ত্রীলোকের হৃদয়কে স্বতই আকর্ষণ করে, এত প্রবল আকর্ষণ বোধ হয় জীবনে আর কোন সময়টিতে হয় না। সুতরাং নারীর সহিত পরিচয় ঘটার মুখ্য কাল বলিয়া এই সময়টিকে ধরা যাইতে পারে। পঁচিশের পর হইতে আটাশ বৎসর পর্যন্ত বয়স প্রথম নারী-সঙ্গলাভের গৌণ কাল বলিয়া অভিহিত করা চলে। তাহার পূর্বে বা পরে সমস্তই অকাল। আটাশের মধ্যেও যিনি 'রতিসুখসারে'র জন্য উন্মাদনা অনুভব না করেন, জীবনের অন্য কোন তথাকথিত মহত্তর উদ্দেশ্য যাঁহাকে প্রাণের স্বতঃসঞ্জাত যৌনপিপাসা-নিবৃত্তির সিংহদ্বার হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যায়, তাঁহাকে গড়্‌পড়্‌তা মানুষের সামিল করা চলিবে না, হয় তিনি রোগী, নহে তিনি যোগী। এরূপ ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে ধরিয়া লওয়া যায় যে, নারী ব্যতিরেকে তিনি জীবনের বাকী দিনগুলি অনায়াসে কাটাইয়া দিতে পারিবেন, এবং রমণী অভাবে তাঁহার যৌনাবেগ জীবনের পূর্ববর্তী দিন কয়টি যে প্রণালীর মধ্য দিয়া স্ফূর্তি লাভ করিয়া অতিবাহিত করিয়াছে, সেই প্রণালীতেই তিনি

নারী-পরিচয়ের মুখ্য ও গৌণ কাল

সারা জীবন অতিবাহিত করিবেন। আটাশের পর যে ব্যক্তি বিবাহ করে বা সর্বপ্রথম রমণীর সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করে, সে আনন্দের দশ-বারো আনা অংশ হইতেই নিজেকে ও আপন অংশভাগিনীকে বঞ্চিত করে,—একথা নিঃসংশয়ে বলিতেছি।

বহির্বিবাহিক ব্যাভিচার ও বিবাহের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করা যেমন সম্ভব নহে, তথাপি এই দুই প্রকার ক্ষেত্রে ব্যবহারের একটা সাধারণ নীতি-প্রতিষ্ঠা করাও সহজ-সাধ্য নহে। এই দুইটির একটির মধ্যে

বিবাহ ও ব্যাভিচার

আছে উচ্ছৃঙ্খলতা ও মাদকতা বেশী—অথচ বিবেচনাশক্তি ও নিরাপত্তার ভাব কম; অন্যটির মধ্যে আছে শান্তি ও সান্ত্বনা বেশী, আত্মব্যঞ্জনার সুযোগ বেশী—অথচ আবেগ ও উদ্বেগ কম। একটিতে কামের স্থান উচ্চে, প্রেমের স্থান নিম্নে; অন্যটিতে প্রেমের বেদী উচ্চে—কামের আসন নিম্নে। একটিতে স্বার্থপরতা, সংশয় ও নশ্বরতা-বোধ, অন্যটিতে আত্মবিতরণ, নিশ্চিন্ততা ও নিত্যত্বের ভাব! উভয়ের মধ্যে অনেকখানি ব্যবধান। বিবাহ-বন্ধনের মধ্যেও ব্যাভিচার, আবার ব্যভিচারের মধ্যেও প্রেমের অনুবন্ধ দেখা যায় সত্য; কিন্তু জগতে এখনো তাহার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম ও স্থায়িত্ব অল্প।

বাঙ্গালা দেশে একটা অতি হৃদ্য প্রবচন আছে—"বেশী খাবি ত অল্প খা, অল্প খাবি ত বেশী খা।" অর্থাৎ জীবনে অধিক দিন ধরিয়া যদি খাইতে চাহ, তাহাহইলে প্রত্যহ অল্প করিয়া খাও।..আহার সম্বন্ধে যে নিয়ম প্রযোজ্য, বিহার সম্বন্ধে সে নীতি যে অধিকতর দৃঢ়তার সহিত প্রযোজ্য,

যৌনসামর্থ

তাহা প্রদীপ্ত যৌবনের নিকট অজানা থাকে। তবুও যুবক অপেক্ষা যুবতীরাই এই সত্যটির প্রতি বেশী আকৃষ্ট হন্: অথচ পুরুষ বুঝিতে

চাহেন না যে, আহারের অত্যাচারে যেরূপ অম্ল, অজীর্ণ, আমাশয়, পিত্তশূল, হাঁপানি প্রভৃতি দেখা দিতে পারে, তেমনি বিহারের অতিরিক্ততায় নিপুরুষত্ব, দৃষ্টিহীনতা, হৃদিদৌর্বল্য, অকাল-বার্ধক্য, ত্বরিৎস্খলন, প্রমেহ, পৌরুষগ্রন্থির প্রদাহ প্রভৃতি নানা কষ্টসাধ্য ব্যাধি দেহকে অকর্মণ্য করিয়া দিতে পারে। ব্যাভিচারের অব্যবহিত বা দূরগামী কুফলগুলি পুরুষকে যত সহজে আক্রমণ ও পরাভূত করিতে পারে, রমণীকে তত সহজে পারে না।

একরাত্রে একজন সাধারণ স্বাস্থ্যসম্পন্ন যুবক বড় জোর চারি-পাঁচ বার রতিক্রিয়া করিয়াই রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হন, কারণ তখন তাঁহার আর যৌনেন্দ্রিয় উত্থিতও হয় না—কেলিরস নিঃসৃতও হয় না; অথচ যে-কোন একজন পূর্ণোদ্ভিন্না যুবতী আরো পাঁচবার যৌনসংযোগে, সুখবোধ না করিতে পারেন—ক্লান্তিবোধ করিবেন না। অনেকেই বোধহয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, কিশোরী বা যুবতী দুশ্চরিত্র গুণ্ডাদল-দ্বারা বলপূর্বক অপহৃতা হইয়া, ক্রমান্বয়ে দশ পনের জন কর্তৃক বলাৎকৃতা হইয়াছে, তাহাতে অল্পবিস্তর স্থানীয় ক্ষতি ছাড়া বিশেষ কিছু হয় নাই। কিন্তু ওই নারী যদি পুরুষদিগের প্রত্যেককে প্রতি রাত্রে দশ পনের বার উপর্যুপরি ধর্ষণের জন্য সদর্পে আহ্বান করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাদিগের কাহাকেও মানুষের আদালতে শাস্তি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আর অপেক্ষা করিতে হইত না—তৎপূর্বেই প্রকৃতির মর্মন্তুদ বিচারাধিকরণে তাহাদিগকে মাথা পাতিয়া মৃত্যুদণ্ড লইতে হইত। যে দান করে—তাহার শক্তি সীমাবদ্ধ; যে গ্রহণ করে—তাহার সামর্থ অসীম,—এ কথা আমরা সচরাচর ভুলিতে বসি।

পূর্বেই বলিয়াছি, নারীর সহিত প্রথম পরিচয় ঘটার পর কিছুকাল পর্যন্ত যৌন-সম্মিলনে পুরুষের মাত্রা-বোধ থাকে না। এই 'কিছুকাল'

শব্দটি পাত্রবিশেষে এক হইতে পাঁচ বৎসর অথবা একটি বা দুইটি সন্তানের জন্ম পর্যন্ত স্থায়িত্বের সময় নির্দেশ করিতে পারে। এই সময়ে স্ত্রী যতদিন কাছে থাকেন, ততদিন, ঋতুস্রাব, অসুস্থতাদি-দ্বারা সাময়িক ব্যাঘাত না ঘটিলে, প্রায় প্রত্যহই তাঁহার দেহোপভোগে পুরুষ নিযুক্ত হন্। সুস্থ যুবকমাত্রেই ইহাতে বিতৃষ্ণা বা বিশ্রান্তি বোধ করেন না; এমন কি, স্বাভাবিক যৌনক্ষুধাগ্রস্ত কোন কোন ব্যক্তি এক এক রাত্রে দুই-তিন বার উপক্রম করিতেও কার্পণ্য করেন না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চারিবার মিথুনবিহার করা—গড়্‌পড়্‌তা যুবাপুরুষের পক্ষে সাধ্যতার শেষসীমা বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলে। তবে কিছুদিন পর্যন্ত প্রত্যহ তিন-চারিবার করিয়া উপগত হওয়া কোন বীর যুবকের পক্ষেই সম্ভবপর নহে; এবং চেষ্টা করাও বিপজ্জনক।

সম্মিলনে মাত্রাতিক্রম

বিবাহিত জীবনে এক রাত্রিতে তিনবার বা চারিবার অভিগমনের দিনগুলি সাধারণত এত অল্পসংখ্যক হয় যে, প্রত্যেক স্মৃতি-শক্তিসম্পন্ন প্রৌঢ়ই তাহা করাঙ্গুলির দ্বারা গণিয়া ফেলিতে পারেন। লেখক কোন বাঙ্গালী পালোয়ান্‌কে (এক্ষণে মৃত) জানিতেন, যিনি একরাত্রে প্রায় উপর্যুপরি দ্বাদশবার কোন বারনারীর দেহোপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জাহাজের কোন বাঙ্গালী মেডিক্যাল্ অফিসার একবার সুযোগ পাইয়া কোন বিদেশিনীকে সপ্তবার রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই সুরার উত্তেজনা সমুপস্থিত ছিল। কিন্তু সুরার উত্তেজনা ব্যতিরেকেও কোন ব্যায়ামবীর যুবক মাসে একবার করিয়া প্রবাস হইতে কয়েকদিনের জন্য গৃহে ফিরিয়া তাঁহার যুবতী পত্নীকে প্রতিবারই প্রথম রাত্রে পাঁচ-ছয়বার করিয়া রমণ করেন, একথা বীরভোগ্যা নিজেই গ্রন্থকারের কোন বান্ধবীর নিকট সখেদে স্বীকার

করিয়াছেন। কিন্তু এগুলি ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত। অত্যধিক সুরাপান করিলে অথবা ব্যায়ামবীর হইলেই যে সঙ্গম-শক্তি কৃত্রিমত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ইহা ভ্রান্ত ধারণা। সাধারণভাবে ইহার বিপরীত ফলই পরিলক্ষিত হয়।

সাধারণত বাঙ্গালীর যৌবনের প্রান্তসীমা পঁয়ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত। যাঁহারা সুখের ক্রোড়ে লালিত-পালিত—যাঁহারা জীবনযুদ্ধে তেমন ক্ষতবিক্ষত হন নাই, যাঁহাদের পিতামাতা বলিষ্ঠ—স্বাস্থ্যসম্পন্ন, যাঁহারা প্রথমযৌবনে কতকটা সুবিবেচনার সহিত আপন যৌনজীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তাঁহারা আরও কিছুদিন—বড়জোর বিয়াল্লিশ বৎসর পর্যন্ত নিজের বিদায়োন্মুখ যৌবন ধরিয়া রাখিতে পারেন। তারপর প্রৌঢ়ত্বের একাধিপত্য। যৌবনের শেষার্ধ-কালে পুরুষের যৌনক্ষুধার মধ্যে কথঞ্চিৎ সঙ্গতি ও সংযমের ভাব আসে। অনেক ভদ্রযুবকেরই হয়ত এই সময় গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত প্রবাসে একক বাস করিতে হয়। দেশে থাকিলে, নিয়মিতভাবে ম্যালেরিয়ায় ও আমাশায় ভুগিতে হয়, নতুবা নিয়মিত স্ত্রীর গর্ভোৎপত্তি, প্রসব-জনিত স্বাতন্ত্র বা পিতৃগৃহবাসের বিরহ সহ্য করিতে হয়। সর্বোপরি, সংসারের দায়িত্ব ক্রমশ গুরুতর হইয়া, বহু যুবকেরই যৌবনোন্মেষের সুখস্বপ্ন প্রায় বিচূর্ণ করিয়া দেয়। সুতরাং কাম-জোয়ারের ফেনায়িত উচ্ছ্বলতা কমিয়া আসে—নর্গ-নির্ঝর যেমন সমতল প্রান্তরে নামিয়া প্রশান্তির তটসীমার মধ্যে আপনাকে ধরিয়া রাখে। মাঝে মাঝে অবশ্য বন্যার বিপুল প্লাবন দেখা যায়। কিন্তু তাহা বৎসরের মধ্যে হয়ত দুই চারি দিন; যথা—হয়ত জামাই ষষ্ঠীর রাত্রে, বিজয়াদশমীর রাত্রে, মাহিনাবৃদ্ধির রাত্রে, ঘোড়দৌড়ে কিছু টাকা পকেটস্থ হওয়ার রাত্রে, বায়োস্কোপে একটা আদিরসাত্মক চিত্র

যৌবনের প্রান্তসীমায়

দেখিয়া আসার পর...ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ আনন্দের উপলক্ষকে কেন্দ্র করিয়া।

অন্য সময় স্ত্রী-সহবাস চলে কতকটা কলের পুতুলের মত; কতটা অভ্যাসগত নিয়মনিষ্ঠা, কতকটা স্বভাবগত প্রেরণা—এই দুই ভাবের সংমিশ্রন। বাঙ্গালীর জীবন-কুঞ্জে বেণুবীণা অপেক্ষা একতারার বাদ্যই শুনা যায় বেশী, তথায় বৈচিত্রের অবকাশ অত্যন্ত কম। অথচ নিত্য

স্ত্রী-সহবাসে একটানা সুর

একই রকমের ব্যঞ্জনাদি যেমন রুচিকর হয় না, তেমনি যৌনজীবনে এক-ঘেয়ে ভাবও বহু শিক্ষিত যুবকের নিকট শ্রান্তিকর। ভাত, রুটি বা লুচি—যিনি যাহা খাইতে অভ্যস্ত, তিনি তাহাই পরিতৃপ্তি সহকারে খাইতে পারেন—যদি ব্যঞ্জনের মধ্যে একটু রকম্‌ওয়ারি ব্যবস্থা থাকে। প্রকারান্তরে, সেই একই স্ত্রী সমভাবে উপভোগ্যা হয়, যদি তাহার মধ্যে নব নব লীলালাস্যের বিকাশ থাকে এবং উপভোগের স্থান-কালেরও মাঝে মাঝে একটু অদলবদল হয়। বাঙ্গালী ঘরের স্ত্রীরা বিবাহের কিছুদিন পরেই ভুলিয়া যান্ যে, তাঁহারা একাধারে জননী ও বিলাসরঙ্গিণী। অন্তর্দৃষ্টির অগভীরতা ও কুসংস্কারগত অজ্ঞতা নিবন্ধন তাহাদের কোন বিশিষ্ট রূপই সার্থকতার সহিত ফুটিয়া উঠে না। একচক্ষু হরিণের মত কেহ কেহ হয়ত একদিকের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে গিয়া, অন্য দিক্‌টির প্রতি ঘোরতর অবিচার করেন। শেষে একদিন হয়ত স্বামীর বিতৃষ্ণারূপ ব্যাধ আসিয়া, তাঁহার প্রেম-জীবনের সকল সাধকে নির্মম-হস্তে সংহার করিয়া ফেলে!

তারপর স্থানের পরিবর্তনও ঘটে গৃহস্থ বাঙ্গালীর ভাগ্যে খুবই কম। যাঁহাদের পল্লীগ্রামে বাস, তাঁহাদের সেই ঘর, সেই বাড়ীতে আজন্ম একটানা দিবসযাপন! বৎসরের মধ্যে দুই একদিন শ্বশুরালয়ের ধরাবাঁধা মিষ্টান্নের

মধ্যে নিমজ্জন ; নচেৎ ক্বচিৎ আত্মীয়বন্ধুর কোলাহল-মুখরিত সঙ্কীর্ণ গৃহে বিবাহের নিমন্ত্রণ। শহরে যাঁহাদের বাস, অথবা পাশ্চাত্য সভ্যতার আবহাওয়া ঈষৎ যাহাদের গায়ে লাগিয়াছে, তাঁহারা পূজার ছুটিতে, গ্রীষ্মাবকাশে (অবশ্য অধ্যাপক হইলে), অথবা ডাক্তারের সার্টিফিকেটের বলে সত্য বা মিথ্যা ব্যায়রামের অজুহাতে অবসর লইয়া, দুই-দশ দিনের জন্য ঘুরিয়া-ফিরিয়া—সেই বৈদ্যনাথ, সেই মধুপুর, সেই কাশী, সেই পুরী, নচেৎ আভিজাত্যের ধুয়া ধরিয়া খুব জোর দার্জিলিং, কার্শিয়ং বা শিলং যাওয়া চলে রেলের ফ্রি পাশ বা 'পি-টি-ও' না পাইলে, অথবা মনের গায়ে নিতান্ত বৈরাগ্যের ছোঁয়াচ না লাগিলে, কামরূপ-কামাখ্যা, চন্দ্রনাথ, হরিদ্বার, হৃষিকেশ, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি যাওয়ার উৎসাহ কাহারো থাকে না। এ বিষয়ে ইয়োরোপীয়েরা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে আমাদের কত অগ্রগামী! অবশ্য ইহার মূলে রহিয়াছে আমাদের জাতিগত দারিদ্র্য। কিন্তু উহাই পুরাপুরি কারণ নহে, উহার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত রহিয়াছে আমাদের অনুভূতির অসাড়তা, জন্মার্জিত কিট্টাত্মকতা ও স্বভাবসৃষ্ট পুরাতন-প্রিয়তা!

প্রৌঢ়ত্বের যৌনজীবন

যাহাহউক, ছত্রিশ হইতে পঞ্চান্ন বৎসর পর্যন্ত বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর প্রৌঢ়ত্বের স্থায়িত্বকাল। যৌবনের শেষ সাত বৎসর এবং প্রৌঢ়ত্বের প্রথম সাত বৎসর—এই চতুর্দশ বৎসর কাল আমাদের দেশের পুরুষদিগের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের গতিপ্রবাহ প্রায় একভাবেই থাকে ; জীবনযাত্রা-নির্বাহও অনেকটা একভাবেই চলে—উহাতে উত্থান-পতনের অবকাশ ঘটে অতি লোকেরই। যৌনবোধের চরম পরিপক্বতা আটাশের মধ্যেই সাধারণ বাঙ্গালী লাভ করে। সুতরাং তাহার পর হইতে আসে একটা সমাধান, একটা সামঞ্জস্য, একটা স্থিতিস্থৈর্যের

ভাব। অবশ্য বহুবিধ বাহ্য কারণে, যথা—আত্মীয়-বিয়োগ, পারিবারিক অসুস্থতা, কর্মনাশ, মাম্‌লা-মোকর্দমার ঝঞ্ঝাট, কন্যার বিবাহ-চিন্তা, লৌকিকতার উপদ্রব, গৃহদাহ, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন প্রভৃতির জন্য মানুষের যৌনজীবন সাময়িকভাবে রুদ্ধ অথবা সঙ্কুচিত হইতে পারে। যাহাহউক, উপরিউক্ত চতুর্দশ বৎসর কাল সপ্তাহে তিন দিন হইতে একদিন পর্যন্ত যৌনক্ষুধা-বোধ সুস্থতার লক্ষণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

কিন্তু চাকুরীজীবী সকল বাঙ্গালীর পক্ষে ক্ষুধাবোধের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধানিবৃত্তির সুযোগ ঘটে না; তাহার প্রধান কারণ—পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক প্রায় আট্‌লক্ষ বিবাহিত বাঙ্গালী স্ত্রীসঙ্গ-বিরহিত অবস্থায় প্রবাসে পড়িয়া থাকেন। অবশ্য ইহাদের মধ্যে প্রায় পাঁচ লক্ষই সপ্তাহ-শেষের যাত্রীরূপে কার্যস্থলের অনতিদূরে স্ব-পল্লীতে গমন করিয়া, শনি ও রবিবারের বিভাবরী সহবাসসুখে যাপন করিয়া আসিতে পারেন এবং আসিয়াও থাকেন। আর দুই লক্ষ লোকের পল্লী হয়ত অপেক্ষাকৃত দূরে; যাতায়াতের অসুবিধা বা আথিক্‌ অনটন হেতু মাসে একবার বা দুইবারের বেশী বড়-একটা যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। ইহাদেরও যৌন-জীবনের স্বচ্ছন্দ গতিপথে বিশেষ একটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় না। কিন্তু বাকী যে একলক্ষ লোক্‌ বৎসরের মধ্যে একবার বা দুইবার (দুর্গাপূজা বা বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে) ব্যতীত পত্নীমুখচন্দ্রমা সন্দর্শন করিতে পারেন না, তাঁহাদের জীবন সত্যই বিড়ম্বনাময়; তাঁহাদের স্ত্রীরাও প্রকৃত দুর্ভাগিনী। এই সকল ব্যক্তির অধিকাংশই রক্ষিতা রাখে, নহেত নিজের আর্থিক সংস্থান বুঝিয়া বেশ্যাভিগমন করে, নচেৎ নিজের স্বয়ম্ভূব কামবাসনা চরিতার্থ করিবার অন্য কোন কৃত্রিম প্রণালী খুঁজে। বোধহয় অল্পাধিক পনের বিশ সহস্র লোক এই বাধ্যতাজনিত দীর্ঘবিচ্ছেদেও নিজেদের চরিত্র কায়গতভাবে নিরঞ্জন রাখিতে সচেষ্ট হন। কৃত্রিম

বা অকৃত্রিমভাবে সঞ্জাত উদ্বেলাবস্থার মধ্যেই তাঁহারা সান্ত্বনার উপাদান সন্ধান করেন ; স্বভাবনিযুক্ত প্রশমনের প্রতিভূ—স্বপ্নদোষ, তাঁহাদিগের প্রাণে প্রায়ই অতৃপ্তি, দুশ্চিন্তা ও পরিবেদন জাগায়। স্ত্রীর বিরহ ও পারিবেশিক প্রলোভনের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহারা নিস্তেজ হইয়া পড়েন। অবিমৃষ্য নারী-সম্ভোগের ফলে যেরূপ সিফিলিস, গণোরিয়া প্রভৃতি দুঃসাধ্য হুক্কারজনক ব্যাধি, অর্থনাশ, মনস্তাপ, দেহভঙ্গ বংশ-বিসর্পন প্রভৃতি ঘটা অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ কামনার সহিত দ্বন্দ্ব করিতে করিতেই যে সকল 'বিবাহিত ব্রহ্মচারীর' জীবন-মধ্যাহ্নের দিনগুলি কাটে, তাঁহাদের মধ্যে শিরোঘূর্ণন, অম্লাজীর্ণ, অকালবার্ধক্য, ত্বরিৎস্খলন, শিশ্নোত্থানহ্রাস, নিষ্প্রাণতা, উত্যক্ততা, একাগ্রতাহীনতা, উৎকেন্দ্রিকতা (eccentricity), বিমর্ষতা, অহেতুক গাম্ভীর্যভাব, প্রভৃতি নানা উপসর্গ দেখা দেওয়া আদৌ অসম্ভব নহে।

স্ত্রীলোকের যৌনবোধ ও যৌনক্ষুধার আলোচনা প্রসঙ্গে যুক্তভাবে পুরুষ সম্বন্ধে আর গুটি কয় তথ্য বিবৃত করিব। আপাতত প্রৌঢ়ত্বের শেষাংশ ও বার্ধক্য সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলিয়া, বক্ষ্যমান বিভাগটির পরিসমাপ্তি করিব।

কাম-যজ্ঞের আয়োজন-বাহুল্য ও আড়ম্বরচ্ছটা নারীর দেহ-মনের তরফ্ হইতে যতটা বেশী প্রয়োজন হয়, পুরুষের ততটা নহে। পুরুষের কাম-জাগ্রত হইলে, তাহার লিঙ্গ উচ্ছ্রিত হইয়া উঠে ; আবার লিঙ্গ উচ্ছ্রিত হইয়া উঠিলে, কামভাব জাগ্রত হইতে পারে। কিন্তু পুরুষের এমন অবস্থা ক্ষণিক্ বা চিরস্থায়ীভাবে আসিতে পারে যে, মনে কামভাব জাগিলেও লিঙ্গ উচ্ছ্রিত হইয়া উঠে না। বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে সকল পুরুষেরই ধ্বজভঙ্গ বা পুরুষত্বহীনতা একটু একটু করিয়া দেখা দেয়।

প্রৌঢ়ত্বের প্রান্ত সীমায়

সাধারণত বাঙ্গালীদিগের বিয়াল্লিশের পর হইতেই লিঙ্গোত্থান-শক্তি অতি ধীরে ধীরে অপ্রত্যক্ষভাবে কমিতে থাকে ও তৎসহিত সম্ভোগের স্থায়িত্বকালও হ্রস্ব হইতে আরম্ভ করে। মোটামুটি উনপঞ্চাশের পর এই অবনতির গতি দ্রুততর হয় ও বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। পঞ্চান্ন ও ছাপান্ন বৎসরের সময় পুরুষের যৌনসামর্থ নামিয়া আসে একেবারে নিম্নতম ধাপে। ইহার পরই তাঁহার যৌনেন্দ্রিয়গত দেহের মৃত্যু!

ওই সময়ে কিছু দিন পূর্বে নির্বাণোন্মুখ বহ্নির মতো কয়েক মাস বা বৎসর খানেকের মতো বাধর্ক্যস্রোতাভিমুখী মানব হয়ত যৌনক্ষুধার প্রদীপ্ত শিখায় একবার দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠে। কোন কোন চিরকুমার এতকাল সদর্পে ঝড়ের মুখে আপন ব্যক্তিত্বের ছাপ্-মারা শুষ্ক পত্র উড়াইয়া আসিয়া, ঠিক্ এই সঙ্কটময় কালে প্রদীপ্ত আগ্রহে বিবাহের রেশমী রজ্জুর প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারেন (জ্বলন্ত সাক্ষ্য—বারীন দা') ; আবার বহু মৃতদার অকস্মাৎ ব্যাভিচারের পথে জীবনে প্রথম পদার্পণ করিতে পারেন, অস্বাভাবিক মৈথুনের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িতে পারেন · নচেৎ দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার দার-পরিগ্রহের জন্য অধীর হইয়া উঠিতে পারেন এবং অনেক সময় পরিগ্রহ করেনও। কিন্তু "বালা-স্ত্রী ক্ষীরভোজনং" এই শাস্ত্রবিধি যে তাঁহাদের গতি-পথের অদূরে কতখানি মিথ্যাশা, প্রবঞ্চনা ও বিপত্তির জঞ্জাল পুঞ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ভাবিতেও পারেন না।

নির্বাণোন্মুখ কামনা-বহ্নি

যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা তাড়াতাড়ি হরিসভা, শাস্ত্রাধ্যয়ন, মন্ত্রজপ, তীর্থদর্শনাদি দ্বারা অন্তর্গামী কামের এই চরম জ্বালা ভুলিতে চেষ্টা করেন। ইহার পরও যে সকল বৃদ্ধ ভোগ-শক্তির ভুক্তাবশেষ লইয়া বাঁচিয়া থাকেন, তাঁহাদের হাজার-করা ৯৯৯ জনই

যাট্ হইতে তেবট্টির মধ্যে সুরত-সামর্থ জন্মের মত হারাইয়া ফেলেন। অথচ ভোগ-সামর্থ লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের সকলের ভোগ-পিপাসার পূর্ণনিবৃত্তি-বোধ না-ও হইতে পারে। দশহাজার সত্তর বা তদূর্ধবয়স্ক বৃদ্ধের মধ্যে একজনের হয়ত আংশিক লিঙ্গোত্থান ঘটিয়া থাকে; দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষের ভার্যা থাকিলে, তাঁহার ঔরসে হয় ত বংশদুলালও জন্মিতে পারে। কিন্তু তাহাতে উভয় পক্ষেরই যে পূর্বের ন্যায় তৃপ্তি হয় না—ইহা ধ্রুব সত্য! এই সূত্রে আর একটি সত্যের প্রতি সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি উন্মোচিত করিয়া দাওয়া প্রয়োজন মনে করি যে, সঙ্গমক্ষমতার উপর সন্তান-জনন আদৌ নির্ভরশীল নহে। ক্ষণিকের সম্প্রয়োগে যোনিদ্বারে বীর্যস্খলনও অনেক সময় গর্ভাধানের অনুকূল হইতে পারে।

অতিবৃদ্ধের যৌনশক্তির ব্যক্তিগত তারতম্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্য যৌন-বৈজ্ঞানিকগণ ভূয়োদর্শন-লব্ধ বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রফেসর ফোরেলের নিকট একবার এক পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা তাঁহার তিয়াত্তর বর্ষদেশীয় স্বামীর প্রচণ্ড যৌনক্ষুধার প্রতিকার কল্পে পরামর্শ লইতে আসিয়াছিলেন। এই ভদ্রলোকটি সম্ভবত কোন বড় কারখানায় কুলীসর্দার ছিলেন; রাত্রি চারি ঘটিকার সময় উঠিয়া তাঁহাকে বাহির হইতে হইত। প্রত্যহ কাজে যাইবার পূর্বে তাঁহার স্ত্রীকে জাগরিত করিয়া, একবার তাঁহার প্রেম-রসাস্বাদ করিয়া যাইতেন; পরে দ্বিপ্রহরে মধ্যাহ্নাহারের জন্য গৃহে আসিয়া আর একবার রতিক্রীড়ায় নিযুক্ত হইতেন। কোন কোন দিন একটু স্ফূর্তিযুক্ত হইলেও সন্ধ্যার সময়ও বৃদ্ধাকে অঙ্কশায়িনী করিতেন। অদ্ভুত শক্তি বটে!

বার্ধক্যে যৌনশক্তির তারতম্য

এ দেশের কয়েকটি সামর্থবান বৃদ্ধের যৌনইতিহাস আমাদের

জানা আছে। ভূতপূর্ব স্কুল-ইন্স্‌পেক্টর (অধুনা মৃত) জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সহিত লেখকের কয়েক বৎসরের জন্য ঘনিষ্ঠ আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ হইয়াছিল। অবসর লওয়ার কিছু পূর্বে তাঁহার প্রথমা স্ত্রীবিয়োগ হয়; উহার কিছুদিন পরেই তিনি পুনরায় একটি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া অনাথা বালিকার পাণিগ্রহণ করেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ঔরসে দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে ৪।৫টি সন্তান-সন্ততির জন্ম হয়। বৃদ্ধের বয়স তখন প্রায় তিয়াত্তর বৎসর—লোল চর্ম, শীর্ণ দেহ, দন্তহীন, হস্তপদাদি বেপথুমান। স্ত্রীর বয়স ত্রিংশের কম নহে। তাঁহাদের শেষপুত্র মাস দুই হইল জন্মগ্রহণ করিয়াছে। লেখকের কোন বান্ধবী কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া স্বামীর যৌনব্যবহার সম্বন্ধে উঁহাকে প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, প্রথম দশ বার বৎসর কাল তিনি প্রায় প্রত্যহ একবার করিয়া উপগত হইতেন; গত পাঁচ ছয় বৎসর যাবৎ এই হার দ্রুত কমিয়া আসিতেছে, লিঙ্গদৃঢ়তা ও মরণস্থায়িত্বও হ্রস্ব হইয়াছে; তথাপি তখনো তিনি সপ্তাহে অন্তত একবার করিয়া মধ্যরাত্রে মদনযজ্ঞে আহুতি প্রদান করিতে ছাড়েন না।

আর একটি মুসলমান ঠিকাদার ভদ্রলোক—তাঁহার বয়স তখন বাষট্টির কম হইবে না। লেখকের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, তিনি সপ্তাহে ছয়বার করিয়া রমণে পারগ ও অভ্যস্ত। তাঁহার তিন পত্নী বর্তমানা; প্রথমা পত্নীর নিকট একরাত্রি, দ্বিতীয়ার নিকট দুই রাত্রি এবং তৃতীয়ার নিকট তিনরাত্রি অতিবাহিত করার প্রণালীবদ্ধ নিয়ম তিনি মানিয়া চলেন। জুম্মা বারটিতে কেবল বিশ্রাম করেন। তিনি আরো বলিয়াছিলেন যে, ইহাতে তাঁহার পত্নীরা কেহ অসন্তুষ্ট নহে, এবং পাছে অন্য সপত্নী নিয়মের অতিরিক্ত কাল স্বামী-সহবাসের সুযোগ পায়—এই সংগুপ্ত ঈর্ষার নিমিত্ত কেহই পিত্রালয়ে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে না।…

ব্যতিক্রমের এই উদাহরণ কয়টির উল্লেখ করিয়া, কেবল সাধারণ রীতির ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিলাম। অন্যদিকে আবার পত্নীগত-প্রাণ শক্তিশালী যুবক মাসে একবার বা দুইবারের বেশী স্ত্রীবিহার করেন না, এরূপ দৃষ্টান্তও খুঁজিলে পাওয়া যায়।···

পুরুষ যেদিন হইতে আপন সামর্থ-হ্রাসের ব্যাপারটি উপলব্ধি করেন, সেদিন হইতে বৃদ্ধের মেজাজ্ ও মনে একটা দ্রুত পরিবর্তন আরম্ভ হয়। লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, বহু বৃদ্ধ একটা বয়ঃক্রমে পৌছিয়া, (পরম প্রসাদে আযৌবন দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করিয়া আসা স্বত্বেও) খুঁটিনাটি লইয়া সংসারের সহিত কোন্দল বাঁধাইয়া দেন; স্ত্রীর উপর সময়-অসময় অকারণ বিরক্ত হন, কথায় কথায় অভিমান করেন; তাঁহার প্রাণপণ সেবাযত্নও তাঁহার যেন আর পছন্দ হয় না। রতিশক্তি-হীনতাই ইহার অসংজ্ঞাত হেতু। যতখানি মাত্রায় তাঁহার লিঙ্গোত্থান ও বীর্যধারণের সামর্থ কমে, ততখানি মাত্রায় তিনি নারীর অন্যান্য কামকেন্দ্রে (ভগাঙ্কুর, স্তন, ওষ্ঠ, জিহ্বা ইত্যাদিতে) উপচার-প্রয়োগের দ্বারা শান্তি-লাভের চেষ্টা করেন। পঞ্চাশের পর হইতে কোন কোন বৃদ্ধ বাজীকরণের ঔষধ ও কবিরাজী মালিশের শরণাপন্ন হন; তাহাতে অবশ্য কোন ফলই হয় না। পরিশেষে অনেকে আবার "ভগ-চাপল" (cunnilingus), চুচুক-চোষণ অন্যান্য প্রত্যঙ্গ দংশন বা অবলেহন প্রভৃতি দ্বারা নিজেকে তৃপ্ত করেন। অবিশ্বাসের কিছু নাই—ইহা বহুদর্শন-লব্ধ সত্য। শৈশবে সর্বপ্রথমে মানুষের কামকেন্দ্র মুখে থাকে, তাহার আভাষ পূর্বেই দিয়াছি। অশক্ত হইয়া, সেই কেন্দ্র মূলাধার হইতে মুখেই ফিরিয়া আসে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও ত্বকের সংবেদনশীলতা যখন নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়ে, রসনা তখনো জাগ্রত থাকে।

মৃত্যুকালে হিন্দুবৃদ্ধের মুখে গঙ্গাজল ঢালিলে তাঁহার মুখশুদ্ধি হয়

নিঃসন্দেহ; কিন্তু সকলের চিত্তশুদ্ধি যে হয় না, ইহা অনুমান করা সহজসাধ্য। কারণ মদন ভস্ম হইয়াও অদৃশ্য হয় না,—সর্ববিস্মৃতির কুয়াসার মধ্য দিয়া চলচ্চিত্রের "iris out"-দৃশ্যের মত তখনো তাহার বিলীয়মান মুখ মানসচক্ষে ভাসে। তাই ত লব্ধসত্য কবি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মত উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন—

"Even in our ashes live our wonted fires!"

নর-নারীর যৌনবোধ

—প্রকৃতি—

লজ্জাশীলতার গূঢ়তত্ত্ব

প্রথম প্রপাঠ

ভাবুক বলেন—লজ্জাই রমণীর রমণীয় ভূষণ, বৈজ্ঞানিক বলেন—লজ্জাই নারীর যৌন-জীবনের একটা ধরণীয় বিশেষত্ব; সুতরাং নারীর যৌনবোধের মায়া-মণ্ডলে প্রবেশ করিবার পূর্বে আমাদিগকে লজ্জার রহস্য-জাল ছিন্ন করিতে হইবে।

শুধু আমাদের দেশে কেন, জগতের সকল সভ্য দেশেই পুরুষ-শিশু যে বয়সে নগ্ন হইয়া বেড়াইবার স্বাধীনতা পায়, স্ত্রী-শিশুরা সে বয়সে অন্তত নিম্নাঙ্গ ঢাকিয়া না চলিলে সকলের চক্ষে তাহা বিসদৃশ ঠেকে। পারিবারিক শাসন ও সামাজিক শিক্ষার ফলে আমাদের দেশে ভদ্র-ঘরের চারি-পাঁচ বৎসরের মেয়ে অপরিচিত বা অল্পপরিচিত (বিশেষভাবে পুরুষ) লোকের সম্মুখে উলঙ্গ হইতে কুণ্ঠা বোধ করে। নাভিনিম্নস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ও তাহাদের কার্যাবলী ঘেরিয়া কত বড় একটা গভীর সঙ্কোচবোধ সঞ্চিত থাকে—বালিকার মাতা, পিতামহী প্রমুখ আত্মীয়ারা শৈশব হইতেই তৎসম্বন্ধে একটা অনিরূপিত ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দেন। কাযেই এই লজ্জাভাবটি শিশুকাল হইতে অভ্যাসগত হইয়া, পর বয়সে নিজের নিকট তাহা খুব সহজসাধ্য ও অপরের নিকট স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

এই লজ্জা, ব্রীড়া, সঙ্কোচ বা ভীরুতা নারী-সৌন্দর্যের একটা প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট—তাহাতে সন্দেহ নাই; তাই নারী আমাদের নিকটতম, একান্ত পরিচিতা হইয়াও দূরবিহারিণী, "চিররহস্যময়ী"। হ্যাভ্‌লক্ এলিস্

কিন্তু লজ্জাবোধের দুইটি দিক্ পৃথক করিয়া দেখাইয়াছেন ; একটি—জান্তব বা দেহগত (animal or physiological), অন্যটি সামাজিক বা অধিগত (social or acquired). মোট্ কথা, নারীর মধ্যে এই লজ্জার সংস্কার বংশানুগতিকতায় কতকটা চলিয়া আসিলেও, পূরাপূরি প্রকৃতিপ্রদত্ত নহে, অনেটা মাতা বা অন্যান্য অভিভাবিকার নিকট হইতে অর্জিত।

লজ্জা—
স্বভাবধর্ম নহে

কন্যার আপনার ভবিষ্যৎ সুখকে গভীরতর করিবার ও সমাজের অপবাদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার পক্ষে এই ব্রীড়া-যে কতখানি কার্যকরী, তাহার একটা দুর্মোচ্য ছাপ বালিকার বুদ্ধিবৃত্তি পরিস্ফুট হইবার সঙ্গেসঙ্গেই তাহার মনের পটভূমিকায় লাগাইয়া দেওয়া হয়। এগার-বার বৎসর বয়স হইতেই আমাদের দেশের বালিকাদের মনে লজ্জাশীলতার অর্জিত অভ্যাস দ্বিতীয়-প্রকৃতিতে পরিণত হইয়া যায়। তারপর এই লজ্জাশীলতা তাহার যৌনবোধের সহিত সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমা পর্যন্ত আধিপত্য করে। ইহা আমাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ সত্য যে, অকালে যৌনবোধের উন্মেষ হইলে, বালিকারা অতিরিক্ত লজ্জাশীলতা প্রকাশ করে।

লজ্জার মৌলিক অর্থই হইল—কোন বস্তু বা বৃত্তিকে সাধ্যমত অপরের জ্ঞান হইতে গোপন রাখা। যৌনভাব বা ভালবাসা ও যৌনযন্ত্র সম্বন্ধীয় পরিজ্ঞানের চারিদিকে নারীর ব্রীড়া সমধিক পরিস্ফুট, এবং পুরুষের ভিতর এই বিষয়ক লজ্জা নারী অপেক্ষা বস্তুত অনেক কম। অনেকের ধারণা যে, পরিচ্ছদ-পরিধানের অভ্যাস হইতেই বুঝি লজ্জার উৎপত্তি ; কিন্তু ইহা ভুল। তবে মানব-সভ্যতা যেদিন হইতে বসনের ব্যবহার প্রচলিত করিয়াছে, সেইদিন হইতে লজ্জার উদ্দেশ্য ও কর্মক্ষেত্র যে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং উহার একটা বিশিষ্ট রূপ আপনা-

আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহা অস্বীকার্য নহে। জগতের যে সকল অসভ্য জাতি এখনো উলঙ্গ অবস্থায় বিচরণ করে, তাহাদিগের নারীগণ লজ্জাশীলতায় আপাদমস্তক বস্ত্র-পরিবৃতা রমণীকুল অপেক্ষা হীন নহে। পশুদের মধ্যেও লজ্জার ভাব সময়-বিশেষে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়।

লজ্জাস্থলের তারতম্য

সকল দেশে ও সমাজে লজ্জার স্থানগুলি সমান নহে। আবার সাধারণ ভাবে স্ত্রী-পুরুষের লজ্জার স্থলগুলিও অভিন্ন নহে। তবে উভয় জাতিরই সর্বাধিক লজ্জার স্থল জনন-যন্ত্র ও তৎসন্নিহিত স্থান তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার হেতুবাদ পরে উল্লেখ করিব। আদিমকালে অনুর্বর মানব-মস্তিষ্ক হইতে অদ্ভুত কতকগুলি অতিপ্রাকৃত ধারণাই দৈহিক লজ্জাস্থল-সৃজনের মূলীভূত কারণ। বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে বিভিন্নরূপ ধারণার ফলে লজ্জাস্থলেরও তারতম্য ঘটিয়াছে।

বসন ও অলঙ্কারের মৌলিক উদ্দেশ্য

এইস্থলে একটা কথা উল্লেখ করা উচিত যে, সভ্য-সমাজে কি স্ত্রী কি পুরুষের (বিশেষভাবে স্ত্রীলোকেরই) লজ্জার সুস্পষ্ট প্রতীক—বসন। আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ক্লিমেণ্ট্‌ বলিতেন,—কবি চসারও তাঁহার কাব্যের একস্থলে লিখিয়াছেন যে, যে-ব্রীড়া রমণীর মনের মধ্যে এত বদ্ধমূল বলিয়া মনে হয়, তাহার একমাত্র অধিষ্ঠান তাহাদের পরিচ্ছদে। তাহাদের কাপড়ও খসে, লজ্জাও খসে *। আমাদের সকলেরই ধারণা যে,

* ইহার সহিত নিম্নলিখিত বাক্যটির তুলনা করা বোধহয় অসমীচীন হইবে না। "Pythagoras' daughter in-law used to say that a woman who sleeps with a man, should put aside shame with her petticoat and resume it when she dons that garment."—Montaigne's ESSAYS.

বাহিরের শৈত্যাতপের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই পোষাকের সৃষ্টি। ইহা অবশ্য গৌণ কারণ হইতে পারে; কিন্তু মুখ্য কারণ হইল—যৌনযন্ত্রাদির প্রতি অপরের মনকে প্রলুব্ধ করা, কীটপতঙ্গাদির দংশন হইতে উহাদিগকে রক্ষা করা এবং সঙ্গে সঙ্গে অনভিপ্রেত কামুকের আকস্মিক আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে নিরাপদ রাখা।

জগতে যে-সকল উলঙ্গ অসভ্য জাতি দেখা যায়, তাহাদের প্রায় সকলেই ঝিনুক, প্রবাল প্রভৃতির মালিকা-গুচ্ছ, বৃক্ষতন্তু দ্বারা বুনা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝাঁপ্‌টা, মাঝারি আকারের বৃক্ষপত্র বা ধাতু-নির্ম্মিত এক-একটা ছোট চাকৃতি কটিবন্ধ-সাহায্যে ঠিক জননেন্দ্রিয়ের সম্মুখে ঝুলাইয়া রাখে; কোন কোন জাতি উহার চারিদিকে বা উপরেই নানা বর্ণের আলিম্পন করে। বস্তুত পৃথিবীতে পরিচ্ছদ জন্মলাভ করার পূর্বে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্ত্রীপুরুষ নিজেদের পরিপূর্ণ নগ্নতাকে কতকটা ঢাকিবার জন্য এবং কতকটা পরিমাণে পরস্পরকে পরস্পরের রূপের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য আলিম্পন বা দেহলেখার সৃষ্টি করিয়াছিল। দেহের যে সকল স্থান কামকেন্দ্র বলিয়া নির্ধারিত (অর্থাৎ মুখগহ্বরের চতুষ্পার্শ্ব ও তৎসহ গণ্ডদ্বয়, স্তনযুগ, নিতম্বদ্বয় ও যৌনযন্ত্র), সেইগুলিই প্রধানত নানা বর্ণে চিত্রিত করা হইত। এমনি করিয়া বোধহয় মানুষের দেহপট আশ্রয় করিয়া চিত্রশিল্প জগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছে*। প্রত্নবৈজ্ঞানিক-গণ প্রাচীনতম প্রস্তরযুগের যে সকল নিদর্শন খনন করিয়া, লক্ষ বৎসর পরে পৃথিবীর আলোয় টানিয়া তুলিয়াছেন, তাহার মধ্যে কয়েক প্রকার প্রসাধন-সামগ্রীও দেখা যায়। সে গুলির মধ্যে দুই তিন বর্ণের মৃত্তিকা বা প্রস্তরের গুঁড়া আছে। লৌহযুগে যে লোহার শুষ্ক মরিচার সহিত

* Cf.—Hirn, THE ORIGIN OF ART, pp.—234-55.

বল্লাহবিণের চর্বি মিশাইয়া একপ্রকার ক্রীম শরীরের বর্ণশুষমা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হইত, তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে।

কৃষ্ণ বর্ণের ধূলি, লালবর্ণের মাটি, গিরিমৃত্তিকা, এলামাটি প্রভৃতি এককালে আমাদের দেশেও দেহাঙ্গের বৈচিত্র-সম্পাদনে প্রয়োগ করা হইত। ক্রমে এই তালিকার সহিত শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, লাক্ষারস, শেফালিবৃন্তের রস, শুষ্ক সমুদ্র-ফেনা, তণ্ডুলচূর্ণ, অভ্রচূর্ণ, কজ্জল প্রভৃতি আসিয়া যোগ দিয়াছে। বস্ত্র প্রচলনের সহিত ইহাদের কোনটি বা পদযুগে নামিয়া আসিয়াছিল, কোনটি বা পুরঃকপালে উঠিয়াছিল; কিন্তু একেবারে অপ্রচলিত হইয়া যায় নাই। লোকাচার বা ধর্মাচার এগুলির প্রায় সব কয়টিকেই এখনো সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে।

সেই বর্বর যুগের মানব প্রস্তর বা লৌহ-নির্মিত ভোঁতা অস্ত্র দিয়া নিতম্ব, গণ্ডদেশ বা উদরের নিম্নভাগ চিরিয়া চিরিয়া চিত্রিত করিত; ঐ সকল ঘৃষ্ট রেখার উপরে নানারূপ বৃক্ষরস দিয়া রঙ্ ফলাইয়া সেগুলি স্থায়ীভাবে পরিস্ফুট রাখিবার চেষ্টা করিত। এমনি করিয়া আদিমকালের মানুষ উল্কীর (tattooing) উদ্ভাবন করিয়াছে*। দক্ষিণসামুদ্রিক দ্বীপপুঞ্জ, ক্যারোলিন্ দ্বীপ, নিউ গিনী, পেলিউ দ্বীপাবলীর অসভ্য উলঙ্গ অধিবাসীদের মধ্যে কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত মেয়েরা রতিশৈল (Mons Veneris) ও জনন-প্রদেশটির চতুর্দিকে উল্কী পরিতে ও নানাবর্ণে রঞ্জিত করিতে অভ্যস্ত ছিল। আরো লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আদ্য-ঋতু দর্শন করিবার সঙ্গেসঙ্গেই এইরূপ দেহলেখা অঙ্কন করিবার প্রথা ছিল এবং এই প্রথা-অনুস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে উৎসবানুষ্ঠানের আয়োজন হইত।

*(1) Edward Tylor, ANTHROPOLOGY ; AN INTRODUCTION TO THE STUDY OF MAN & CIVILIZATION. (Macmillan, 1881) p. 237; (2) Ludwig Stein, THE BEGINNINGS OF HUMAN CIVILIZATION. (Leipzig, 1905) pp. 74-75.

শুধু আমাদের দেশে নহে, পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেই, চিরকাল কামকলাবতী রমণীগণ অথবা বারবিলাসিনীগণ পরিচ্ছদের বিশিষ্ট রীতি ও কাট্‌ছাঁটের নব নব পরিকল্পনার উদ্ভাবন করিয়া আসিতেছেন। ইংলণ্ড পুরুষের পোষাকে ও প্যারিস্ স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদে এখনো সমগ্র সভ্য-জগতের আদর্শস্থল। আমাদের দেশে আধুনিক স্কার্টের মত পরিচ্ছদ কোন কালেই ছিল না বটে; কিন্তু অতি সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ ঘাঘ্‌রা, পায়জামা ও সাড়ীর চলন ছিল। ওড়্‌নাও ছিল এত আলোকসঞ্চারী যে, তাহার মধ্য দিয়া বক্ষ ও বদনের একটা মোহন বাহুরেখা জাহীর করা বিশেষ কষ্টসাধ্য ছিল না। সাড়ী প্রভৃতির বিচিত্র বর্ণসম্পাদন শুধু রূপের বিজ্ঞাপন-বৃদ্ধির জন্যই সমাশ্রিত হইত। নূরজাহাঁর পূর্বে এসিয়ার কুত্রাপি শায়ার প্রচলন হয় নাই। সেকালে রমণীর বসন-বিস্রস্ততা ও তজ্জনিত সলজ্জ ত্রস্ততা যুগপৎ পুরুষের শীতল মনের মারণাস্ত্র স্বরূপ গণ্য হইত। পাছাপেড়ে শাড়ীর মৌলিক তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে এইবার পাঠকের বোধহয় বিলম্ব হইবে না।

আমাদের দেশের (অধুনা লুপ্তপ্রায়) চন্দ্রহার, গোট্‌, কোমরের সাতনরী প্রভৃতি অলঙ্কার সৃজনের উদ্দেশ্যই হইল—অনাবৃত নিতম্ব ও জনন-যন্ত্রের স্মৃতি দর্শকের মনে জাগাইয়া দেওয়া। একমাত্র কালিদাসের কাব্য-নাটকাদি পাঠ করিলেই সে যুগের রমণীর অধোদেশে বা বক্ষ-সন্নিধানে দোদুল্যিত প্রায় এক কুড়ি বিভিন্ন প্রকার গহনার নাম পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত (মুসলমান আমলেও বোধ হয় খুব সীমাবদ্ধভাবে ছিল) আমাদের দেশের পূর্ণযুবতীরা যে পায়ে মল পরিতেন, তাহার কারণও ছিল উহার নিক্কনের প্রতি পুরুষের মন আকৃষ্ট করা। তোড়া, মল বা নূপুর-শিঞ্জন ছিল যেন সেকালের জাগ্রত যৌবনের মধুপ-গুঞ্জন,—আপন সংবৃত সৌন্দর্য-রহস্যের প্রতি সজাগ হইবার আমন্ত্রণ-কাকলি! বয়স-

ভেদে, সম্বন্ধ-ভেদে, স্থান-ভেদে ও মনোবৃত্তি-ভেদে উহার ধ্বনি বিভিন্ন রকমের হইত এবং ইহার অর্থবোধ করা প্রেমিক-প্রেমিকার একটা সাধনার বস্তু ছিল। শ্রীকৃষ্ণের বংশীর আহ্বান বৃন্দাবনের গোপীকুল যেরূপ সুন্দর বুঝিতে পারিত, শ্রীকৃষ্ণও আবার তেমনি অভিসারিকা কুব্জা, বৃন্দা বা রাধার নূপুরের ভাষা কুঞ্জান্তরাল হইতে চমৎকার বিনির্ণয় করিতে পারিতেন। অধিকতর কুতূহল ও কাব্যরস-পিপাসু পাঠকদিগকে কবি ৺দেবেন্দ্রনাথ সেনের "ঝুমুর্ ঝুমুর্ ঝুম্ বাজে ঐ মল" শীর্ষক কবিতাটি একবার পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। উভয় পদের শীর্ষদেশমূলেই জননযন্ত্রের অধিষ্ঠান ; যে স্বাভাবিক ইচ্ছা বৃক্ষের মূল দেখিয়া অগ্রভাগ দেখিতে চাহে, পর্বতমূলে পৌছিয়া মন্দির-সনাথ শিখরে উঠিতে ব্যগ্র হয়, তাহাকেই প্রকারান্তরে উদ্রিক্ত করাই ছিল পায়ের গোড়ালিতে এই সরব অলঙ্কার রাখার অন্যতম উদ্দেশ্য।

যে সকল আদিম জাতি পরিচ্ছদ পরিধান করে, তাহাদের পরিচ্ছদের খর্বতা ও পরিধানের ভঙ্গিমা দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, উহার প্রধান উদ্দেশ্য যৌনলিপ্সাকে শাণিত করা ছাড়া আর কিছুই নহে। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আদিম অসভ্য জাতির স্ত্রী-পুরুষগণ সভ্য বা অর্ধসভ্য জাতি অপেক্ষা অল্প কামপ্রবণ। অধ্যাপক মণ্টেন্ যে বলিয়াছেন, "There are certain things which are hidden in order to be shewn,"—কথাটা এই সূত্রে সুন্দর প্রযোজ্য। সামান্য সৌন্দর্যজ্ঞানী বা রূপদক্ষ মাত্রই জানেন যে, অর্ধনগ্না বা দেহলিপ্ত-সিক্তবসনা নারী মানুষের যতটা লালসা জাগাইতে পারে, পূর্ণনগ্না নারী ততটা পারে না। এই কারণেই পুরাতন প্রেমিকের নিকটও নারী সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইতে চাহেন না। [ইহার আরো একটি কারণ আছে.

পরে বলিব।] ঐ জন্য কামপীড়িতা নারী স্থলবিশেষের বসন ঈষৎ সরাইয়া পুনঃপুন সংবরণ করে।

নিউ হেব্রিডিস্ নামক স্থানে পুরুষের লিঙ্গই সর্বাপেক্ষা লজ্জা-স্থল বলিয়া গণ্য হয়। তাহাদের ধারণা, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির লিঙ্গ দর্শন করিলে নরক-বাস অনিবার্য। কাযেকাযেই ঐ দেশের পুরুষগণ কিশোর বয়স হইতে কয়েক হাত কাপড়ের ফেটী দিয়া আপন-আপন লিঙ্গ জড়াইয়া কটিবন্ধের সহিত উর্ধ দিকে বাঁধিয়া রাখে একজন প্রাপ্তবয়স্কের লিঙ্গ এইরূপ কাপড়ে জড়াইয়া প্রায় দুই ইঞ্চি চওড়া এবং হাত খানেক লম্বা একটা কাপড়ের পুঁটুলির মত প্রতীয়মান হয়। দিনের বেলায় তাহারা যথাসম্ভব প্রস্রাব-বেগ চাপিয়া রাখে, অত্যাবশ্যক হইলে অত্যন্ত অন্ধকারময় নির্জন স্থানে গিয়া অতি সন্তর্পণে তাহাদের লজ্জা-স্থল উন্মোচিত করে। কোমরে বা গাত্রে তাহারা অন্য কোন বস্ত্র পরিধান করে না, এমন কি অণ্ডকোষদ্বয় অনাবৃত রাখে।

দেশ-বিশেষে লজ্জার বিভিন্নতা

নিউ গিনীর স্ত্রীলোকগণ সামান্য এক টুকরা ন্যাকড়া তাহাদের যোনিদেশের সম্মুখে ঝুলাইয়া রাখে। বর্তমান প্রতীচ্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বস্ত্রখণ্ডের উন্নতিসাধন করিয়াছে। যাহা হউক, উলঙ্গাবস্থাপন্ন কোন স্ত্রীলোকই লজ্জাবোধে অবগুণ্ঠনবতী রমণী অপেক্ষা হীন নহে। কোনো বিদেশাগত পুরুষকে তাহাদের নগ্নতা সতৃষ্ণদৃষ্টিতে উপভোগ করিতে দেখিলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ সলজ্জ গাম্ভীর্যে ঘুরিয়া দাঁড়ায়।

স্বনামধন্য কাপ্তেন কুক্, তাঁহার দেশ-আবিষ্কার উপলক্ষে সমুদ্র-ভ্রমণের বিবরণে * লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, তাহিটি নামক অসভ্য

* J. Hawkesworth, "ACCOUNT OF VOYAGES" Vol. I. p. 469.

অধিবাসী-সমাকীর্ণ দ্বীপে দৈহিক বা বাচনিক লজ্জার বিষয় কিছুই নাই। একদিন তিনি তথাকার নব-নির্মিত গির্জায় উপাসনা সমাপন করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন যে, একজন পুরা চারি হাত লম্বা জোয়ান্ যুবক একটি এগারো বা বার বৎসরের মেয়ের সহিত রতি-রভসে নিযুক্ত হইয়াছে; চারিদিকে বহু শত নেটিভ উৎফুল্ললোচনে নির্বাক্ স্বাচ্ছন্দের সহিত এই দৃশ্য উপভোগ করিতেছে,—কাহারো তাহাতে লজ্জা বা সঙ্কোচ-বোধ নাই। তাহাদের দেশাচার হইল, "to gratify appetite and passion before witnesses" (অর্থাৎ—এক বা ততোধিক সাক্ষীর সম্মুখে দেহের সর্বপ্রকার ক্ষুধা ও সংরাগের উপশম করা)।...গ্রীক্ দার্শনিক প্রসিদ্ধ বিশ্বনিন্দাবাদী ক্রেতিস্ তাঁহার স্ত্রী হিপ্পার্কিয়ার সহিত নাকি রাস্তা-ঘাটে প্রকাশ্যভাবে দেহধর্ম প্রতিপালন করিতেন। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন—এই চারিটি সহজ প্রবৃত্তিতে মানুষ ও পশু একই স্তরে,—এই ছিল তাঁহার বিশ্বাস।

দক্ষিণ আমেরিকার য়্যামেজন্ নদীর উভয় তীরে বিভিন্ন কৃষ্ণকায় উপজাতি বাস করে। তথায় গুয়েকিউরাস্ নামক একপ্রকার উপজাতির পুরুষগণ সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকে, স্ত্রীলোকগণ এক প্রকার ছোট ঘাগ্‌রা পরিধান করে। আবার উঅপ্যাস নামক উপজাতির মধ্যে পুরুষেরা ছোট এক টুক্‌রা কটিবন্ধ ও স্ত্রীলোকেরা উলঙ্গ হইয়া থাকিবার প্রথা আছে। মধ্যব্রাজিলের ইণ্ডিয়ান্‌রা শরীরের কোন অঙ্গই গোপন বলিয়া স্বীকার করে না। *

ভারতের বহু পার্বত্য জাতির স্ত্রীলোকেরা আট-দশ শাড়ী পরিধান করে, কিন্তু পুরুষরা লেংটি মাত্র ব্যবহার করে। অথচ ইহাদের স্ত্রীলোকরা

* I. Bloch, CONTRIBUTIONS TO THE ETIOLOGY OF PSYCHOPATHIA SEXUALIS, Vol. ii.

স্তনদ্বয়কে লজ্জার বস্তু বলিয়া মনে করে না এবং প্রায়শই অনাবৃত রাখিয়া দেয়। কিন্তু আসামের পার্বত্য নাগা স্ত্রীলোকগণ এত সামান্য বস্ত্র তাহাদের কটিতে জড়ায় যে, তদ্দারা লজ্জা-নিবারণের কায কোনমতেই চলিতে পারে না; অথচ তাহারা স্তনদ্বয় বালিকা বয়স হইতেই ভালো করিয়া আবৃত করিয়া রাখে। তাহাদের মত হইল এই যে, যে-জিনিষ (অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়) জন্মলাভ করিবার সময়ই বহু লোক প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহাকে পরিপাটিরূপে আবৃত করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র; কিন্তু যে জিনিষ (অর্থাৎ স্তনদ্বয়) জন্মের বহু পরে লোক-চক্ষুর অন্তরালে উদ্ভূত হইয়া তিলে তিলে বাড়িয়াছে, তাহাকে ঢাকিয়া রাখাই যুক্তিযুক্ত।

যাঁহারা অন্তত পনের বৎসর পূর্বে হরিদ্বারে গিয়াছেন, তাঁহারাই অবশ্য লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া থাকিবেন যে, বহু পঞ্জাবী স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া স্বচ্ছ ব্রহ্মকুণ্ডের জলে স্নান করিতেছেন এবং তদবস্থায় তীরে উঠিয়া গাত্র মুছিতেছেন,—তাহাতে তাঁহাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ নাই। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ ও পাণ্ডাদের ক্রমাগত ঘোরতর আপত্তির ফলে কয়েক বৎসর ধরিয়া এ দৃশ্য আর দেখা যায় না বটে; তবে জনৈক পত্র-প্রেরক বলিতেছেন যে, এখনো বহু 'কনকচম্পক-গৌরী' যুবতীকে খালি গায়ে গাত্র-মার্জনা করিতে দেখা যায়। পুস্তক-লেখকও গত ১৯২৮ সালে হরিদ্বারে গিয়া মাঝে মাঝে এ দৃশ্য দেখিয়াছেন;—বহু স্নানার্থীর সতৃষ্ণ চোরা চাহনির মধ্যস্থলে এই পঞ্জাবী রমণীগুলি নির্বিকারচিত্তে দাঁড়াইয়া আপনমনে অনাবৃত দেহোর্ধভাগ মুছিয়া যাইতেছে! জনৈক বাঙ্গালী অধ্যাপক ঝিলাম, রাভি প্রভৃতি নদীতীরস্থ গ্রামবাসিনীদিগকে সম্পূর্ণ নগ্নদেহে স্নান করিতে দেখিয়াছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এ রীতি ক্রমশ শিথিল হইয়া আসিতেছে। এক প্রবাসী বন্ধু জানাইয়াছেন, বৎসর তিনেক পূর্বে কুম্ভমেলা-যাত্রী একদল

পঞ্চনদনিবাসিনী স্ত্রীলোক লক্ষ্ণৌয়ের গোমতী নদীতে স্নান করিয়া, বহু লোকের দৃষ্টির সম্মুখে তীরে উঠিয়া, নগ্নাবস্থায় ভিজা পাজামা ছাড়িয়া শুষ্ক পাজামা পরিধান করিয়াছিল !

মাদ্রাজের বহু স্থলে নদীতীরে বা সরকারী কূপ-সন্নিধানে স্ত্রীলোকগণকে তাঁহাদের চৌদ্দ হস্ত পরিমিত কাপড়ে আবৃত লজ্জার অনেকখানিই বিসর্জন দিতে দেখা যায়। বাংলা, তথা উত্তরভারতের প্রায় সকল স্থলেই রমণীর লজ্জার লীলাকেন্দ্র দেহের প্রায় প্রতি অঙ্গেই বিদ্যমান—বিশেষভাবে অধোদেশ, বক্ষস্থল (শিরসমেত), ও মুখমণ্ডল; অবশ্য শহরে বা উচ্চশিক্ষিতাদের মধ্যে লজ্জার এত ব্যাপকতা নাই। কিন্তু পশ্চিম বাংলার কোনো কোনো স্থলে মুখমণ্ডলই অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক লজ্জার স্থল বলিয়া জানা যায়। পুষ্করিণীর তীরে বা গ্রাম্য পথের পার্শ্বে দল বাঁধিয়া স্ত্রীলোকগণ বেগবর্জনে বসিয়া যান্; শ্বশুর-ভাশুরাদি অথবা কোন অপরিচিত লোক নিকটবর্তী হইলে, তাঁহারা নিম্নাঙ্গের বসন সংবৃত না করিয়াই মাত্র ঘোম্‌টাটি টানিয়া দেন।

সভ্য ইয়োরোপীয়ান্ সমাজে রাজ্ঞী এলিজাবেথ্ হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময় পর্যন্ত রমণী-সমাজে মুখসম্মুখ ব্যতীত অবশিষ্ট সর্ব অঙ্গই পরিপাটিরূপে ঢাকিয়া রাখার প্রথা ছিল,—শীতপ্রধান দেশে স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়াও উহার প্রয়োজনীয়তা ছিল ও আছে। কিন্তু বর্তমানে তাঁহাদের ঘাগ্‌রা ক্রমশ ছোট হইতে হইতে প্রায় হাঁটুর সমীপবর্তী হইতে চলিয়াছে, এবং নীতিবিদ্‌গণ ঘোরতর আশঙ্কা করিতেছেন যে, স্ত্রীলোকদিগের স্কার্ট্ প্রতি বৎসরই বুঝি অর্ধ ইঞ্চি করিয়া এইভাবে কমিতে থাকিবে। জ্যাকেট্ ও ব্লাউজের ইংরাজি Vএর আকারে গলা কাটার দরুণ বক্ষোদেশের লজ্জা বহুপরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। আমাদের

এই নকলনবীশ দেশের সর্বত্রও বিস্ফারিত 'ভি-'গলা-সমন্বিত ব্লাউজের অত্যধিক কদর বাড়িয়াছে; তদুপরি চৌকা গলার ফাঁদ ধীরে ধীরে এত বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে যে, কুল-ললনার বক্ষের শালীনতা রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিয়াছে।

তাহার উপর থিয়েটার ও বায়স্কোপে, শুধু বারবণিতার কেন, ভদ্র কুমারীদের লালসা-চটুল, আবেগ-ভঙ্গিম অর্ধনগ্নাবস্থার আধুনিক নৃত্য দেখিতে ইউরোপ-আমেরিকার কঠিনতম রুচিবাগীশ ও শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পুরুষমহিলাদেরও লজ্জার অবকাশ থাকে খুবই কম। সম্প্রতি সমুদ্র-পার হইতে এই কলুষিতসভ্যতার বাতাস বহিয়া আসিয়া, আমাদেরও মনোহরণ করিতেছে।

সকল দেশের স্ত্রীলোকগণের মধ্যেই প্রকাশ্যে আহার-বিষয়ে অল্প-বিস্তর লজ্জাবোধ আছে। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকগণের মধ্যে এই লজ্জাবোধটা অন্যান্য সভ্যদেশ অপেক্ষা একটু বেশী বলিয়াই বোধ হয়। ইহার মনস্তাত্ত্বিক কারণ আর কিছুই নহে,—পাছে তদ্দৃষ্টে অপরের ক্ষুধাবোধ জাগ্রত হয় এবং অপরের নিকট নিজেকে অসুন্দর প্রতীয়মান হইতে হয়।

আহারে লজ্জা

মনোবিশ্লেষক ফ্রয়েড্-বিদ্যালয়ের মতে, বদনবিবর নারীর জনন-নালীর প্রতীক। বস্তুত এতদুভয়ের মধ্যে রূপগত ও কার্যগত বহু সৌসাদৃশ্যের বিষয় বিবৃত করিয়া দেওয়া যায়। সেইজন্য বহু দেশের লোকের ধারণা যে, যে-যুবতীর মুখের হাঁ যত ছোট, তাহার গোপনাঙ্গ-দ্বারও তদনুপাতে ছোট। হিন্দুঘরের নব-পরিণীতা বধূ শ্বশুর-শাশুড়ী-দেবর-ভাশুর প্রভৃতি কাহারো সম্মুখে আহার করিতে মরমে মরিয়া যান্,—স্বামীর সম্মুখে তো কথাই নাই! শ্বশুরালয়ে গিয়া নূতন জামাইকেও এ বিষয়ে একটু লজ্জাবোধ করিতে দেখা যায়। অথচ উৎসব-স্থলে গিয়া, সকল বয়সী

স্ত্রীলোকগণই পুরুষ পরিবেষকদিগের সম্মুখেই তাঁহাদের আহার বিষয়ক লজ্জাবোধকে স্বচ্ছন্দে জলাঞ্জলি দেন।

আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি অসভ্য জাতি আহার-কালীন্ লজ্জাশীলতায় সকল জাতিকে পরাস্ত করিয়াছে। তাহিটী স্ত্রী-পুরুষগণ সামাজিক ভোজ কাহাকে বলে—জানে না বলিলেই হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, অঙ্গাবরণ বা জননেন্দ্রিয়জনিত লজ্জা সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ কোনো পরিজ্ঞান নাই। কিন্তু নিজ পরিবারের মধ্যেও ইহারা একত্রে ভোজন করিতে লজ্জা বোধ করে; এমন কি ভাই-বোন বা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সম্মুখে বসিয়া আহার করে না। তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন আহার্য লইয়া, দশ-পনের হাত ব্যবধানে পরস্পরের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া, আহার করে। মধ্য-আফ্রিকার বরুরুয়া নামক জাতির মধ্যেও এই প্রথা বর্তমান। জলপান করিবার সময়ও তাহারা গোপনতার শরণ লয়। প্রত্যেক বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষই, নিতান্ত অক্ষম না হইলে, পৃথক অগ্নিতে আপন আহার্য আপনি পাক করিয়া লয়। মধ্য-ব্রেজিলে বাকাইরী নামক এক অসভ্য জাতি আছে। নগ্নতা সম্বন্ধে তাহাদের কোনো সঙ্কোচ নাই; কিন্তু আহার বিষয়ে তাহারা অত্যন্ত সতর্ক। একদা কার্ল ফন্ ডেন্ ষ্টাইনেন্ নামক এক জার্মাণ-ভ্রমণকারীকে প্রকাশ্যে আহার করিতে দেখিয়া তাহারা গভীর লজ্জায় অধোবদন হইয়াছিল,—সভ্যদেশে কাহাকেও প্রকাশ্যে বেগবর্জন করিতে দেখিলে ঠিক যে দশা হয় * !···

লজ্জাশীলতাকে যদি মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর রাখিয়া বিশ্লেষণ করিতে যাই, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই, তাহার মূলে একটা স্বাভাবিক শঙ্কা ও জুগুপ্সা বা বিরাগ বর্তমান।

* Karl von den Steinen, EXPERIENCES AMONG THE SAVAGE RACES OF CENTRAL BRAZIL (Berlin, 1894)

সকলেই জানেন, প্রাণী-জগতের একটা চিরন্তন সত্য এই যে, যৌন ব্যাপারে পুরুষ জাতি অল্প-বিস্তর সক্রিয় ও স্ত্রীজাতি কমবেশী নিষ্ক্রিয় (সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় বলিতে রাজী নহি)। ইহার বিষয় অতঃপর কিছু আলোচনা করিব।

লজ্জায় আত্মরক্ষা

মানবেতর প্রাণীর মধ্যে ইহাও দেখিতে পাই যে, মাসের বা বৎসরের একটা বিশেষ সময়ে স্ত্রী-প্রাণী পুরুষ-প্রাণীকে উপভোগের সুযোগ দেয়, অন্য সময়ে সাধ্যমত তাহাতে বাধা প্রদান করে। এই নির্দিষ্ট সময়টিতে স্ত্রীজাতি অত্যন্ত কামাসক্ত হয় এবং তখন পুরুষকে রতিক্রিয়ায় উত্তেজিত বা আমন্ত্রণ করিবার জন্য সবিশেষ সচেষ্ট হইয়া উঠে। অবশিষ্ট সময়ে অনিচ্ছা-সম্ভূত যৌন-ক্রিয়ার বেদনা বা দীনতা হইতে তাহাকে আত্মরক্ষা করিতে হয়।

কুকুর, বিড়াল, গাভী, সিংহ, বাঘ, বানর, শৃগাল প্রভৃতি বহু প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় যে, মাস বা বৎসরের এক একটা বিশেষ দিনে ও সময়ে তাহারা স্বতঃসম্ভূত কামাবেগ-দ্বারা পীড়িত হয়; স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যে এই সাময়িকতা বিশেষভাবে পরিস্ফুট। গাভী 'ডাকা'র অর্থ বোধহয় সকলেই জানেন। আর একটা বিশেষত্ব হইল, গর্ভ হইলে বা প্রসবের কিছু দিন পর পর্যন্ত, ইহাদের আসঙ্গলিপ্সা আদৌ উদ্রিক্ত হয় না; সে সময় ইহারা পারতপক্ষে পুরুষের উপক্রম এড়াইয়া চলিতে চাহে। সুতরাং এই সূত্রে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্ত্রীজাতির লজ্জার অন্যতম উদ্দেশ্য পুরুষের অনভিপ্রেত বা অসময়োচিত আক্রমণকে এড়াইয়া চলা।

সর্ববিষয়ে ক্রিয়াশীল ও উদ্যোগী পুরুষকে উদ্দীপ্ত করিতে, কামোদ্রিক্তা স্ত্রীজাতি ভঙ্গিমার সহিত এমন একটা অগভীর অনিচ্ছার ভাণ করে, যেটির বিকাশে পুরুষের পাইবার বাসনা প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠে। পুরুষ তখন এই

লজ্জায় লীলাবিভ্রম

অনিচ্ছাকে আপনার ইচ্ছার সহিত খাপ্ খাওয়াইতে উন্মত্ত হয়। অবশ্য তখন স্ত্রীজাতি অতি সামান্য আয়াসেই ধরা দেয়, যেন পুরুষের ব্যক্তিত্বের নিকট পরাভব স্বীকার করিল। নারীর লজ্জার সার্থকতা এইখানেই। ইহা তাহার পরাজয়ের আড়ালে জয়ের গৌরব।...তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সময় বিশেষে নারীর অতিরিক্ত লজ্জাশীলতার অভিনয়—সম্ভোগের সকুণ্ঠ আমন্ত্রণ!

পশুদের মধ্যে লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, পুরুষকে উদগ্রকাম করিয়া দিয়া স্ত্রী-পশু তাহাকে বাধা দেয়। তারপব পুরুষ-পশু তাহাকে জোর করিয়া ধরিতে গেলে, সে তাহাকে এড়াইয়া অল্প অল্প দৌড়াইতে আরম্ভ করে—পুরুষের পশ্চাদ্ধাবন সম্বন্ধে এক প্রকার নিঃসন্দেহ হইয়াই। তাহার এই দৌড় অনেকটা ক্ষুদ্র স্থান ব্যাপিয়া চক্রাকারে সাধিত হয়—যাহাতে পুরুষ-পশু অল্পায়াসেই তাহাকে ধরিতে পারে। তারপর যখন সে ধরা পড়ে, তখন তাহার এই প্রতীয়মান পরাভবে কোন ক্ষোভের চিহ্নই বর্তমান থাকে না।

স্ত্রীলোকের কাম-জীবন অধ্যয়ন-প্রসঙ্গে সর্বদা এই কথাটা স্মরণযোগ্য যে, তাহাদের স্বতস্ফূর্ত বা স্বাভাবিক কামোদ্রেক একটা নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত প্রায় অসম্ভব। নিজেদের কামোদ্রেককে সংবৃত রাখিবার এই-যে একটা প্রেরণাগত ইচ্ছা, ইহাই রমণীসুলভ লজ্জার জন্য অনেকাংশে দায়ী। পুরুষের কামোদ্রেকের কোনো ধরা-বাঁধা সময় না থাকায়, ওই লজ্জার প্রতিবন্ধকতা এই শারীরিক সত্যটিকে প্রতিপন্ন করিয়া দেয় যে, প্রকৃতিনির্দিষ্ট সহবাস-ক্রিয়ার পরিমাণ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

মানুষের শরীর হইতে যে সকল অকেযো জিনিষ বাহির হইয়া যায়, সেগুলির প্রতি সকলেরই কেমন একটা স্বাভাবিক ঘৃণা, বিতৃষ্ণা বা বিরাগ

লজ্জার মূলে আত্মজুগুপ্সা

আছে। মানুষের যখন প্রস্রাব বা বিষ্ঠা নিঃসারণের প্রয়োজন হয়, তখন সে অপরের দৃষ্টির আড়ালে তাহা সম্পাদন করে ; কারণ যে জিনিষের প্রতি তাহার নিজেরই ঘৃণা আছে, তদ্দর্শনে অপরের যে অধিকতর ঘৃণার সঞ্চার হইবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ কোথায় ?

স্ত্রী ও পুরুষের জননেন্দ্রিয় দুইটি নির্গম-যন্ত্রের সন্নিহিত বা ঠিক মধ্যবর্তী স্থলে স্থাপিত হওয়ার জন্য, সঙ্গগুণে ইহার প্রতিও সকল ব্যক্তির একটা স্বাভাবিক ঘৃণা-বোধ জন্মিয়াছে। তদুপরি, সাধারণত পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয় প্রাত্যহিক তত্ত্বাবধান সত্ত্বেও অল্পাধিক অপরিষ্কৃত ও গন্ধযুক্ত অবস্থায় থাকে। কাজেই অপরিচিত লোক ত দূরের কথা, নিতান্ত পরিচিতের নিকটও এগুলি প্রকাশ করিতে তাহাদের মধ্যে সঙ্কোচ ও বিতৃষ্ণা আসে। এবং ওই আত্মদুর্বলতা ও বিতৃষ্ণা-উদ্রেকের সংবিৎই রমণীর মৌলিক লজ্জাশীলতার অন্যতম জনক *। ঠিক এই নিমিত্ত নারী বা পুরুষ ঘর্মাক্ত থাকিলে, মলিন বস্ত্র-পরিহিত থাকিলে, অথবা রোগযুক্ত, অপরিষ্কৃতদন্ত থাকিলে, সহজে অপরের সন্নিকটে যাইতে চাহে না ; লজ্জার ভাণ স্বাভাবিক আবেগের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সকল ইন্দ্রিয় দিয়া নিজেকে অপরের নিকট হৃদ্য, কাম্য ও সুলভ করিবার প্রয়াসই জগতে এত প্রসাধন-সামগ্রীর জন্ম দিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, কৃত্রিম রূপটানে ও অঙ্গরাগে যিনি যত অভ্যস্তা ও পারদর্শী, তাঁহার মধ্যে ব্রীড়াবোধ তত অল্প বা অগভীর।

গুহ্যদ্বার বা জননেন্দ্রিয় কোনো গুরুতর পীড়াগ্রস্ত হইলে, নিতান্ত দায়ে পড়িয়া লোকে সেগুলি চিকিৎসকের পরীক্ষার সম্মুখে প্রকাশ করে।

* Cf.—WOMAN AS CRIMINAL AND PROSTITUTE by Lombroso and G. Ferrero.

তাহাতেও আবার অনেকের প্রথম প্রথম দুর্লঙ্ঘ্য সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হয়। বহু প্রথম-প্রসূতি প্রসবের সময় ধাত্রী বা ধাত্রীবিদ্যাবিশারদের সম্মুখে নগ্ন হইতে রীতিমত বিদ্রোহ উপস্থিত করে। কারণ, সকলেরই মনের ধারণা এই যে, ঐ স্থানদ্বয় অপরিচ্ছন্নতার অভিব্যঞ্জক এবং উহার প্রদর্শন অপরের বিরাগ-উৎপাদক।

স্ত্রীলোক যখন ঋতুমতী হন্, তখন সাধ্যমতো সে ঘটনা অপরের নিকট তো বটেই—এমন কি, নিজের স্বামীর নিকট পর্যন্ত সংগোপন রাখিবার চেষ্টা করেন; কারণ, এই ব্যাপারটা কতকটা প্রকৃতপক্ষেই অস্বাস্থ্যকর, ঘৃণাব্যঞ্জক ও অপরিচ্ছন্নতা-দ্যোতক। স্বামী এই ব্যাপার না জানার দরুণ যদি কখনো ঋতুকালে উপগত হইবার চেষ্টা করেন, তখন স্ত্রী নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে ঘটনাটি প্রকাশ করেন। তথাপি উত্তেজিত স্বামী অগ্রসর হইতে চাহিলে, আপন আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক্ সত্ত্বেও নিতান্ত বেদনার সহিত স্ত্রী তাহাতে কঠিন বাধাপ্রদান করেন। ইহার তাৎপর্য হইল—পাছে স্বামী এই কলুষিত শোণিতবেগের অনুভূতিতে বিরক্ত ও যোনিনালির অতিরিক্ত পিচ্ছিলতায় অতৃপ্ত হন্।

অনেকটা এই কারণেই শিক্ষিতা মাতৃগণ তাঁহাদের কিশোর-বয়সী কন্যাগণের নিকট পর্যন্ত ঋতুস্রাবের কথা প্রকাশ করেন না; এবং মেয়ের নিজের আদ্যঋতু আরম্ভ হইলে, তাহাকে ভালো করিয়া উহার কারণ ও ক্রিয়াতত্ত্ব বুঝাইয়া বলিতে যথেষ্ট উদাসীনতা প্রদর্শন করেন। তাঁহাদের মনের ভাব যেন এইরূপ,—ঐ ব্যাপারটি জীবনের একটি অতি অকিঞ্চিৎকর, অপ্রীতিকর অথচ অপরিহার্য ঘটনা; উহার সম্বন্ধে কিছু জানিবার থাকিলে, মেয়ে তাহা অন্য কোনো প্রণালী হইতে জানিয়া লউক—ক্ষতি নাই। শিক্ষিত পরিবারের মধ্যে ঋতু সম্বন্ধে এত সংগোপনশীলতার জন্যই আমাদের দেশের মেয়েরা এ সম্বন্ধে বন্ধুবান্ধবের নিকট কাণাঘুষা দ্বারা সামান্য কিছু

ছাড়া বিশেষ কোন জ্ঞান অর্জন করিতে পারে না ; এবং এই কারণেই ঋতু সম্বন্ধে কোন বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইলে, মাতা বা শ্বাশুড়ী—এমন কি স্বামীর কর্ণে পর্যন্ত তুলিতে মরমে মরিয়া যায়।

ঘৃণা উদ্রেকের আশঙ্কায়, শুধু ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক নহে—বেশ্যাগণ পর্যন্ত, শীতল মুহূর্তে পরীক্ষণের জন্য তাহাদের গোপন অঙ্গ স্বামী বা ঘনিষ্ঠ প্রেমিকের নিকটও উন্মুক্ত করিয়া দেখাইতে চাহেন না। আমাদের দেশের মেয়েদের ভিতর অনেকটা ওই হেতুবাদ ভিত্তি করিয়া ও শ্রীবৎস-চিন্তার কাহিনী ঘেরিয়া, এই প্রবচনটি গড়িয়া উঠিয়াছে যে, স্ত্রীলোক উলঙ্গ হইয়া শয়ন করিলে তাহাতে শনির দৃষ্টি পড়ে ; অন্তত এক টুক্‌রা কাপড়ও স্ত্রী-অঙ্গের উপর রক্ষা করা লক্ষ্মীমতীর লক্ষণ। স্বামী বা প্রেমিকের নির্বন্ধাতিশয্যে যদি বা তাঁহারা ওই স্থান উন্মুক্ত করেন, তথাপি পারতপক্ষে তাহা হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতে বা তাহা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে দিতে বিশেষ আপত্তি করেন। কিন্তু যদি একবার নবযৌবনা নারীর মনে প্রমাণ-প্রয়োগে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দেওয়া যায় যে, ঐ স্থান তাঁহাদের নিকট পবিত্র—বিন্দুমাত্র ঘৃণা উদ্রেকের সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে লজ্জার যবনিকা ধীরে ধীরে উত্তোলিত হইতে থাকে।

এই আশঙ্কা ও ঘৃণা-ভাবের প্রভাব হইতেই জননেন্দ্রিয় ও গুহ্য দেশীয় গোপনতার উৎপত্তি ; এবং এই গোপনতার জন্যই ইহাদের সংস্থান-জ্ঞান ও ক্রিয়া-আলোচনা সম্বন্ধে মানুষ এত নীরব, লজ্জাপরায়ণ !

সামাজিক আচার-অনুশাসন ও ধর্ম-সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানের বন্ধনের উপরও রমণীর লজ্জাশীলতা অনেকটা নির্ভর করে। আট-নয় বৎসরের যে কন্যাটি এক প্রকার অর্ধোলঙ্গ অবস্থায়ই পিতার গৃহে খেলা করিয়া বেড়াইতেছিল, সামাজিক অনুশাসনের বন্ধন-সংস্কার তাহাকে বিবাহের রাত্রে এমন

সামাজিক প্রভাব

আশ্চর্যভাবে পরিবর্তিত করিয়া দেয় যে, সে শ্বশুরবাড়ী আসিয়াই অন্য অঙ্গ ত দূরের কথা, মুখখানি পর্যন্ত মেয়েমহলে উন্মুক্ত করিতে, লজ্জায় পদ্মকুঁড়ির মতো চক্ষুদুটি মুদ্রিত করিয়া ফেলে; একান্ত সমবয়স্কা সখীর নিকটও স্তনোদ্ভিন্ন না হইলেও বক্ষের বসন বারে বারে টানিয়া উপরে উঠায়।

আবার, ক্ষেত্র ও কাল বিশেষে এই লজ্জাশীলতা সম্বন্ধে জ্ঞান অস্থায়ী-ভাবে রমণীর নিকট হইতে দূরে চলিয়া যায়। যৌনাবেগ জাগরণের সময় বা রমণের পূর্বে রমণী যেরূপ লজ্জশীলতা প্রদর্শন করেন, তৃপ্ত হইবার পর

লজ্জার হ্রাস-বৃদ্ধি

সে লজ্জার মুখোস্ প্রায়ই খসিয়া যায়; এমন কি, তখন পুরুষের চেয়ে তাঁহারা বেশী নির্লজ্জতার পরিচয় দেন। তখন হয়ত পুরুষ উলঙ্গ হইয়া নিদ্রা যাইতে সঙ্কোচ বোধ করেন, কিন্তু প্রায় রমণীই করেন না। পুরুষের লজ্জাশীলতার একটা মাপকাঠি ও স্থায়িত্ব আছে, কিন্তু রমণীর নাই। আমাদের দেশের পল্লীগ্রামে বহুস্থলে কন্যার আদ্যঋতু-দর্শন উপলক্ষে মহিলাগণ-দ্বারা অনুষ্ঠেয় “কাদা” বলিয়া একটা উৎসব এখনো প্রচলিত আছে। ঐ উৎসবে রমণীরা লজ্জাশীলতার সীমা অতিক্রম করিয়া এত দূর চলিয়া যান্ যে, ঘটনাক্রমে যদি কোনো পুরুষ সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হন্ তো তিনিই লজ্জিত হইয়া সেস্থান ত্যাগ করিবার পথ খুঁজিয়া পান্ না।… বিবাহাদি উৎসবে, দূর ভ্রমণে, তীর্থক্ষেত্রে ও আপদে-বিপদে নারীর লজ্জাবোধ আপনা-আপনি অনেকখানি ঘুচিয়া ও মুছিয়া যায়।

অন্য সময় বাটীর ছেলে-পুলেরা যে শুচিবায়ুগ্রস্তা স্ত্রীলোকের গোড়ালির উপরে কখনো বসন উঠিতে দেখে না, পায়খানায় যাওয়ার সময় তাঁহারা ছোট একখানি গামছাই তাঁহাদিগের শালীনতা রক্ষা করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত মনে করেন (কোন কোন যুবতী অতিরিক্ত লজ্জাশীলতা বশত

বক্ষের উপর অবশ্য আর একখানি গামছাও ব্যবহার করিয়া থাকেন); অনেক বয়স্থারই বাটীর অল্পবয়সী স্নেহভাজনদের সম্মুখে তথাকথিতরূপ "অশুদ্ধ" কাপড় ছাড়িবার সময় সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়াই পর মুহূর্তে "শুদ্ধ" কাপড়খানি আল্‌না হইতে লইয়া পরিধান করেন,—তাহাতে লজ্জাশীলতার বিশেষ হানি হয় না!

• যে-সকল পশ্চিমা স্ত্রীলোকগণের অবগুণ্ঠনের মধ্যে কখনো একটি মাত্র সূর্য-রশ্মি বৎসরের ৩৬৫ দিন প্রবেশাধিকার পায় না, তাহারাই 'হোলি'র সময় আনন্দের উন্মাদনায় অঙ্গের অনেকাংশ হইতে বসন বর্জন করিয়া ফেলিতে দ্বিধা বোধ করে না। দেবরগণের ত কথাই নাই, শ্বশুর-ভাশুর-পাড়া-পড়্‌শী-বন্ধু-বান্ধবরাও শুদ্ধান্তঃপুরের প্রাচীর ভেদ করিয়া উচ্ছ্বসিত কৌতুকে রমণীর সর্বদেহে ফাগুয়া মাখাইয়া পরিতৃপ্ত হয়।...হোলির পরদিনই বসন্তের নবোদ্গত পত্রের মতো তাহাদের লজ্জা নূতন প্রাণ পাইয়া, আবার সেই সনাতন অবগুণ্ঠনের মধ্যে ফিরিয়া আসে!

আসল কথা হইতেছে এই, রমণীকে যদি ভালো করিয়া উপলব্ধি করাইয়া দেওয়া যায় যে, ক্ষেত্র বা পাত্র বিশেষে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে প্রদর্শিত তাঁহার লজ্জাহীনতার জন্য পরিবার বা সমাজ অসন্তুষ্ট হইবে না, বরং আনন্দিত হইবে, অথবা তাঁহার নিজের কোনো মহৎ ইষ্ট সাধিত হইবে, তাহাহইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্বভাব-সুলভ লজ্জা নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া যায়। কোনো অসুখের জন্য যে রমণী আপন গোপন অঙ্গ দেখাইতে একান্ত সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাকে যদি আত্মীয়-স্বজনগণ বুঝাইয়া দেন যে, এরূপ না করিলে তাঁহার অসুখ আদৌ সারিবে না, বরং আরো বেশী কষ্ট পাইতে হইবে, পরন্তু তাঁহার এরূপ ব্যবহারে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইবেন, তখন রমণী আপন হস্ত দিয়া তাঁহার নিম্নাঙ্গের বসন অপসৃত করিয়া দেন,—কোনো দ্বিধাবোধই আর থাকে না।

লজ্জার অন্তর-মূলে একটা ভয়ের ভাব বর্তমান আছে, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ভালবাসার ক্ষেত্রে এ ভয় কেন? ভালবাসার ক্ষেত্রেই যে শুধু লজ্জার বিকাশ হয়, এমন কথা নাই। তাহার উপর কাম-জীবন আরম্ভ হইবার পূর্বে, অথবা উহার প্রথম ভাগে যতটা লজ্জা দেখা যায়, ততটা লজ্জা পরে আর দেখা যায় না। কুমারীরা বা প্রথম বধূরা যতটা লাজুক হয়, বয়স্থা বিবাহিতারা ততটা লাজুক হন্ না; আবার বিধবাদের লজ্জা মানদণ্ডের আরো নিম্নে আসিয়া পৌঁছায়। কারণ কি?...যাহাকে জানি না, যাহাকে চিনি না, অথবা যাহাকে সবে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি ও আংশিক ভাবেও যাহার মনের নাগাল্ পাই নাই, তাহার সম্মুখে গেলে, কি স্ত্রী কি পুরুষ—প্রত্যেকেরই অল্প-বিস্তর লজ্জা বোধ করা স্বাভাবিক। এই লজ্জার একদিকে থাকে—ব্যক্তিত্ববোধজনিত অগভীর গাম্ভীর্য ও আত্মমনোভাব-দমনের প্রয়াস, অন্যদিকে থাকে—একটা অসম্বরণীয় ভয় ও সংশয় *।

লজ্জার মূলে ভয়

হিন্দুঘরের বালিকা বা কিশোরী নববধূর স্বামী-সমক্ষে লজ্জাশীলতার মধ্যে ভয়ের প্রাধান্য সমধিক থাকে। কারণ, তাহারা বিবাহের পূর্ব হইতেই এমন একটা শ্রুতিজ্ঞান লাভ করে বা প্রথম স্বামীসহবাস-কালে প্রায়ই এমন একটা নিদারুণ অভিজ্ঞতা অর্জন করে, যাহা মোটেই স্বামীকে অকপটে শ্রদ্ধা করিতে বা নির্ভয়ে নির্ভর করিতে ইঙ্গিত করে না। রমণীর স্বভাবই হইল—ভয়কে লজ্জার আবরণে ঢাকিয়া রাখা।

সেইজন্য জার্মানীর মনোবৈজ্ঞানিক হোহেনেম্‌জার্ লজ্জাকে একটা দেহমানসিক ব্যাপার-রূপে গণ্য করিয়া, বলিতেছেন,—লজ্জার অবস্থায়

* G. Simmel, PHILOSOPHY OF FASHION, pp. 27-28.

লজ্জার লক্ষণাবলী

মনের একটা খঞ্জতা বা জড়তা উৎপন্ন হয় এবং ঐ জড়তার প্রভাব দেহের কোনো কোনো অংশে উপস্থিত হইয়া, তথায় একটা ক্ষণিক পক্ষাঘাতের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। প্রায় ক্ষেত্রেই লজ্জার পাত্রের সম্মুখে মাথা নত হইয়া পড়ে, বাক্‌যন্ত্র নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়, হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হয়, তাহার চক্ষুর দিকে চক্ষু ফিরানো অসম্ভব হইয়া উঠে। বেশী লজ্জার অবস্থায় মস্তিষ্কের ক্রিয়া-শক্তি লোপ পায়—এমন কি হস্তপদাদি কোনো অঙ্গ সঞ্চালন করাও দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। অন্তঃপ্রকৃতি তখন এই বিপদের মেঘ বিদূরিত করিবার জন্য, নিমেষে উর্ধদিকে—অর্থাৎ মস্তিষ্কের ভিতর চারিদিক্ হইতে প্রচুর রক্তস্রোত প্রেরণ করেন ; কারণ, মস্তিষ্কই হইলেন এই বিরাট্ দেহ-সংসারের প্রত্যক্ষ কর্তা, এবং রক্তই হইল তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার একমাত্র উপাদান। কিন্তু এই রক্ত সবেগে মস্তিষ্কে উঠিতে গিয়া, সমস্ত মুখমণ্ডলকে লালিমায় ভরিয়া ফেলে। এই কপোল-রাগ বা মুখ-রাঙা-হইয়া-উঠা লজ্জার একটি প্রকাণ্ড বাহ্য লক্ষণ।

লজ্জার দৈহিক প্রকাশ প্রধানত মুখমণ্ডলে হয় বলিয়াই জগতের সকল নারীই অল্প-বিস্তর এই স্থানটিকে সমীহ করিয়া চলেন। সরমে অনেক সময় নারী মুখ ঢাকেন, অথচ বুক খুলিয়া ফেলেন। ক্ষেত্র বিশেষে এই কথাটা সিধা অর্থে অথবা অলঙ্কারাত্মক অর্থে প্রয়োগ করা চলে। পর্দা বা ঘোমটার আড়াল হইতে বহু মহিলা কমিশন-জবানবন্দী ও উকীলের জেরার জোরাল উত্তর দিয়াই শুধু আমাদিগকে চমৎকৃত করেন না, পুরুষ বিশেষকে রাগ বা বিরাগের সুসংবদ্ধ বাণী শুনাইয়া দেন অতি

লজ্জার লীলাকেন্দ্র মুখ ও চোখ

সাবলীলভাবে। কোনো এক ইংরাজ দার্শনিকও ঠিক এইরকমই একটা যেন কথা বলিয়াছিলেন, "When the face of a woman is

covered, her heart is laid bare.” রমণের সময় অনেক রসময়ী কিশোরী বা যুবতী মুখ ঢাকেন, চক্ষু মুদ্রিত করেন *। বেশ্যারাও প্রথম প্রথম নব প্রেমিকের সহিত সহবাস-কালে প্রায়শ অঞ্চলাগ্রে মুখ ঢাকিয়া লজ্জাশীলতার অভিনয় করে। ইজিপ্টের বহুস্থলে রমণীরা আপাদমস্তক বোর্‌খায় আবৃত করিয়া পথ চলে। কোনো নূতন লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা জন্মিলে, তাহারা নিম্নাঙ্গের বোর্‌খা যত সহজে উত্তোলন করে, তত সহজে বদনাবরণ উন্মোচন করে না।

মুখের মধ্যে আবার চক্ষুর্দ্বয় ঘনতম লজ্জার আধার। মানুষের সকল প্রলোভন ও হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় চোখের কর্ম-কুশলতায়। আদিম যুগ হইতে এই আজ্‌গুবী ধারণা চলিয়া আসিতেছে যে, চক্ষু মুদ্রিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে (নিদ্রার মতো) আত্মসংবিৎও চলিয়া যায়, পরন্তু সমগ্র দেহ-মন অপরের দৃষ্টির অগোচর হইয়া পড়ে।

উট্‌পাখীদের (ostrich) মধ্যে একটা সহজ প্রবৃত্তি আছে যে, তাহারা শত্রু কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইলে প্রথমত খুব দ্রুত দৌড়ায়; পরে শ্রান্ত হইয়া পড়িলে, হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া, আপনার চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করে—এই ধারণার বশবর্তী হইয়া যে, এতদ্বারা তাহারা শত্রুর নিকট অদৃশ্য হইয়া পড়িল। খরগোসেরও অনেকটা এইরূপ স্বভাব আছে। মানুষের মধ্যে চক্ষু-মুদ্রণের এই তাৎপর্যটি বোধহয় উট্‌পাখী হইতেই বিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে। তাই, শুধু লজ্জায় নহে, ভয়েও মানুষ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ফেলে। নববধূর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলে, সে যে নয়ন-

* রাধা ও কানুর 'পহিল আলাপ' বর্ণনা করিতে গিয়া জ্ঞানদাস একস্থলে বলিতেছেন—“আরত নাহ বিনয় ধেরি বেরি, ধনি মুখ-চান্দে আধ আঁচর দেলি।” ('অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী', পৃষ্ঠা ৪৬, প. ১৫২।) বাৎস্যায়ন তাঁহার “কামসূত্রের” একস্থলে বলিতেছেন, “তত্রেতরস্যা ব্রীড়া নিমীলনং চ।” প্রথম সমাগমে কন্যায়াশ্চ। (কা. সাম্প্রয়োগিকাধিকরণম্, ৮ম অ:, ৫)

কোরক মুদ্রিত করে, তাহা কতকটা কুলাচরিত অভ্যাস হইলেও লজ্জা ও ভয়জনিত জন্মজন্মার্জিত সংস্কার। ছাদ্‌নাতলায় পীড়ির উপর বসাইয়া বরবধূর শুভদৃষ্টির মৌলিক উদ্দেশ্যই হইল—এখন হইতে তাহাদের মধ্যে এমন সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, যাহাতে লজ্জা ও ভয়ের তিলমাত্র অবকাশ নাই।

কি নারী কি পুরুষ উভয়েরই সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ লীলাস্থল—তাহাদের মুখমণ্ডল। 'পহেলা দর্শনডারি, পিছে গুণ বিচারি'—কথাটা প্রেমের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সারবান সত্য। আগে রূপ, পরে গুণ ; এবং এই রূপের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় মুখে। রমণীর অবগুণ্ঠনের সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় এইখানেই। প্রথমত, সুন্দরী নারী অবগুণ্ঠন-দ্বারা বদনমণ্ডল আবৃত করিয়া, অনভিপ্রেত কামুকের লালসার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, কুশ্রী রমণী এতদ্বারা পুরুষের ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টি বা সবিদ্রূপ ইঙ্গিতের হাত হইতে নিরাপদে থাকিতে পারে। তৃতীয়ত, অবগুণ্ঠনের আড়ালে থাকিয়া তাহারা অসন্দিগ্ধ কৌতূহলে সকল পুরুষকে সন্দর্শন করিতে পারে ; [এবং মনের মতো লোক পাইলে কেহ কেহ ঈষৎ ঘোমটা তুলিয়া নয়ন-বাণও হানিতে পারে]। চতুর্থত, সমগ্র পুরুষ-সমাজের কৌতূহলপূর্ণ সন্ধিৎসু দৃষ্টি আপনার প্রতি আকর্ষণ করিয়া, মনে মনে গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে।

অবগুণ্ঠনের সার্থকতা

কোনো যুবক পাশের বাড়ীর এক তরুণীর প্রেমে পড়িয়াছে। কিন্তু লজ্জার জন্যই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে না—মেয়েটিও তাহাকে ভালবাসে কি না! দূর হইতে দেখে আর ভালবাসে, মনের আকাঙ্ক্ষা মনেই পুষিয়া রাখে ; অতৃপ্তির মধ্যেও তবু একটা মধুর আশ্বস্তি পায়।

লজ্জার মূলে শ্রদ্ধাভাব

তরুণীদের বাড়ীতে কোনো বিবাহ উপলক্ষে যুবকটি সহায়তা করিতে গিয়াছিল। কাযকর্মের অবসরে তরুণীর একটি ছোট বোন হঠাৎ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "আপনি কি দিদিকে ভালবাসেন?" যুবকটি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। কেন বলুন তো ?...দয়িতের ব্যক্তিত্বকে কোন ব্যক্তি যখন আপন ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা উচ্চতর দেখেন—তখন তাহার সহিত একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা ব্যক্ত হইতে শুনিয়া, আপনার হীন ব্যক্তিত্বের অনুভূতিতে তিনি লজ্জিত হইয়া পড়েন।

অনেকটা এই কারণেই একটা ছেলেমানুষ একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইতে লজ্জা বোধ করে; একজন সাধারণ মানুষ কোন প্রসিদ্ধ মনীষীর সান্নিধ্য-লাভ করিয়া একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। আবার যখন আমাদের ব্যক্তিত্বের সহিত অন্য কোনো হীনতর ব্যক্তি, বাক্য বা বস্তুর ঘনিষ্ঠতার চিন্তায় মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তখনো আমরা লজ্জিত হইয়া পড়ি। কোনো ভদ্রলোকের সম্মুখে বা ভদ্রসমাজের মধ্যে কাহাকেও "বেশ্যাবাড়ী যাও কিনা" জিজ্ঞাসা করিলে, কথাটা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, সে লজ্জায় মরিয়া যায়। ভদ্র স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে লোক-লোচনের সম্মুখে কোনো যৌন-বিষয়ক চিন্তা করাও লজ্জার বিষয়, কারণ ঐ চিন্তা সহজেই যৌন-অনুভূতি বা আবেগে পরিণত হইতে ও তাহার চিহ্ন চোখে-মুখে ফুটিয়া উঠিতে পারে।...

লজ্জা-প্রকাশকে অনেকটা সংযত করে অন্ধকারের প্রভাব—এ কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। পুরুষ যে যৌনানন্দ উজ্জ্বল আলোকে উপভোগ করিতে ব্যগ্র হন্, নারী সেই আনন্দের নিবিড় আস্বাদ পান্ অন্ধকারের স্নিগ্ধ পক্ষপুটের মধ্যে। এই জন্যই প্রভাতে বা দ্বিপ্রহরে প্রেমক্রীড়ায় সম্মতি

লজ্জা ও অন্ধকার

দিতে স্ত্রীলোকগণ ঘোর আপত্তি করেন *। প্রকাশ্য দিবালোকে জন্তু বিশেষের একটা কুকীর্তি দেখিতে নারী লজ্জায় মরিয়া যান্; কিন্তু ঘোম্টার মধ্য দিয়া বা একটা অন্ধকার কোণে একান্তে বসিয়া তাহা সকৌতুক আগ্রহে দেখিয়া লইতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেন না। সমঝ্-দার বালিকারা একটা কুৎসিত ব্যাপার নগ্নচক্ষে দেখিতে পাইয়া লজ্জা পায় বটে; কিন্তু করাঙ্গুলির ঈষৎ ফাঁক্ দিয়া সে দৃশ্য উপভোগ করিতে পশ্চাৎপদ হয় না।…

আর একটি কথা পরিশেষে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, কিশোর বয়সে যৌনবোধ সংক্রান্ত যে লজ্জা, তাহা মেয়েদেরই একচেটিয়া নহে, পুরুষও তাহার অংশীদার। তবে এই লজ্জা মেয়েদের আসে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে এবং বেশী পরিমাণে।…আবার পুরুষের নিকট অতিরিক্ত লজ্জাশীলতার স্বাভাবিক সুন্দর অভিনয় যুবতীরা যেমন করিতে পারেন, এমনটি আর কোন বয়সের স্ত্রী বা পুরুষ করিতে পারেন কি না সন্দেহ। নিজ সমবয়সী বন্ধু-মহলে স্ত্রীলোক যতখানি কায়মনোবাক্যে ব্রীড়াভাব বিসর্জন দিতে পারে, পুরুষ ততখানি পারে না। বর্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষা রমণীর সঙ্কোচভাব অনেকটা ঘুচাইয়া দিয়াছে বটে; কিন্তু তাহার জৈবিক লজ্জার বাঁধ একেবারে ভাঙ্গিয়া দিতে পারে নাই, কখনো পারিবে কিনা সন্দেহ; কারণ সে একান্তভাবে জানে যে, লজ্জা

লজ্জার কাল ও পাত্র

* Theocritus একস্থলে বলিয়াছেন, "Venus loveth the dark; but with light doth come the necessity of constraint." "লাতিন জগতের প্রাচীন লালসাচটুল কবি মার্শ্যাল (Epigram XI) তাঁহার স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া গাহিয়া গিয়াছেন—"Tu tenebris gaudes': me ladere teste lucarna, Et iuvat admissa rumpere luce latus."—অর্থাৎ অন্ধকারে তুমি আনন্দ পাও; আমি কিন্তু প্রজ্বলিত দীপশিখাকে সাক্ষ্য রাখিয়া ও তাহার আলোককে আমন্ত্রিত করিয়া, তোমার দেহোপভোগ করিতে ভালবাসি।

একধারে তাহার সৌন্দর্য, আকর্ষণ ও অস্ত্র। যাহা হউক, এই অধ্যায়ের ইহাই চুম্বক সত্য যে, নারীর সর্বাপেক্ষা প্রেয় ও প্রলোভনের স্থানটিতে ঘৃণা উদ্রেকের সম্ভাবনা নিবদ্ধ রাখিয়াই ঈশ্বর তাহাকে এত রহস্যময়ী, ছলনাময়ী ও মানময়ী করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন !

দ্বিতীয় প্রপাঠ

যৌন-বোধের ক্রমবিকাশ

নারীর যৌন-জীবনের গোড়াকার সামান্য কয়েকটি কথা এইবার বলিব। পুরুষ-প্রসঙ্গে যে সকল মূল তথ্য উদ্‌ঘাটিত করা হইয়াছে, সেগুলি নারীর ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য; বিশেষ ভাবে তাহার প্রকৃতিগত যৌননীতি বা আকর্ষণের ক্রমবিবর্তন—সেই আত্মকাম, সমকাম, বিষমকাম!

শৈশব ও বাল্য

নারীর শৈশব ও নরের শৈশবে পার্থক্য থাকে খুব নগণ্য। বাল্যের একটা বিশেষত্ব সম্বন্ধে কেবল দুই এক ছত্র লেখা প্রয়োজন মনে করি। সংসার-মঞ্চের কোন্ স্থানটি জুড়িয়া কোন্ বিশিষ্ট ভূমিকায় তাঁহাদিগকে অভিনয় করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে একটা স্থূল ধারণা—স্বামী-লাভ ও সন্তান-জননের একটা অন্ধ সংস্কার, স্ত্রীলোকের মনে অতি অল্প বয়স হইতেই যে বদ্ধমূল থাকে,—তাহা তাহাদের বাল্য ক্রীড়ার ধরণ-ধারণ দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়।...প্রায়ই একজনের পুতুল ছেলে হয়, সঙ্গিনীর পুতুল মেয়ে হয়। তাহাদিগকে বাটিতে করিয়া দুধ খাওয়ায়, বিছানায় শোওয়াইয়া রাখে, ঘুম পাড়ায়, কোলে করিয়া আদর করে। কিছুদিন পরে তাহাদের পরস্পরের বিবাহ দেয়, তত্ত্ব পাঠায়; মেয়ে-জামাই আদর করিবার ধুমধাম, তারপর নাতি-নাতিনী লইয়া সুখে ঘর-ঘরকর্ণা!...অথচ কি বিশিষ্ট কার্য-প্রণালীর দ্বারা ছেলেপুলের প্রজনন হয় এ চিন্তা কখনো তাঁহাদের মনে ঠাঁই পায় না; অর্থাৎ শৈশবে তাহাদের মনে মাতৃভাবের একটা ক্ষীণ অঙ্কুর সংগুপ্ত থাকিলেও সাধারণত আসঙ্গলিপ্সার কণামাত্র উদয় হয় না।

স্ত্রীলোকের বাল্যকালের শেষসীমা বার বৎসর বয়স পর্যন্ত ; তারপর কৈশোর। সেকালে অর্থাৎ মধ্যযুগে দশ হইতে বার বৎসর বয়স রমণীর বিবাহের মুখ্যকাল বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু আদ্যঋতু না হইলে সাধারণত মেয়ে শ্বশুর-বাড়ীতে আসিত না। মেয়ে আদ্যঋতু দর্শন করিবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে যৌনরসজ্ঞা বা সহবাস-সমর্থা হইয়াছে,—এই ধারণা বহুকাল হইতেই প্রায় সকল দেশের মানুষের মনে নীড় রচনা করিয়াছে। ইহা কতকাংশে সত্য বটে ; কিন্তু ইহার অল্পবিস্তর ব্যতিক্রম অনেক দেখা যায়। কোন বালিকা হয়ত ঋতুদর্শনের পূর্বেই পুরুষসঙ্গ-লাভের সুযোগ পাইয়া উহার রসাস্বাদে সুন্দর পটুতা অর্জন করে ; আবার কেহ কেহ ঋতুদর্শনের পর সহবাসের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দুই তিন বৎসর পর্যন্ত উহার বিশিষ্ট তৃপ্তি সম্বন্ধে আদৌ সজাগ হয় না।

ইহা বিংশ শতাব্দীর যুগান্তরকারী আবিষ্কার যে, পুরুষের মত নারীও সমস্ত বাল্যকালটি, এমন কি কৈশোরের মধ্যস্থল পর্যন্ত সচরাচর সমকামী থাকে ; সমবয়সী বালিকার সহিতই তাহার যাহা কিছু প্রেমের কারবার। বাল্যকালে তাহারা বালকদিগকে ঠিক্ ঘৃণা করে না সত্য, কিন্তু তাহাদের সঙ্গলাভ কখনই কাম্য বলিয়া মনে করে না। কৈশোরের-প্রারম্ভে পুরুষ সম্বন্ধে তাহারা একটু অনুসন্ধিৎসু হয় বটে ; কিন্তু স্পর্শনেচ্ছা বা উদ্বেলাবস্থা বলিয়া কিছু ক্বচিৎ সংঘটিত হয়। সেইজন্য এই সময় নববিবাহিতা বালা যদি স্বামীর প্রতি তেমন অনুরাগিনী না হয়, তাহাহইলে তাহাতে দোষ দেওয়া যায় না।

বাল্যকালে বিবাহিত দুই চারিটি দম্পতির জীবন-নাট্যের প্রথমাঙ্ক আমরা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। বার-চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত প্রত্যেকে প্রত্যেককে এড়াইয়া চলিয়াছে ; বালক-স্বামী সময়বিশেষে প্রহার করিয়াছে, বালিকা স্ত্রী কাঁদিয়াছে বা গালি পাড়িয়াছে ; সে বন্ধুভাবে

তাহার খেলার সাথীও খুব কমই হইয়াছে। কৈশোরের প্রথম বা শেষ হইতে তাহাদের যেন নূতন করিয়া সত্যকার বিবাহ হইয়াছে; উভয়ের মধ্যেই ভাবান্তর দেখা দিয়াছে; উভয়েই নিজ নিজ অতীত ভুলিয়া পরস্পরকে কাছে টানিয়া আনিয়াছে।···আমাদের দেশে আজকাল দশ হইতে বার বৎসর বয়স্কা অবিবাহিতা মেয়েরা স্বপরিবারের ভিতর ব্যতীত অন্য কোন বালক বা কিশোরের সহিত খেলিবার বা মিশিবার সুযোগ পায় না; পাইলেও তাহাদের না আসে মনোবিকার, না জন্মে ভালবাসা।

কৈশোর

তারপর বালিকা-বয়স অতিক্রম করিয়া, যখন তাহারা দ্রুতগতিতে বাড়িতে থাকে, তখন তাহাদের দৈহিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক রাজ্যেও ঘোরতর বিপ্লবের সূচনা করে। কৈশোরের উন্মেষে বক্ষ মুকুলিত হইয়া উঠে, জনন-যন্ত্রে অতি সূক্ষ্ম রোমরাজী উদ্গত হইতে থাকে, গোপনাঙ্গের বাহ্যাভ্যন্তর একটু একটু করিয়া রূপান্তর হইতে থাকে। অবশেষে আগুঋতু দেখা দেয়। বুকের ঐ অস্বাভাবিকতাটুকু (?) ঢাকিবার চেষ্টা তাহার সজাগ হইয়া উঠে, জনন-যন্ত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভের জন্য তাহার মন ব্যগ্র হয়, যৌন-জীবন-ঘটিত গল্প-আলোচনা শুনিতে তাহার কৌতূহল বাড়ে, পিতামাতার নিষেধ-বাণীর প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়াও যুবকদিগকে দেখিতে, তাহাদের কথা শুনিতে কিংবা তাহাদের সহিত একটু আলাপ বা কলহ করিতেও ভাল লাগে; এবং অবসর মতো ঋতু শোণিতের আকস্মিক আবির্ভাব সম্বন্ধীয় চিন্তায় তাহার মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে।

প্রেম ও প্রেমিকের আন্তরিক ও বাহ্যিক লক্ষণগুলি এমন পরিপূর্ণভাবে অধ্যয়ন ও নিখুঁতভাবে বিচিত্রিত করিতে বৈষ্ণব কবিদের মতো মহাজন পৃথিবীতে আর কেহ ছিল না—এখনো নাই। বিদ্যাপতি মাত্র দশটি

পংক্তিতে বালিকার প্রাথমিক যৌনবোধের বাহিরের লক্ষণগুলির কী সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, দেখুন !—

ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোন অনুসরই।
ক্ষণে ক্ষণে বসন ধূলি তনু ভরই।
ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছট হাস।
ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে গহু বাস।
চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে, ক্ষণে চলু মন্দ।
মনমথ-পাঠ পহিল অনুবন্ধ।
হৃদয় মুকুলিত হেরি হেরি থোর।
ক্ষণে আঁচল দেই ক্ষণে হৈয়ে ভোর।
বালা শৈশব তারুণ ভেট।
লখই না পারিয়ে জেঠ কনেঠ॥

সরলার্থ।—ক্ষণে ক্ষণে নয়নদ্বয় কোণ্ অনুসরণ করে অর্থাৎ অপাঙ্গ-দৃষ্টি হয়। মুহুর্মুহু অঞ্চলাগ্র ধূলায় লুটাইয়া পড়ে অথবা নিজে ধূলার উপর বসিয়া পড়ে। কথনো দন্ত বিকশিত করিয়া উচ্চরোলে হাস্য করে, কথনো বা হাসিবার সময় কাপড়ে মুখ ঢাকে। কথনো চমকিয়া দ্রুত চলে, কথনো বা গজেন্দ্র-গমনে। মন্মথ-পাঠের প্রথম পড়া সুরু হইয়াছে। মুকুলিত স্তন মাঝে মাঝে আড়্নয়নে দেখিয়া আঁচল-ঢাকা দেয়, কথনো হয়ত ভুল হইয়া যায়। বালিকা শৈশব ও যৌবনের সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই—সে জ্যেষ্ঠা (রমণের উপযুক্ত) হইয়াছে, কি এখনো কনিষ্ঠা (নাবালিকা) আছে।...

গড়্পড়্তা আমাদের দেশের বালিকাগণ সাড়ে বারো বৎসর বয়সে আদ্যঋতু দর্শন করে; এবং মোটামুটি পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রতি আটাশ দিন অন্তর ঋতুমতী হইতে থাকে। আট বৎসরে ঋতু দর্শন

আদ্যঋতু

করিয়াছে এবং আটাশ বৎসর পর্যন্ত ঋতু দর্শন করে নাই, এমন দুইটি কেস্ আমরা জানি। এগারো বৎসর বয়সে আদ্যঋতুমতী হইয়াছে এবং বারো বৎসরে সন্তানের জননী হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত অবশ্য আমাদের দেশে খুঁজিলে বোধ হয় প্রতি গ্রামেই একটি করিয়া পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বারো হইতে তের বৎসর বৎসর বয়সের মধ্যে বাঙ্গালী—তথা ভারতবর্ষীয় মেয়েরা আদ্যঋতু দর্শন করে, ইহাই সাধারণ নিয়ম।

অল্প বয়সে যৌনবিষয়ক জ্ঞানলাভ, দ্রুত দৈহিক পরিপুষ্টি, কদর্য বস্তির মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া বাস, আলস্যময় বিলাসবাহুল্যপূর্ণ জীবন, কঠোর শারীরিক পরিশ্রম, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, রক্তামাশয়, কালাজ্বর প্রভৃতি ব্যাধিতে দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী থাকা···ইত্যাদি কারণে আদ্যঋতু আগাইয়া আসিতে বা পিছাইয়া যাইতে পারে। মোট্ কথা, চতুর্দশ বৎসর বয়সের সীমাপ্রান্তে উপনীত হইয়া ঋতুস্রাবের সহিত পরিচিত হয় নাই, বাঙ্গালী ঘরে এরূপ কন্যা সহস্রের মধ্যে হয়ত একটির বেশী পাওয়া যাইবে না ; আবার বারো বৎসর বয়সের পূর্বে ঋতুস্রাব ঘটিয়াছে, এরূপ বালিকা সহস্রের মধ্যে একটিও পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ।

আদ্যঋতুর ক্রিয়াতত্ত্ব ও মুখ্য কারণসমূহ এখানে বিবৃত করিবার পরিসর হইবে না। মাত্র এইটুকু এখানে বলিয়া গেলেই বোধহয় যথেষ্ট হইবে যে, আদ্যঋতু সকল দেশের সকল মণ্ডলের নারীদিগের মধ্যে আসিয়াছে বাল্যের শেষ অথবা কৈশোরের প্রথমভাগে, এবং আসিয়াই কৈশোর-সুলভ মানসিক বিপর্যয়ের পরিসূচনা করিয়াছে। আদ্যঋতু দেখা গেলে বালিকা যেমন একদিকে বুঝিতে পারে যে, স্বপ্নরহস্যভরা একটা নবীন জীবনের ঘটপল্লবভূষিত দেউল-দ্বারে সে সমুপস্থিত ; অন্যদিকে তেমনি

জ্ঞানী আত্মীয়স্বজন বুঝিতে পারেন যে, তাহার কৈশোর আগত, এখন তাহার মন-তটিনীতে নূতন আবেগ, আশা ও আকাঙ্ক্ষার যে তরঙ্গমালা উত্থিত হইয়াছে, তাহা তুফানে পরিণত হইতে না হইতেই তাহার প্রশমন-প্রচেষ্টা করিতে হইবে। আদ্যঋতুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই যে নবীনা কিশোরী পুরুষ-সহবাসের অথবা গর্ভধারণের সম্পূর্ণ উপযুক্তা হইয়াছে,—এরূপ বিবেচনা শরীরশাস্ত্র-সম্মত নহে। তবে এইটুকু মাত্র সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, এই সময়ে সে অভিজ্ঞা অভিভাবিকার হস্তে সর্বপ্রকার যৌনবিষয়ক জ্ঞানলাভের উপযুক্ত হইয়াছে, এবং কয়েকটি আর্তবস্রাবের পর ক্রমশ অতি সন্তর্পণে হাতে-কলমে সহবাসের সহিত পরিচয় লাভ করিতে পারে।

আদ্যঋতু দেখা গেলেই কুমারীর মনে একটা ভয়, সংশয়, লজ্জা, হতাশা, সঙ্কোচ ও বিরক্তির ভাব আসে ; সে নিজেকে মহাপরাধী বলিয়া মনে করে। এমন কি, নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সম্মুখে চলা-ফিরা করিতে তাহার বাধ-বাধ ঠেকে। সমবয়সী বালিকার সহিত তাহার মেলামেশা ঘনীভূত হইয়া উঠে এবং দুই একটি পরম সুহৃদের কাছে বারংবার তাহার এই নূতন দেহধর্মের আবির্ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কথঞ্চিৎ তৃপ্তি বোধ করে। যে সকল বালিকা ইতঃপূর্বেই আর্তবস্রাবের সহিত পরিচিত হইয়াছে, অথবা যাহারা স্বামী-সঙ্গলাভ করিয়াছে, তাহারা নিজেদের ধারণানুযায়ী এক-একটা ব্যাখ্যা ওই নবঋতুমতীকে নিরালে শুনাইয়া দেয়। কিন্তু ইহাতেই সে পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হইতে পারে না।

আদ্যঋতুতে নবভাবের সূচনা

যাহাহউক, ধীরে ধীরে তাহার ভয়-সংশয়-সরমের এই অভূতপূর্ব ভাবাবেগ হ্রাস পায় এবং ঋতুস্রাবকে সে আর পূর্বের ন্যায় ততটা

পরিণতিশীল কৈশোরের মনস্তত্ত্ব

গ্লানির চক্ষে দেখে না। এইরূপভাবে এক-বৎসর বা দেড় বৎসর অতীত হইলে পর, কুমারী কিশোরীর মনের মধ্যে আবার এক অপরূপ আন্দোলন জাগে। এই সময় একটা অনির্বচনীয় পুলক ও আবেগপ্রবণতা, অভিলাষ ও অধীরতা, ইচ্ছা ও আশঙ্কা, বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাব, আশা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রেম ও ঘৃণা, গর্ব ও অনুশোচনা, ঘাতকাতরতা ও কল্পনাভূয়িষ্ঠতা প্রভৃতির দ্বারা কিশোরীর জীবন-দোলা অবিরাম দোলে। সাংসারিক শ্রমসাধ্য কর্ম, অধ্যয়ন ও দীর্ঘকাল রোগভোগের মধ্যেও এই আবেগগুলি অবসর মত আসিয়া তাহার মনের দ্বারে সজোরে ধাক্কা দিতে ছাড়ে না।

সমকাম তাহার হৃদয়ে পূর্ণ আধিপত্য করিলেও তাহার হৃদয়-পটে পুরুষের নূতন রূপের প্রতিচ্ছবি এক একটু করিয়া প্রতিফলিত হইতে থাকে। তাহার জীবন-যবনিকার অন্তরালে এই ঘোরতর ভাববিশৃঙ্খলা যে পুরুষের সহিত মিলন-কাতরতার একটা নিগূঢ় অপ্রত্যক্ষ ইঙ্গিত, তাহা সে একটু একটু করিয়া উপলব্ধি করে। কিছুদিন পরেই সে এক বা একাধিক পুরুষের দর্শন ও স্পর্শনাকাঙ্ক্ষী হয়; সংগোপনে দূর হইতে তাহাদিগকে ভালবাসে। ইহার মধ্যে অবশ্য আত্মদানের একটা অস্পষ্ট ইচ্ছা থাকিলেও রমণেচ্ছার স্থান আদৌ থাকে না; বড় জোর আত্মানন্দের একটা ক্ষীণ আবেগ কোন কোন ক্ষেত্রে উৎসারিত হইতে পারে। মনোমত যুবকের সহিত সুনিবিড় পরিচয়ে সময়ে সময়ে তাহার মানসিক উদ্বেলাবস্থা আসাও বিচিত্র নহে। তের, সাড়ে তের হইতে পনের বৎসর পর্যন্ত এই ভাবরাশি দ্রুত পরিণতির পথে অগ্রসর হয়। সুতরাং চৌদ্দ-পনের বৎসর বয়স নারীর পক্ষে পুরুষের সহিত প্রত্যক্ষ ও

পাকাপাকিভাবে মিলন-সাধনের (অর্থাৎ বিবাহের) শ্রেষ্ঠকাল বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

পনের বৎসর পর্যন্ত বালিকাদিগের কৈশোর; তারপরই যৌবনারম্ভ। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি শিক্ষিত সমাজে বালিকাদিগের বিবাহের বয়স ক্রমশ বাড়িয়া যাইতেছে; ইহার ফলে একদিকে অকালবৈধব্যের সম্ভাবনা যেমন কমিয়া যাইতেছে, অন্যদিকে তেমনি পরোক্ষে তাহাদের বিপথে পরিচালিত হইবার অথবা যুবকদিগের অনুরূপ বিবিধ কদভ্যাসের মোহে আকৃষ্ট হইবার সুবিধা করিয়া দেওয়া হইতেছে। তবে সুখের বিষয়, পল্লীগ্রামে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত সমাজের মধ্যে এখনো শতকরা পঁচানব্বইটি বালিকা বারো হইতে পনেরর মধ্যে বিবাহিতা হয়; ফলে এই সকল বালিকা স্কুল-কলেজের উচ্চ বিদ্যালাভে বঞ্চিতা থাকিলেও, তাহাদিগের তথাকথিতা শিক্ষিতা ভগিনী অপেক্ষা বিবাহিত জীবনে ইহারা অধিকতর তৃপ্ত, তুষ্ট, স্থৈর্যশালিনী হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে। সর্বোপরি তাহারা যে যথাসময়ে বিবাহ-দ্বারা মহত্তর চরিত্রের অধিকারিণী হইবার বৃহত্তর সুযোগ লাভ করে—তাহা সুনিশ্চিত। অবশ্য উভয় শ্রেণীর মধ্যে—লোকাচারসম্মত সংজ্ঞানুযায়ী বিশিষ্ট ব্যতিক্রমের বহু দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু যে সকল কারণে বা পরিস্থিতির মধ্যে উহা সুসাধ্য হয়, তাহার বিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ বৎসর বয়সের কিশোরীর জীবনসত্তায় একদিকে যেমন সমজাতীয় প্রেমের পূর্ণ অধিকার থাকে, তেমনি অন্যদিকে বিষম জাতীয় প্রেম আসিয়া তাহা রাহুর মত ধীরে ধীরে গ্রাস করিতে থাকে। পনের বৎসরের শেষে সাধারণত পূর্ণগ্রাস হইয়া যায়। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে তাহারা পুরুষ-সহবাসের

কুমারী কিশোরীর প্রেম

সুযোগ না পাইলে সমজাতীয় প্রেম আবার রাহুমুক্ত হইয়া পড়িতে পারে ; এবং পরে পুরুষের প্রেমভাগিনী হইয়াও বা তাহাকে ভালবাসিয়াও, সে প্রথম জীবনের এই সুপ্রতিষ্ঠিত প্রেমকে একেবারে ভুলিতে পারে না। যাহাহউক, কুমারী কিশোরী মনে মনে যে এক বা একাধিক পুরুষকে তাহার প্রেমের আদর্শরূপে নিভৃতে পূজা করে, সে যে সকল সময়ে সুরূপ যুবকই হইবে, এমন কিছু কথা নাই ; কারণ পুর্বেই বলিয়াছি যে, এই প্রেমে তথোকথিত 'কামগন্ধ' প্রায় থাকে না, থাকিলেও তাহা নিতান্ত অনির্দেশ্য ও ব্যাপকভাবে থাকে। ইহা সাধারণত সে বড় কাহারও নিকট ব্যক্তও করে না ; এমন কি, প্রেমভাজনও তাহা ঘুণাক্ষরে টের্ পান্ না।

এই প্রেমের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা অনেকখানি স্থান জুড়িয়া থাকে ; ধ্যান, কল্পনা, স্বপ্নজড়িমা দিয়া মণ্ডিত থাকে সেই কিশোরীর পরমারাধ্য বিগ্রহ। কিন্তু ক্রমশ দেখিতে দেখিতে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিগ্রহকে নিজস্ব করিবার, নিকটতর করিবার, সর্বইন্দ্রিয়-দ্বারা ভোগ করিবার একটা স্পৃহা বলবতী হওয়া অসম্ভব নহে। বলা বাহুল্য, এই প্রথম প্রেমের পরিসর খুব বেশী হইলেও গভীরত্ব অতি অল্প। সেইজন্য অন্য কাহারো সহিত বালিকার বিবাহ হইয়া গেলে ও এই বিবাহ সুখাবহ প্রমাণিত হইলে, কৈশোরের সেই আদ্য প্রেমের কথা তাহার আর স্মরণপথে সজীব থাকে না ; ক্বচিৎ জাগ্রত হইলেও সে তাহার শৈশবের পুতুল-খেলার মতোই সেই স্মৃতিকে সহাস্যে উপেক্ষা করে।

অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের কিশোরী বা যুবতী ছাত্রীগণ মনে মনে অনেক সময় বর্ষীয়সী শিক্ষয়িত্রীকেই শুধু ভালবাসে না, শিক্ষক বা অধ্যাপকেরও আরাধনা করে। সেই শিক্ষক পৌঢ় হইলেও ক্ষতি নাই, তিনি নিখুঁত রূপবান না হইলেও আপত্তি নাই।

তাঁহার গুণাবলীই এই সকল নীরব পূজারিণীদের সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসে। তাঁহার সহৃদয় ব্যবহার, তাঁহার মধুর উপদেশ, তাঁহার শিক্ষাদানের ঐকান্তিকতা, জ্ঞানের মধ্য দিয়া নিজেকে পরিব্যক্ত করিবার নিত্য আগ্রহ—এমন কি, তাঁহার সাময়িক ভর্ৎসনাও ছাত্রীদের নিকট অনেক সময় হৃদ্য ও কাম্য বলিয়া প্রতীত হয়। একান্তে দিনের পর দিন উভয়ের 'চোখোচোখী মুখোমুখী' সাক্ষাৎকারের সুযোগ না ঘটিলে, কখনো কোন শিক্ষকই হাবেভাবেও বুঝিতে পারেন না যে, ছাত্রীটি নিভৃতশয্যায় শুইয়া তামসী নিশীথের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তাঁহাকেই নায়ক করিয়া এক অভিরাম রামধনু রঙের চিত্রনাট্য রচনা করিয়া চলিয়াছে *।

কিশোরীর যৌনবোধ অধ্যয়ন-প্রসঙ্গে আমাদিগকে একটি কথা কোনমতেই বিস্মরণী-সমুদ্রে ডুবাইয়া দিলে চলিবে না যে, কোন কিশোরীই আদ্যঋতু বা প্রথম দুই-চারিটি ঋতু-দর্শনের পরই পুরুষ-সহবাসের জন্য ব্যাকুল হয় না,—স্বামী অথবা অন্য কোন পুরুষকেই ভালবাসার মত ভালবাসিতে পারে না। অন্তত দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ চান্দ্রমাস অতিক্রম করিয়া না গেলে অধিকাংশ কিশোরীই যেমন একদিকে ঋতুস্রাবের সার্থকতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয় না বা উহার সহিত নিজের মনোবৃত্তিকে খাপ্ খাওয়াইতে পারে না, তেমনি অন্যদিকে পুরুষের প্রতিও একটা

প্রথম কৈশোরে রতিবিতৃষ্ণা

* "School girls dream of their gray-haired teachers, whom they adore in a manner suggesting more than educational interest. Their Romeo in baggy trousers may or may not know it. But unwittingly, or unwillingly, he is the hero of a plot that would give his steadfast consort sleepless nights should she guess the truth. Love is blind. "Puppy love" is more than that. It is deaf and dumb."—J. Tenenbaum, OP. CIT., p. 32.

সত্যকার আকর্ষণ বা যৌনক্ষুধার কতকটা নির্বচনীয় বিকাশ অনুভব করিতে পারে না।

সাড়ে তের বা চৌদ্দ বৎসর বয়সের পূর্বে যাহারা যৌনসম্মিলনের সম্মুখীন্ হয়, তাহারা পারতপক্ষে উহাতে অসম্মতিই প্রকাশ করে। বাধা দেয়, নহে মনে মনে বিরক্তি বোধ করে; তৃপ্তিবোধ বলিয়া কোন জ্ঞানই তাহার সম্যক্ জন্মে না। তাহার উপর, আদ্যঋতুর পর কয়েক মাস পর্যন্ত তাহারা অনেকেই সহবাসে স্থানীয় বেদনা অনুভব করে। প্রথম কৈশোরে ভগনালী-মধ্যস্থ "বার্থোলিন্ গ্রন্থিদ্বয়" রীতিমত সক্রিয় হইয়া যথোচিত রসনিষেক করে না; 'চরমানন্দ' (orgasm) বলিয়া সহবাসের পরমতৃপ্তিও তাহাদের নিকট অজ্ঞাত থাকে।

সূতাকৃমি, শ্বেতপ্রদর (leucorrhoea), খোসপাঁচড়া, চুল্‌কানি, দদ্রু আদি উপসর্গ নিবন্ধন যোনিপ্রদেশে কণ্ডূয়নেচ্ছা জন্মিতে পারে; এই কণ্ডূয়নেচ্ছার বশবর্তী হইয়া কোন কোন নবীনা কিশোরী হয়ত সহবাসে সম্মতি দিতে পারে। অথবা বয়স্কা সঙ্গীনীদের নিকট সহবাস-সুখ সম্বন্ধে ক্রমাগত নানা মনোহর বর্ণনা শ্রবণ করিয়া, নতুবা আত্মীয়-স্বজনের সম্ভোগ-দৃশ্য পুনঃপুন অবলোকন করিবার ফলে, কোন কোন অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা হয়ত সহবাসে উদ্যোগী হইতে পারে; কিন্তু ইহাকে স্বাভাবিক নিয়মের আমলে আনা কোনমতেই চলিবে না। সঙ্গমে পূর্ণ সুখবোধ ও সত্যকার চরমানন্দ-লাভ আমাদের দেশের গড়্‌পড়তা কোন নারীই পনের ষোলো বৎসর বয়সের (অথবা প্রথম শোণিতাগমের মোটামুটি তিন বৎসর) পূর্বে করিতে পারে না; এ বিষয়ে আমরা একপ্রকার স্থিরসিদ্ধান্ত। এতাবৎকাল অধিকাংশ বাঙ্গালী রমণীই এই বয়ঃ-সন্নিধানে আসিয়া প্রথম সন্তানের জননী হইয়াছেন; বহু স্বামী বোধহয় স্মরণ করিতে পারিবেন,

ইহার অব্যবহিত পর হইতে তাঁহাদের পত্নীরা অকস্মাৎ রতিলীলায় সুন্দর উৎসাহী ও উত্তরদায়িনী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

আর এক কথা। রমণে পূর্ণ সুখবোধ না হওয়া পর্যন্ত রমণীর যে গর্ভসঞ্চার হয় না—এ ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। বলাৎকারের ফলে অনেক স্থলে গর্ভোৎপত্তি হইতে দেখা গিয়াছে। বরিশাল জেলার বাল-বিধবা অরুণবালা কয়েক বৎসর পূর্বে মুসলমান গুণ্ডাদল কর্তৃক অপহৃতা হইয়া, ক্রমাগত কয়েকদিন ধরিয়া নৃশংসভাবে ধর্ষিতা হওয়ারই ফলেই গর্ভবতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনুরূপ অবস্থায় আর একটি কুমারীও সম্প্রতি গর্ভিনী হইয়া, বহুক্লেশে হাসপাতালে এক মৃতশিশু প্রসব করিয়াছে।

তৃতীয় প্রপাঠ

প্রথম পুরুষ-সম্মিলন

স্ত্রী-পুরুষের যৌন-জীবনের মানসিক প্রগতি ও বৈশিষ্ট সম্বন্ধেই এই পুস্তকে প্রধানত আলোচনা করা হইতেছে; উভয়ের দৈহিক বৈশিষ্ট বা ইন্দ্রিয়াদির সংস্থান সম্বন্ধে অথবা আদর্শ যৌন-জীবন কিরূপ হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে কোন উপদেশ দেওয়া এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। তবে মানুষের দেহ ও মনের মধ্যে এরূপ নিকট-সম্পর্ক যে, একটার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে আর একটাকে একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। সেইজন্য মনোরাজ্যের বর্ণনা করিতে গিয়া, দেহ-মন্দিরের দুই একটি বিগ্রহকে মাঝে মাঝে আমরা স্পর্শ করিতে বাধ্য হইব।

প্রথম যৌন-সম্মিলনে বাধা

বিবাহের অব্যবহিত পরেই স্ত্রী যে স্বামীর সহিত সম্পূর্ণভাবে মিলিত হইতে পারে না, তাহার মানসিক যেমন কতকগুলি কারণ বর্ত্তমান থাকে, তেমনি দৈহিক একটা প্রকাণ্ড বাধাও বর্ত্তমান থাকে। যাহাকে ইতঃপূর্ব্বে কখনো চোখে দেখি নাই, হয়ত যাহার বাঁশীও শুনি নাই, সহস্র লোকের হর্ষোদ্দীপ্ত কল-কোলাহলের মধ্যে নিমেষে ছিনাইয়া-লওয়া এক শুভদৃষ্টির পরই তাহাকে আপন শয্যায় স্থান দিয়া একান্ত বুকের মধ্যে টানিয়া লওয়া অথবা তাহার সহিত প্রাণ খুলিয়া রহস্যালাপ করা—তাহার জীবনের সুখ-দুঃখের প্রত্যেক সুরটির সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া দেওয়া—পিতা-মাতার স্নেহ-রসে আবাল্যপুষ্ট দেহটিকে স্বেচ্ছায় তাহার

মদন-দেবালয়ের প্রদীপ করিয়া তুলিয়া ধরা—একি সহজে সম্ভবে

অরতাপূর্বা কন্যার সহিত যৌন-সম্মিলনে দেহগত ও মনোগত কতকগুলি অনুপেক্ষণীয় অন্তরায় আছে বলিয়াই 'কামসূত্রে'র গ্রন্থকার মুনি বাৎস্যায়ন প্রথম সম্প্রয়োগ অত্যন্ত সাবধানে সাধন করিতে নবীন ভর্তাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। জন্মের সময় হইতেই বালিকার যোনিনালির প্রবেশ-মুখের ভিতরদিকে একটী গুটানো চামড়ার পর্দা থাকে, উহার নাম সতীচ্ছদ (Hymen or maiden-head)। ঢাক্ বা ঢোলকের মুখে যেমন চাম্ড়া লাগানো থাকে কিংবা কর্ণরন্ধ্রে যেমন পটহ (tympanic membrane) সন্নিবিষ্ট থাকে, কতকটা সেই ভাবেই সতীচ্ছদটী যোনি-নালির অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশের পথটি প্রায় জুড়িয়া থাকে। কিন্তু প্রায় সকল বালিকারই সতীচ্ছদের উর্ধ্বদিকে একটি খণ্ডচন্দ্রাকার ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে; পাত্রভেদে এই ছিদ্রপথে একটি খড়িকা হইতে একটি কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রবেশ করিতে পারে। এই ছিদ্র-পথে কুমারীদের ঋতুকালীন্ রজোস্রাব ফোঁটা ফোঁটা করিয়া নির্গত হইতে পারে। কচিৎ কোনো বালিকার সতীচ্ছদে আবার আদৌ ছিদ্র থাকে না। কিশোর বয়সে বিবাহের পূর্বে এই শেষোক্ত শ্রেণীর কন্যারা রজোদর্শন করিবার সময় বিপদে পড়ে, স্রাব বাহিরে আসিতে পারে না। তখন সামান্য অস্ত্রোপচার-সাহায্যে সতীচ্ছদ আংশিক বা পরিপূর্ণভাবে ছিন্ন করিয়া দিতে হয়।

সতীচ্ছদ

সতীচ্ছদের চর্ম গুটানো বা কুঁচ্কানো থাকে বলিয়া বাহির হইতে উহার উপর চাপ দিলে, উহার মধ্যাংশ টান্টান্ হইয়া সিকি হইতে অর্ধ ইঞ্চি পর্যন্ত ভিতর দিকে নামিয়া যায়।···বহুকাল হইতে মানুষের মনে একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, সতীচ্ছদই হইল স্ত্রীলোকের

কুমারীত্ব বা অক্ষতযোনিত্বের প্রত্যক্ষ নিদর্শন · সতীচ্ছদ ছিন্ন হইলেই বুঝিতে হইবে যে, সে কুসুম অনাঘ্রাত নহে; কন্যা প্রথম রমিতা হইতে গেলেই তাহাকে এই সতীচ্ছদ-ভেদের যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। অথচ সম্প্রতি প্রমাণিত হইয়াছে যে, একমাত্র রমণের ফলেই যে কুমারীর সতীচ্ছদ ছিন্ন হইয়া যায়, এমন নহে।

সতীচ্ছদের চাম্ড়া স্বভাবত কাহারো স্থূল, কাহারো ক্ষীণ। যে সকল কুমারীর পাৎলা সতীচ্ছদ, তাহারা বাল্যকাল হইতে ক্রমাগত অতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রম বা ব্যায়াম (যথা—পুরুষজনোচিত লাফালাফি, ছুটাছুটির খেলা, ভারী জিনিষ লইয়া ক্রমাগত উপর-নীচে উঠা-নামা করা, ঢেঁকি চালানো, যাঁতা ঘুরানো, ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার কাটা প্রভৃতি) করিতে থাকিলে অথবা অঙ্গুলি বা অন্য কোন তৎসদৃশ কঠিন পদার্থ দ্বারা স্বমেহনে প্রবৃত্ত হইলে, উহা ছিঁড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। এমন দুই-একটি কেস্ জানা গিয়াছে, যেখানে রমণ-ব্যতীত অন্য কারণে ছিন্ন সতীচ্ছদ দেখিয়া, সদ্যোবিবাহিত স্বামী তাঁহার পত্নীকে ভ্রষ্টা-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছেন। একজন বিলাত-ফেরৎ বাঙ্গালী ডাক্তারও তাঁহার নির্দোষী পত্নীকে এই অজুহাতে চিরকালের জন্য পিতৃগৃহে নির্বাসিত করিয়া রাখিয়াছেন।

সতীচ্ছদ-ছেদে বিপদ

সাধারণ ভদ্র বাঙ্গালী পরিবারের আবাল্যসুস্থ কন্যার সতীচ্ছদ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, রতিরতা না হইলে, অব্যাহত থাকে। স্বামী বা অন্য কোনো পুরুষের প্রথম বা দ্বিতীয় সহবাসের ফলেই সতীচ্ছদ সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়; এবং উহাতে ঈষৎ রক্ত-পাতও হইয়া থাকে। সুতরাং সতীচ্ছদ ছিন্ন হইবার সময় কুমারীগণ অল্পবিস্তর যন্ত্রণা অনুভব করেন। অবশ্য বিবাহের পর উপর্যুপরি কয়েক রাত্রি আত্মসংযম

ও সদয় ব্যবহার দ্বারা স্ত্রীর বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া অতি সন্তর্পণে সহবাস করিলে, এই যন্ত্রণার যথেষ্ট লাঘব হইতে পারে ; কারণ সতীচ্ছদ সেক্ষেত্রে একটু একটু করিয়া ফাটিয়া, ধীরে ধীরে নানা স্থলে ছিন্ন হইয়া পড়ে।

অজ্ঞ স্বামী প্রথম প্রণয়াবেগে অধীর হইয়া, সজোরে ইন্দ্রিয় প্রবিষ্ট করাইয়া, নবীনা বধূর সতীচ্ছদ এক আঘাতেই ভেদ করেন। ইহাতে একদিকে যেমন তীব্র বেদনা অনুভূত হয়, অন্যদিকে তেমনি প্রচুর রক্তপাতও হয়। সময় সময় যোনি-মুখও ক্ষতবিক্ষত ও প্রদাহযুক্ত হইয়া পড়ে। এই আকস্মিক্ বিপদে স্বামীও যেরূপ অপ্রস্তুত হইয়া পড়েন, স্ত্রীও বহুস্থলে সেই-রূপ স্বামীর এই দুর্ব্যবহার ইচ্ছা-প্রসূত বলিয়া বিবেচনা করেন। সেইজন্য বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, প্রথম সম্প্রয়োগ বলপূর্বক সাধিত হইলে, বহু রমণীর মানস-সত্বায় একটা দুরারোগ্য ক্ষত (psychic lesion) জন্মিয়া যায়। অতঃপর বিবাহিত জীবনে স্বামী হাজার সুব্যবহার করিলেও তাহারা প্রথমমিলন-রাত্রের ওই ক্লেশকর অভিজ্ঞতার স্মৃতি নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিতে পারে না *। অনেক সময় বিবাহিতা রমণীর দুরারোগ্য হিষ্টিরিয়া,

* মনুষ্য-জীবনের বিভিন্ন প্রবৃত্তি ও আবেগ সম্বন্ধে সবিশেষ পারদর্শী, ফরাসী লেখক ব্যাল্‌জাক্ একস্থলে বলিয়াছেন, "The husband who begins with his wife with a rape, is a lost man. He will never be loved...." 'Histoire morale des femmes' নামক মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা M. Legouve বিবাহ-অধিবাসরাত্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়া গিয়াছেন, "The young girl finds herself delivered to this man whose brutal violence sometimes compromises, in a second, the happiness of a life time !...There are those whom this savage taking possession has inspired with such horror that they have been stricken with incurable sufferings ; there are others whom this memory alone has forever separated from their husbands thenceforth for them objects of repulsion."

মেল্যান্‌কলিয়া, psychosis, anxiety neurosis প্রভৃতি মানসিক বিকার, ভ্যাজাইনিস্‌মাস্‌ (প্রদাহজনিত যোনিনালীর অবরোধ) আদি বহুতর ব্যাধির কারণ খুঁজিতে গিয়া, আমরা এই ঘটনারই স্মৃতিমূলে আসিয়া উপনীত হই।

পূজারতির পূর্বে যেমন স্বস্তিবাচন, সঙ্কল্প-পাঠ, আসন-শুদ্ধি, আচমনাদি করিতে হয়, তেমনি রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে সদ্যঃপরিণীতার কাম-কেন্দ্রগুলিকে জাগ্রত করিয়া লইবার জন্য নানারূপ প্রক্রিয়া করিতে হয়। বাৎস্যায়ন এই প্রক্রিয়াগুলির নাম দিয়াছেন 'উপচার' বা 'কন্যা বিস্রম্ভন' *। এই পুস্তকে বাৎস্যায়ন-বর্ণিত উপাচারগুলির পুনরুদ্ধার করিয়া দেওয়া কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হইবে বিবেচনা করিয়া, কেবলমাত্র সাধারণভাবে তাঁহার দুই এক ছত্র উপদেশ এখানে তুলিয়া ধরিব। নবপতি এইগুলি মানিয়া চলিলে, উভয় পক্ষেরই সুখের কারণ হইবে।

কন্যা-বিস্রম্ভন

"কুসুমসধর্ম্মানো হি যোষিতঃ সুকুমারোপরাক্রমাঃ। তাস্তনধিগত-বিশ্বাসৈঃ প্রসভমুপক্রমমমানাঃ সম্প্রয়োগদ্বেষিণ্যো ভবন্তি।" [কস, ২অ, ৬]

—রমণীগণ (বিশেষভাবে নবপরিণীতা) কুসুমের মতো কোমল; তাহাদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন না করিয়া, হঠাৎ বলপ্রকাশপূর্বক অভিমর্ষণে রত হইলে, তাহারা সম্প্রয়োগদ্বেষিণী হয়।

"সহসা বাপ্যুপক্রান্তা কন্যাচিত্তমবিন্দতা। ভয়ং বিত্রাসমুদ্বেগং সদ্যোদ্বেষঞ্চ গচ্ছতি।"

—কন্যার চিত্তকে বশীভূত না করিয়া (এবং রীতিবিরুদ্ধ উপচারাদি

* বিস্রম্ভন অর্থ 'পরিচয় ও বিশ্বাস জন্মাইয়া প্রণয়াভিমুখী করণ'। উপচার অর্থ 'কন্যার ভাবসংস্কারের অভিপ্রায়ে তাহার মানবর্ধন'।

প্রয়োগ না করিয়া) যদি তাহাকে অকস্মাৎ উপভোগ করা হয়, তাহা হইলে সে শঙ্কিতা, দুশ্চিন্তাগ্রস্তা ও পুরুষের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্না হইয়া পড়ে।

"সা প্রীতিযোগমপ্রাপ্তা তেনোদ্বেগেন দূষিতা। পুরুষদ্বেষিণী বা স্যাদ্বিদ্বিষ্টা বা ততোঽন্যগা।"

—এরূপ রমণে রমণী কোনরূপ আনন্দ তো পায়ই না, বরং সেই পুরুষটির প্রতি, নচেৎ সমস্ত পুরুষজাতির প্রতি, বিতৃষ্ণার বিষে তাহার মন জর্জরিত হইয়া উঠে; হয়ত সে (যেন সেই বিশেষ পুরুষের নৃশংস অজ্ঞতার প্রতিশোধ লইতে) অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়ে।

আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ—'গৃহ্যসূত্র' হইতে 'ভাবপ্রকাশ'এর গ্রন্থকারবর্গ,—বিবাহের পর ত্রিরাত্র (মতান্তরে—নয়দিন পর্যন্ত) ব্রহ্মচর্য পালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে,—কন্যার বিশ্বাস উৎপাদন ও অনুরাগ জন্মানো। বাৎস্যায়ন, বাভ্রব্যাদি মহাজনগণ চুম্বন, আলিঙ্গন, কক্ষ-উরু-জঘনমূলে হস্তবিন্যাস, বক্ষোদেশে আচ্ছুরিতক-স্পর্শন দ্বারা ঐ তিনদিন মৃদু উপচার প্রয়োগের পর চতুর্থরাত্রে যন্ত্র-সংযোগের উপক্রম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু অকালে তাহার ব্রতখণ্ডন করিতে, অর্থাৎ দেহমনে সম্পূর্ণ উপযোগী না হইলে সহবাস করিতে, নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া বয়ঃপ্রাপ্তা নববধূর যথোপযুক্ত উপক্রমে বেশী বিলম্ব করা যে উচিত নহে,—এবিষয়ে সকল জাতীয় বিশেষজ্ঞগণই অনন্যমত। বাৎস্যায়ন বলেন, "অতিলজ্জান্বিতেত্যেয়ং যস্তু কন্যামুপেক্ষতে। সোঽনভিপ্রায়বেদীতি পশুবৎ পরিভূয়তে॥" —কন্যা অতিলজ্জাশীলা বলিয়া যে ব্যক্তি তাহাকে অবহেলা করে, সে অভিপ্রায়জ্ঞ নহে বলিয়া পশুর ন্যায় (নির্বোধ, অরসজ্ঞ বলিয়া) ঘৃণিত হয়।...

ফুলশয্যার রাত্রে সতীচ্ছদ-ভেদ-জনিত আচম্বিত আঘাত-প্রাপ্তির ফল যে

কত বিষময়, দীর্ঘস্থায়ী ও দুর-দুরান্তর-সঞ্চারী হয়, তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমরা বহু কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছি। এই জাতীয় ঘটনা আমাদের দেশে প্রচুর সংঘটিত হইলেও উদ্ঘাটনের আলোকে আনা দুরূহ ব্যাপার; অনেক নিপীড়িতা কন্যাই তাহার অতিবড় বান্ধবীর নিকটও সে কথা ব্যক্ত করিতে লজ্জা বোধ করে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার চিকিৎসকগণ এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত তাঁহাদের পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; সেগুলি যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ, তেমনি শিক্ষাপ্রদ। জার্মানীর খ্যাতনামা মনোবিদ্-চিকিৎসক উইল্‌হেল্‌ম্ স্টেকেল্ তাঁহার পুস্তকাবলীতে অসংখ্য কেসের প্রতিবেদন দিয়াছেন; তন্মধ্য হইতে একটি মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম *।

দৃষ্টান্ত

কেস্ নং ৯৩। মিসেস্ এইচ,এন্, তাঁহার কন্যাকে ঘৃণা করেন; অকপটে স্বীকার করেন যে, তাহাকে কখনো ভালবাসিতে পারেন নাই। তাঁহার জীবনের ইতিহাস লইতে গিয়া জানা গেল যে, মিসেস্ এইচ, এন্, তাঁহার বৈবাহিক সম্বন্ধের প্রতি চিরকালই উদাসীন্ আছেন। বিবাহ-রাত্রিতে সংঘটিত কোন ব্যাপারের পর হইতেই এই অনাসক্তি চলিয়া আসিতেছে। বিবাহের পূর্বে তাঁহার স্বামীর আলাপ-ব্যবহার দেখিয়া তাঁহাকে খুবই ভালো লাগিয়াছিল; প্রকৃতপক্ষে তাঁহার জন্য একটা গভীর অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল। অন্য পক্ষে, মিসেস্ এইচ্, এন্, অত্যন্ত লজ্জাশীলা ও ধীরপ্রকৃতির নারী ছিলেন। পারিবারিক কড়া শাসন ও যৌন-ব্যাপার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার মধ্যে মানুষ হওয়ায়, তিনি নিতান্ত অস্বাচ্ছন্দের সহিত বিবাহ-রাত্রির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

"যাহাহউক, সে রাত্রে পতিপ্রবর বলপ্রয়োগে তাঁহার বসন উন্মোচন করিলেন; কিন্তু শয্যায় শয়ন করিতে দিলেন না। নিজেরো পরিচ্ছদ

* FRIGIDITY IN WOMEN, Wilhelm Stekel, Vol ii.

পরিত্যাগ করিয়া তিনি আবদার ধরিলেন যে, নববধূ তাঁহার নগ্নরূপ একদৃষ্টে সন্দর্শন করিবে ও তৎসহিত তাঁহার যৌনেন্দ্রিয়ের স্তুতিবাদ করিবে। মিসেস্ এইচ্ করপল্লবে মুখ ঢাকিলেন এবং কোনো প্রকারেই নগ্নস্বামীর প্রতি চাহিতে পারিলেন্ না। তখন যুবক স্বামী বলিয়া উঠিলেন, 'বোকা রাজহংসী, তোমার বাপের বাড়ীতেই পড়ে' থাকা উচিত ছিল।' এই বলিয়া তিনি পত্নীকে শয্যায় ফেলিয়া, অত্যন্ত নৃশংসভাবে রমণ করিলেন। ঐ বলাৎকারের ফলেই তাঁহার গর্ভসঞ্চার হয়। এই বলাৎকারের জীবন্ত, জ্বলন্ত ও সমূর্ত স্মৃতি তাঁহার ঐ কন্যাটি। সেইজন্য তিনি স্বামীকেও যেমন ভালবাসিতে পারেন নাই, কন্যাটিকেও তেমনি স্নেহের চক্ষে দেখিতে পারেন নাই।...

দৃঢ়প্রতীতির সহিত বলিতেছি যে, এরূপ ঘটনা আমাদের দেশে অপ্রতুল নহে। রমণে যে রমণী কোনরূপ সুখ বা দুঃখ বোধ করেন, এ বিবেচনা বহু শিক্ষিত বিবাহিত পুরুষের মনে স্থান পায় না। যে কাম, পুরুষের নিকট নিমিষের কেলি বিশেষ, তাহা কামিনীর নিকট জীবন-মরণ সমান। স্ত্রীলোক নরের কামনা-চরিতার্থতার একটা রক্তমাংসময় উত্তপ্ত যন্ত্র বিশেষ—এই জঘন্য ধারণার বশবর্তী হইয়া, বহু পুরুষ রমণীর অকৃত্রিম প্রেম হইতে আপনাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, উহাদিগের সমগ্র জীবনটা সংগোপন অতৃপ্তি ও বিতৃষ্ণার দীর্ঘশ্বাসে ভরিয়া তুলিয়াছেন।

উভয় তরফে যৌনজ্ঞানের অভাব

এই সকল ক্ষেত্রে উভয় পক্ষেরই কাম-কলা সম্বন্ধে একটা বিজ্ঞান-সম্মত জ্ঞান বিবাহের পূর্বেই লাভ করা উচিত। এদেশের অনেক যুবকেরই রমণীর জননেন্দ্রিয়-সংস্থান ও তাহার প্রত্যঙ্গগুলির কার্যকারিতা সম্বন্ধে একটা নির্ভুল ধারণা নাই। বিবাহ করিলেই স্ত্রীর সহিত রতিক্রিয়া

করিতে হয়—এই মোটা ও মামুলি জ্ঞানটুকুই হয়ত তাহারা বন্ধু-মহল হইতে চয়ন করিয়া লয়। কিন্তু রতিক্রিয়া যে কেবল এক পক্ষের সুখের জন্য নহে, প্রথম সম্প্রয়োগে বলপ্রকাশ যে কতদূর অবিমৃষ্যকারিতা এবং নববধূর আসক্তি-উদ্দীপন ও ভাব-সঞ্চারের জন্য কি কি উপচার প্রয়োগ করিতে হয়, সে তত্ত্ব অনায়ত্ত করিয়াই বহু ডিগ্রীধারী বাঙ্গালী যুবক বিবাহ-জীবনের হেম-হর্ম্যে নির্ভয়ে প্রবেশ করেন। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর উপর বলাৎকারের সংখ্যা জগতের সর্বত্র অধিক; ভারতবর্ষে বোধ করি সব চেয়ে বেশী।

যৌন-জীবন সম্বন্ধে ভাবগতভাবে যথোচিত জ্ঞান-লাভ না করার নিমিত্ত কত স্ত্রীলোক যে তাঁহাদের নিজেদের ও স্বামীর জীবন বিবাহের পর হইতে তিক্ত, নিরানন্দ করিয়া তুলেন, তাহার সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নহে। স্বামীদের যে দোষ না থাকে, তাহা নহে। তবে যে ভাবেই হোক্, তাহাদের অনেকেই বিবাহের পূর্বে কাম-জীবন সম্বন্ধে যৎসামান্য কিছু ভাসাভাসা জ্ঞান-লাভ করে; কেহ কেহ ব্যবহারিকভাবেও সে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সুযোগ পায়। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুঘরের অধিকাংশ বালিকাগণ—যাহারা সাধারণত বারো হইতে পনের বৎসর বয়সের মধ্যে বিবাহিত হয়, তাহারা বিবাহ-জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় তথ্যটি পূর্বে সংগ্রহ করিবার কোন সুষ্ঠু, সুনিয়ন্ত্রিত প্রণালীই খুঁজিয়া পায় না।

অনেক বালিকা নিজেদের দেহসংস্থান সম্বন্ধে এরূপ অনভিজ্ঞ যে, যোনি-পথ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র প্রণালীর অস্তিত্ব তাহারা স্বামী-সহবাসের পূর্ব মুহূর্ত্ত পর্যন্ত অবগত হয় না। আবার অনেক স্বামীপ্রবরকেও জানি, যাঁহারা কাম-জীবনের অপরাহ্নকালেও স্ত্রীলোকের যোনি-নালী ও মূত্রনালী অভিন্ন বলিয়াই জানেন।

কেহ কেহ সদ্যোবিবাহিতা কোন বান্ধবীর নিকট যে তথ্যটুকু সংগ্রহ করে, তাহা সুখাবহ হয় না। অনেকস্থলে উভয়পক্ষের ভব্যতাসম্মত শালীনতার জন্য খোলাখুলিভাবে সে তথ্যের প্রশ্নোত্তরদানে বাধা জন্মিতে পারে। সদ্যোবিবাহিতা বান্ধবীটি হয়ত সে সময় কাম-জীবনের সহিত নিবিড়ভাবে পরিচিত হইতে পারে নাই, অথবা এই জীবনের বৃহত্তর সুখাস্বাদনের অনুভূতি তখনো তাহার জাগে নাই। কেহ কেহ তাহার নবলব্ধ স্বামীপ্রবরকে পীড়করূপেই বর্ণনা করে; অবিবাহিত-অবস্থায় পকিল্পিত স্বামী বাস্তব-জগতে নামিয়া নিজের লালসা-তৃপ্তির জন্য স্ত্রীর প্রতি যে কতখানি অবিচার করিতে পারে, সে তাহারই ব্যাখ্যান্ করে। ফলে, অবিবাহিত কিশোরীকে হয়ত বিবাহের প্রতি একটা নিরুদ্ধ বিতৃষ্ণা বুকে পুষিয়া, নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়াই ফুল-বাসরে প্রবেশ করিতে হয়।

ইহা সত্য কথা, হিন্দু-ঘরের অনেক বালিকাই যৌন-জীবন সম্বন্ধে কোন পরিস্ফুট ও অভ্রান্ত জ্ঞানাহরণ না করিয়া বিবাহের বিচিত্র মণিকোঠায় প্রবেশ-লাভ করে। সুতরাং স্বামী হাজার সৎ ব্যবহার করিলেও, প্রথম প্রণয়াবেগ-সুলভ শত অনুনয়-বিনয় করিলেও, নববধূ তাহার কাছে একান্ত জড়োসড়ো হইয়া থাকে, তাহাকে দূরে রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে, কাছে আসিলে ভীত ত্রস্ত সচকিত হইয়া উঠে। শেষে তাহাকে শত্রুরূপে গণ্য করে। বাস্তব জীবনের লক্ষ লক্ষ ঘটনা হইতে একটি মাত্র এখানে চয়ন করিয়া দিব।...

উত্তুঙ্গ সুখের আশা, প্রেমের মোহ-রঙীন্ মনোহর নেশা বুকে-চোখে লইয়া, এক নবীন দম্পতি যুগ্ম-জীবনের সূত্রপাত করিল। স্বামী অবস্থাপন্ন, শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, দেখিতে মোটামুটি সুরূপ। স্ত্রীও সুরূপা,

উদাহরণ

স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য ভাদ্রের ভরা নদীর মত ঢলঢল করিতেছে; বয়স তাহার পূর্ণ পনের বৎসর,

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে লেখাপড়াও শিখিয়াছে। এই যে রূপের শুভ্র অকলঙ্ক ডালি—এই যে যৌবনের শত ঐশ্বর্য-সম্ভারে উদ্ধত দেহ-মন, ইহাকে যে কেমন করিয়া স্বামীর তৃপ্তিতে নিয়োজিত করিতে হয়, একজনের আরাধনার বিনিময়ে কিভাবে আপন যৌবন-মালঞ্চের ফুলগুলি তাহার পায়ে অর্পণ করিতে হয়, তাহা বালিকা শিখে নাই; মাতা বা জ্যেষ্ঠা ভগ্নীরাও তাহাকে শিখাইবার জন্য ব্যস্ত হন্ নাই। শিশুকে যেমন স্বহস্তে আহারের রীতি শিখাইতে হয় না, বালিকা-কন্যাকে তেমনি বিবাহের বা বিহারের নীতিও শিখাইতে হয় না; প্রথম জিনিষটা সে দেখিয়া শিখিয়াছে, দ্বিতীয়টা সে ঠেকিয়া শিখিবে,—ইহাই ছিল তাঁহাদের সনাতন ও কুলাগত ধারণা।

কিন্তু তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, শিশুকে যেমন তাহার আহারের সময়, পরিমাণ ও গুণাগুণ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হয়, বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যতত্ত্বের বিধি-নিষেধের বাণীগুলি তাহার কোমল প্রাণে গাঁথিয়া দিতে হয়, মাছের কাঁটাটি সযত্নে নিজের হাতে বাছিয়া দিতে হয়,—তেমনি করিয়া তাঁহাদের কিশোরী কুমারীকে বিবাহের সর্বপ্রধান যজ্ঞের মন্ত্রগুলি মুখস্থ করাইয়া দিতে হয়—নব-জীবনের অনাগত অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য তাহাকে সর্বতোভাবে প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। কিন্তু কেন জানি না, বাঙ্গালী ঘরের সুবুদ্ধিসম্পন্ন শুভাকাঙ্ক্ষী পিতামাতা তাঁহাদের সন্তানের প্রতি সর্বাপেক্ষা বড় কর্তব্যটি সাধনে ইচ্ছাক্রমেই অবহেলা করেন।...

যাহাহউক, পুষ্পশয্যার রাত্রে, স্বামী তাহার স্বপ্নের ছবিকে বাস্তব জগতের সন্নিকটে পাইয়া গভীর পুলকে বিভোর হইয়া গেল। বেশী কিছু নহে, প্রেয়সীর সহিত দুইটা কথা কহিবার জন্য তাহার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু কথার উত্তর দিবে যে, নিঠুর দেবতার মত সে বিমুখ হইয়া

আছে; তাহার অধিকাংশ দেহ-লতা শয্যার বাহিরে পড়িয়া। হয়তো ভয়ে সে কাঁপিতেছে—সর্পের বিবরে শালিক পাখী যেমন করিয়া কাঁপে; নহেতো একটা অকারণ কুণ্ঠার তিক্ততায় তাহার সমস্ত সত্বা যেন আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। সর্বোপরি, একটা অসম্বরণীয় ও অনুদার লজ্জার অন্তরালে সে আত্মগোপন করিয়া আছে।

মৃদুভাবে স্বামী তাহাকে কিছুক্ষণ সাধাসাধি করিলেন, তাহার মাথায় ও বাহুতে একটু হাত বুলাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সে তাহা সবেগে প্রত্যাখ্যান করিয়া দিল। মৃদু আঘাত সহিবার মত মানসিক শক্তি ও প্রথম ভালবাসার এ সকুণ্ঠ আচরণে ধৈর্য ধরিবার মতো স্থিরবুদ্ধি যুবকটির যথেষ্ট ছিল। সে অগত্যা বহু-আকাঙ্ক্ষিত মধু-যামিনী তপ্ত দীর্ঘশ্বাসেই কাটাইয়া দিল। অনাস্বাদিতপূর্ব সুখের বিভাবরী তাহার অকারণ জাগরণেই গেল!

পরদিনও এই ব্যাপার। কত সাধাসাধি, বুঝানো-সুঝানো; কিন্তু ভবী ভুলে না। আলিঙ্গন করিতে গেলে সভয়ে সরিয়া যায়, স্বামীর নিঃশ্বাসকেও যেন কিশোরী সকুণ্ঠায় এড়াইয়া চলে। বেচারা আপনা-আপনি ভ্রমরের মতো প্রেমের মাধুকরী করিয়া যায়; কিন্তু মধু তো মিলে না। বধূ ফুপাইয়া কাঁদে আর বাহুর বাঁধন ছাড়াইয়া কাঁদনের ফাঁক্ দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলে—না, একি জ্বালা! আমায় ছাড়ো, এসব ইয়ার্কি ভালো লাগে না, যাও।···কিন্তু "দেওয়ালে পেয়ে বাধা কাঁদন ফিরে আসে আপন কাছে!"

শেষে আর নীরবে বা সরবে ক্রন্দন নহে,—রাত্রে সকলে শয়ন করিলে ঘর হইতে বাহিরের বারান্দায় চুপিসাড়ে আসিয়া শয়ন, চাপা গলায় স্বামীর সাধাসাধি ও অভয়াশ্বাস, পরে ঘরের এক কোণে খালি মেজেয় শয়ন, সারারাত্রি অনিদ্রা ও দুশ্চিন্তা; তারপর মুখে যা আসে তাই বলিয়া ফিস্

ফিস্ করিয়া গালাগালি ও রক্তচক্ষু, ভুজঙ্গীর ন্যায় ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া শ্বাস-বর্জ্জন ; শেষে ক্ষোভে, ক্রোধে, অভিমানে আবার তপ্ত অশ্রুবন্যা,—এমন করিয়া দিন যায়। বিবাহের সপ্তাহ দুইয়েক পরে স্বামী যৌন-সম্মিলনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিল,—ধৈর্য আর কতদিন মানা মানে ? বধূ তো কাঁদিয়াই অস্থির। সে স্বামীকে সজোরে এক পাশে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া, ঘরের এক কোণে গিয়া বসিয়া পড়িল। ক্ষমাময় স্বামী তাহার নিকটে গিয়া বুঝাইয়া বলিল যে, বিবাহের এ চিরন্তন রীতি স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলন। দেহই মনোরাজ্যের সিংহদ্বার ; এই দ্বারের ভিতর দিয়াই চির-বরেণ্য অতিথিকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। ইহাতে লজ্জার কিছু নাই, ভয়ের কিছু নাই ; সৃষ্টির আদিম প্রভাতে জীব-জগতকে দেওয়া এ বিধাতার বৈধ অধিকার। আর, সে নিজে নৃশংস ও অবিবেচক নহে, প্রেয়সীকে সে অযথা ব্যথা দিবে না। সে যেন অকারণ অস্থির না হয় ; সংশয় ও বিরক্তির ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড অতিক্রম করিয়া যে অতুল তৃপ্তির আনন্দঘন অনন্ত রাজ্যে পঁহুছানো যায়, তাহাই সে দেখাইয়া দিবে।…

তবু কান্না থামে না, সম্মতির কোন লক্ষণই দেখা যায় না। ব্যাকুল উৎকণ্ঠিত ভক্ত আরাধ্যা দেবীর রুদ্ধ দেউল-দ্বারে মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে, আর দয়িতা অজ্ঞানতার অন্ধকারে নির্মম উপেক্ষায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে! ভাবিতেছে,…হায় ভগবান! এরই নাম কি বিবাহ? নিজেও জ্বালা পাওয়া, পরকেও জ্বালা দেওয়া। শান্তিতে কি নিদ্রা যাইতে পারা যায় না? যে স্থানটিকে এতকাল নিজেই আন্তরিক অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি, লজ্জায় সূর্যালোককে যাহার ছায়ামাত্র প্রদর্শন করি নাই, তাহাকে লইয়া প্রেমের খেলা খেলিতে স্বামী-দেবতার এ কী নির্বন্ধাতিশয্য! এ দেবতা, না পিশাচ? নারীর এই চিরতমিস্র অবজ্ঞাত কলুষিত কূপের

মধ্যেই কি সকল পুরুষ এমনি করিয়া ক্ষ্যাপার মত তাহাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ পরশ-পাথর খুঁজিয়া মরে? ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জা, কী ঘৃণা!...

কৌমার্য-কালের সকল সুখের কল্পনা সূর্যোদয়ে কুয়াসার মতো অচিরে তিরোহিত হইল। প্রেম-জীবনের সূত্রপাতেই পরস্পরের মধ্যস্থলে একটা সন্দেহ ও বিরাগের উত্তুঙ্গ প্রাচীর উঠিয়া পড়িল। এক পক্ষের ঘোর অজ্ঞতা ও অনুদার দৃষ্টিই যে এ অনভিপ্রেত ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া দিল—তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

হতাশায় অধীর হইয়া যুবক একদিন তাহার মামাশ্বশুরের সহিত সাক্ষাৎ করিল। বয়সে সাত আট বৎসরের বড় হইলেও সমবেদনায় তিনি সমবয়সীর মতোই নির্ভরযোগ্য। কিন্তু ভাগিনা-জামাইয়ের করুণ কাহিনী শুনিয়া তিনি বড় বেশী অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। জন-সমাজে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া তাঁহার একটা খ্যাতি ছিল। কিন্তু প্রেমের রাজ্যে দশ বৎসরের মধ্যেও তিনি পাদ-প্রসর ভূমিও জয় করিতে পারেন নাই। স্ত্রীর দুর্নমনীয়তাকে প্রশমিত করিতে হইলে, তিরস্কার, বল-প্রয়োগ, নচেৎ পরিশেষে নিরুদ্বেগ উদাসীনতার ছায়াতলে শয়নই তাঁহার মতে একমাত্র ওষধি।

'মাই-ডিয়ার' মামাশ্বশুর হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "সে-ও যেমন ছেলেমানুষ, তুমিও তেম্‌নি! ওহে, এ সব ব্যাপারে অত মিন্‌মিনে হ'লে কি চলে? মনু ত স্পষ্টই বলে' গেছেন—স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্রতা বলে' কোন জিনিষ নেই। বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর ও বৈধব্যে পুত্রের বা ভ্রাতার অধীনে সে থাক্‌বে।"

"মামাবাবু, হাস্‌ছেন আপনি? কারো পৌষমাস, কারো সর্বনাশ! আমি যে কতখানি আশাহত, মর্মাহত হ'য়ে পড়েছি, তা' আপনাকে কি করে' বুঝোব বলুন! আপনাদের মেয়ে ঘরে নিয়ে যে আমাকে এতদূর

অসুখী হ'তে হবে, তা আগে কে জান্‌ত? কিন্তু এখনো আমি সম্পূর্ণ নিরাশ হইনি। আমি তার স্বাধীনতা খর্ব কর্তে চাই না, কিন্তু তার মনের সঙ্গে যোগ-সূত্র স্থাপন কর্তে চাই। কি করে' করি বলুন ত?"

"করবে আর কি? আমার ভাগ্নী বলে' পক্ষপাতিত্ব কর্তে চাই না। এই সব দুষ্টু, লাজুক্, একগুঁয়ে মেয়ের কাছে বেশী অনুনয়-বিনয়-কাকুতি-মিনতি নয়,—এতে নিজেকে অনেকখানি খাটো ও খেলো করে' ফেলা হয়। স্ত্রীলোক হাজার রূপসী, বিদুষী বা স্বমতপ্রধানা হ'লেও সে যে পুরুষের নীচে, তার জ্বলন্ত প্রমাণ দেবে—একটু ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করবে। বিবাহিত জীবনের অনিরুদ্ধ অধিকারকে কায়েম্ কর্তে এত কুণ্ঠিত হও কেন?"...

দুই চারি জন হিতৈষী বিবাহিত বন্ধুও ঠিক্ এই পরামর্শ দিলেন। কিন্তু প্রেমের প্রথম রেখাপাতেই এই একতরফা কায়িক সাহস যে অদূর ভবিষ্যতে কতদূর বিষময় ফল প্রসব করিতে পারে, তাহা কল্পনায় আনিতে এই বিবেচক যুবকের বেশী বিলম্ব হইল না। সদ্য-বিবাহিত হইলেও এ জ্ঞান তাহার ছিল যে, বল-প্রয়োগে একটা রাজ্য জয় করা যায় বটে, কিন্তু একটা হৃদয় জয় করা যায় না। প্রেম শুধু এক পক্ষের সুখ-সম্ভোগ-প্রদায়ক নহে, উভয় পক্ষেরই।

কিন্তু এমনি প্রবোধ দিয়া বিদ্রোহী প্রলুব্ধ মনকে কতদিন নিশ্চেষ্ট রাখা যায়? বাসনার অগ্নি সহস্র রক্তিম রসনা ঊর্ধে মেলিয়া জ্বলিতেছে, আর পতঙ্গ তাহার পার্শ্বে থাকিয়া কতক্ষণ নিশ্চল রহিবে? কুহকী শিকারী তাহার বংশীতে ফুৎকার দিয়া সঙ্গীতের মোহন তরঙ্গ তুলিয়াছে, আর কুরঙ্গ নিকটে থাকিয়া তাহার চারিখানি চটুল পদকে কতক্ষণ স্থির করিয়া রাখিবে? প্রেমের নেশা বিরহের বাতাস যত পায়, তত বাড়ে। নিরুপায় যুবক একদিন উন্মত্ত হইয়া, তাহার স্ত্রীর কুমারীত্ব হরণ করিল। ক্রোধ, তিরস্কার, ক্রন্দন ও কাকুতি আজ ব্যর্থ হতাশ্বাসে আঁধার ঘরের রুদ্ধ বাতাসে

বিলীন হইয়া গেল। তৃপ্তির পথে এ কী গভীর নিরানন্দের ছায়া! দুইজনে বিভিন্ন রূপ মানসিক অবস্থা লইয়া সে রাত্রি যাপন করিল।

প্রভাতেই নিপীড়িতা বধূ তাহার ত্রয়োদশ বর্ষীয় ছোটভাইকে দ্বিপ্রহরে অতি অবশ্য পাঠাইয়া দিবার জন্য মাতাকে অনুরোধ করিয়া একখানি পত্র লিখিল। পরদিন দ্বিপ্রহরে স্বামী আফিসে গিয়াছেন, বাটীর অন্যান্য সকলে কেহ নিদ্রিত, কেহ গৃহ-কর্মে অন্যমনস্ক। নিজের ক্যাসবাক্সটি লইয়া, বধূ তাহার ভাইয়ের হাত ধরিয়া, নিঃশব্দে ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল। এই নিষ্ঠুর নির্লজ্জ স্বামীর নির্মমতার শাস্তি চাই, তাহার দুর্বিনীত ব্যবহারের যোগ্য প্রতিবিধান চাই!...

মাতার কাঁধের উপর মুখ রাখিয়া, অবিচারিত কন্যার সে কী করুণ ক্রন্দন!

"ব্যাপার কি মা, এত কান্না কিসের? জামাই ভালো আছে ত?"

বহুবার উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের পর মেয়ের অশ্রু-নদীতে একটু ভাটা পড়িল; ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া, হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া সে উত্তর দিল, "তোমার গুণধর জামাই ভালই আছেন।...এমন লোকের হাতেও আমাকে দেয় মা?"

"কেন, কি হয়েছে? তোকে বকেছে, না, মেরেছে?"

"মারার বাড়া, মা, মারার বাড়া। উঃ, মানুষ না পশু!"

"আহা, ভেঙ্গে-চুরে বল্‌না ছাই, কি হয়েছে?"

"আর হবে কি? আমার মাথা আর মুণ্ডু! সেখানে গিয়ে অবধি আমাকে একদণ্ড শান্তিতে থাকতে দেয় নি। এত অত্যাচার কি মানুষে সহ্য করতে পারে?"

এই তথাকথিত অত্যাচারের খরস্রোতে একদিন প্রৌঢ়া জননীও পড়িয়াছিলেন; কিন্তু এত অভিমান ও অভিযোগের বাড়াবাড়ি ছিল না।

দুই এক মাসের মধ্যেই এই অপরিহার্য অত্যাচার তাঁহার নিকট আমন্ত্রণ-জনক হইয়া উঠিয়াছিল ; এখন বার্ধক্য-বায়ু-স্পৃষ্ট স্বামীর প্রতি সে পুরাতন অত্যাচারের দ্বিগুণ প্রতিশোধ লইতে তিনি কুণ্ঠিতা হন্ না। কন্যা-কথিত "অত্যাচার" শব্দটি বুঝিতে তাঁহার বড় বিলম্ব হইতেছিল, কারণ তিনিও যে একদিন মাতার সদ্যো-বিবাহিতা কন্যা ছিলেন—সে কথা তখন ভুলিয়া গিয়াছেন। দরজা ভেজাইয়া দিয়া, কন্যার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "সব ব্যাপার খুলে বল্‌তো মা। তোর হেঁয়ালি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। তোর কাছে সব শুনে-মিলে আমি নিশ্চয় প্রতিকার কর্‌ব।"

"কি বল্‌ব মা। সে আর বলার কথা নয়। পাজী, শূয়ার রোজ রাত্রে—"

জননী এবার কতকটা বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, "হ্যাঁ, তার হয়েছে কি?"

"রোজ রাত্রে আমাকে যা-তা বলে, আর গায়ে হাত দেয়, শুধু কি তাই? জোর ক'রে কাল রাত্রে—উঃ মাগো, সে যে কী পাশবিকতা—" তাহার দুই গণ্ড বহিয়া আবার জল-ধারা ছুটিতে লাগিল।...

পনের-ষোল বৎসরের মেয়ের এই শোচনীয় অজ্ঞতার জন্য মাতাই দায়ী। অনুশোচনা করা দূরে থাক্, এত বিলম্বেও মেয়েকে এ বিষয়ে সুশিক্ষা দেওয়া দূরে থাক্, তিনি মেয়ের এই অত্যাচার-কাহিনীর আভাসটুকু পাইয়া, তপ্ত অনুকম্পায় কাঁদিয়া গলিয়া গেলেন। স্বামী গৃহে ফিরিয়া আসিলে, নানা পুষ্প-পল্লবে সাজাইয়া মেয়ের এই অপ্রত্যাশিত দুর্দশার কাহিনী তাঁহাকে শুনাইলেন। য়্যাটর্ণী কর্তাটি দেশের আইন-কানুনেই ওস্তাদ, প্রেমের আইন-কানুনে তিনি এখনো সাক্‌রেদ রহিয়া গিয়াছেন। তাই শান্তিপ্রিয়তার অজুহাতে স্ত্রীর পাদ

প্রান্তে তিনি সশঙ্ক শ্রদ্ধায় মাথা নত করিয়া থাকেন। এক-তর্‌ফা ডিক্রী দিয়া, সেই দিন হইতে তিনি মেয়ের মুখ শ্বশুর-বাড়ীর দিক্ হইতে চিরতরে ফিরাইয়া লইলেন, জামাইয়ের সহিত তাহার সকল সম্পর্ক রহিত করিয়া দিলেন।...

প্রায় তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়া যুবকটি পুনরায় সতের বৎসরের একটি কলেজেপড়া মেয়েকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইল। এবার সে স্ত্রী পাইয়া সম্পূর্ণ সুখী। প্রথমা স্ত্রী প্রতিমাসে ৩৫৲ করিয়া মাসোহারা পান। কিন্তু আটাশ বৎসর বয়সে তাঁহার শরীর-মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ডাক্তারগণ যক্ষ্মা আশঙ্কা করিয়া শৈলাবাসে থাকিবার পরামর্শ দিয়াছেন।...এই বুঝি প্রকৃতির প্রতিশোধ!......

চতুর্থ প্রপাঠ

যুবতীর যৌনবোধ ও যৌন-ব্যবহার

পূর্বেই বলিয়াছি, পনের বৎসর বয়সে আমাদের দেশের বালিকারা কৈশোরের অধিসীমায় আসিয়া উপনীত হয়। সাধারণত ষোল বৎসর বয়স হইতে তাহাদের যৌবন আরম্ভ। বালকদিগের যৌবন আরম্ভ হয় সচরাচর সাড়ে সতের বা আঠার হইতে। ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ বৎসর পর্যন্ত তিন বৎসর কিশোরীদিগের দৈহিক পরিপুষ্টি বিস্ময়করভাবে দ্রুত হয়; এত দ্রুত বৃদ্ধি জীবনের আর কোন সময়টিতে দেখা যায় না। সমবয়স্ক কিশোর পুরুষ এই বৃদ্ধির প্রতিযোগীতায় প্রায়ই কিশোরীর পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। মনও তাহাদের নূতন চিন্তার রাজ্যে প্রবেশ করে; তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানস্পৃহাও এই সময় সচরাচর প্রবলতর হইতে দেখা যায়।

যৌবন-নিকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া, প্রথম তিন চারি বৎসর পর্যন্ত অর্থাৎ ষোল হইতে আঠার উনিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত দৈহিক বৃদ্ধি পরিণতির পথে অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া, শেষে থামিয়া যায়। যুবতী আঠার বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইলে, একপ্রকার স্থিরসিদ্ধান্ত করা যায় যে, তাহার দৈহিক পরিপুষ্টি সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, আর তাহার বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। তাহার বুদ্ধিবৃত্তির বৃদ্ধিসীমাও প্রায়শ আঠার বৎসর বয়স অন্তে স্থগিত হইয়া যায় এবং তাহার সর্বপ্রকার মানসিক প্রবণতা, প্রগতি, ধারণা, আবেগ, অভ্যাস ও আকাঙ্ক্ষাগুলি মানস-মৃত্তিকায় চিরাকালের

মতো বদ্ধমূল হইয়া যায়। জীবনের উত্তরকালে তাহার দেহে অনাবশ্যকভাবে অল্পবিস্তর চর্বি জমিতে পারে বটে; কিন্তু চিকিৎসা-শাস্ত্রের 'বৃদ্ধি' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা আঁঠার বৎসর বয়সের পর হইতে আর দেখা যায় না; অথচ পুরুষের বৃদ্ধি একুশ বৎসর পর্যন্ত, সময় সময় প্রায় সাড়ে চব্বিশ বৎসর পর্যন্ত একটু একটু করিয়া চলিতে থাকে। আঠার বৎসর বয়স্কা বাঙ্গলীর মেয়েকে 'ভরা যুবতী' বা কামশাস্ত্রীয় ভাষায় 'প্রগাঢ়-যৌবনা' বলিয়া বর্ণনা করিলে, কিছু অন্যায় হইবে না।

ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ বৎসর বয়সের মধ্যে বিবাহ হইলে, নারীর বৃদ্ধি একাধিক কারণে আশানুরূপ না হইতে পারে। ইহার প্রধানতম কারণ—স্বামীর সহিত প্রথম-পরিচয়ঘটিত ও যৌনসম্মিলন-জনিত মানসিক চাঞ্চল্য, উদ্বেগ, ভয়কাতরতা, বিক্ষোভ প্রভৃতি এবং গর্ভধারণ ও প্রসব-সম্ভাবনীয়তা। যে সকল বিবাহিতা বালিকাকে এই দুইটি কারণের সম্মুখীন্ হইতে হয় না, তাহারা অনুরূপবয়স্কা কুমারী কিশোরীগণ অপেক্ষা দ্রুততর বাড়িয়া থাকে। যাহাহউক, ষোলো বৎসরের বিবাহিতা ও অবিবাহিতা যুবতীর যৌনবোধ ও যৌনজীবনের মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য থাকে। বিশদ ও নিখুঁতভাবে উহার বর্ণনা করিবার অবকাশ এই ক্ষুদ্র পুস্তকে পাওয়া যাইবে না; তবে প্রয়োজনীয় বিধায় তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিয়া যাইব।

কিশোর বয়সে পুরুষের প্রতি যে আকর্ষণ কতকটা অস্পষ্ট, অহেতুক, অস্থির ও অগভীর থাকে, তাহা যৌবনে অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট, কারণসম্মত, স্থির ও গভীর হইয়া পড়ে। যে কিশোরী দূর হইতে পুরুষকে দেখিয়া তৃপ্ত হইত, স্বপ্নে যাহার ছবি আঁকিয়া সান্ত্বনা পাইত, নিভৃতে যাহার পূজা করিয়া আনন্দ লাভ করিত, নিকটে যাহাকে পাইয়া দুই-

কুমারী যুবতীর যৌন-মনোবৃত্তি

চারিটি কথা বলিতেই লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইত, সেই কিশোরী ষোলর কোঠা পার হইয়া পুরুষকে চাহে আপনার একান্ত নিকটে, চাহে তাহার নিভৃত আরাধনার কথা আরাধ্যের কাছে অন্তত আকারে-ইঙ্গিতেও ব্যক্ত করিতে, চাহে তাহাকে স্বপ্নের রাজ্য হইতে ভুলাইয়া আনিয়া বাস্তবের হরিত কুঞ্জে বন্দী করিতে! প্রেমিকের ছবি ও রূপ বা গুণ সম্বন্ধে যাহার একটা সুনির্দিষ্ট, স্থির ও অসংশোধ্য আদর্শ মনে বদ্ধমূল ছিল না, যাহার নবোদ্গত ভালবাসা নলিনীদলগত জলবিন্দুবৎ টলমল করিত, যাহার চিত্ত আপন খেয়ালে আকর্ষণের পাত্র পরিবর্তনে ইতস্তত করিত না, তাহারই ষোল হইতে আঠার বৎসর বয়সের মধ্যে ভালবাসা সম্বন্ধে ধারণাটা হয় বেশ পরিস্ফুট—ভালবাসার পাত্র বিষয়েও তাহার মন হয় অনেকটা অচঞ্চল।

কিন্তু ভালবাসার পরম বস্তুতান্ত্রিকতার দিক্‌টি অর্থাৎ সুরতক্রিয়া সম্বন্ধে তখনো তাহার সুস্পষ্ট ক্ষুধা জন্মে না। এই সময় দর্শন ও স্পর্শন-আকাঙ্ক্ষা জন্মে অতি তীব্রভাবে; মনোমত পুরুষের ঈষৎ সংস্পর্শলাভ করিয়া সে যেরূপ পুলক-রোমাঞ্চিত হয়, তেমনটি আর ইতঃপূর্বে হয় নাই। যে পরিণতা কিশোরী তাহার প্রেমিকের নিকট হইতে সামান্য একটা উপহারের বস্তু, কালেভদ্রে গোপনে একখানি রঙ্গীন চিঠি, সোহাগের একটু স্পর্শ অথবা আদরের একটি চুম্বন পাইলেই যথেষ্ট মনে করিত, বিশ্বাস করিত—ইহার বাড়া ভালবাসার নিদর্শন আর হইতে পারে না, সেই কিশোরীই যৌবন-সমাগমে ইহাতে আর সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। স্পর্শন, প্রত্যঙ্গ-পীড়ন বা সুতপ্ত চুম্বনকে সে তখন ঘনতর আনন্দলোকের সিংহদ্বার বলিয়া মনে করে, এবং উৎকণ্ঠিত কৌতূহলে সেই অনাগত সুখের রঙমহলে প্রবেশাধিকার পাইবার প্রত্যাশা করিতে থাকে। অর্থাৎ বাল্যে বা কিশোর বয়সে আত্মানন্দ যাহাকে

তৃপ্তি দিত, অন্তানন্দের তৃপ্তি-সম্ভাবনীয়তায় তাহার মন যেন কতকটা ব্যাকুল হইয়া পড়ে।

কিন্তু স্ত্রীজাতির যৌনবোধ সম্পর্কে একটা প্রয়োজনীয় সত্য সর্বদা স্মরণযোগ্য যে, কিশোরীই হউক বা যুবতীই হউক, প্রকৃত কামকেলির বাস্তব দৃশ্য, ভাস্কর্য বা চিত্রকলা সন্দর্শন, সজীব বর্ণনাবহুল কদর্য-সাহিত্যাদি (pornography) পুনঃপুন পাঠ না করিলে অথবা প্রত্যক্ষভাবে অভিপ্রেত পুরুষের ক্রমাগত নিবিড় সংস্পর্শ না পাইলে, অথবা তাহার একটিবারের অধীর চুম্বন বা তাহার করতলদ্বারা বারেকের বক্ষোসঞ্চাপন অনুভব না করিলে, সত্যকার যৌনবোধ সম্বন্ধে সে অবহিত হয় না ; কিংবা যথাযথ যৌনসম্মিলনের একটা ক্ষীণতম ইচ্ছাও তাহার মনোনভে উদিত হয় না।

কৈশোরের শেষ বা যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই স্ত্রীলোকের বার্থোলিন্ গ্রন্থিদ্বয় যোনিনালির প্রাচীর অন্তরালে বসিয়া ধীরে ধীরে প্রচুর রসসৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে ; জরায়ু-গ্রীবার আস্তরণ-নিম্নে গাঢ়তম ক্ষাররসও (Kristller's slimy plug) ধীরে ধীরে সঞ্জাত হয় * । প্রেমিক পুরুষের সাদর স্পর্শে তাহাদের চুচুকদ্বয় কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়, দৃষ্টিশক্তি সাময়িকভাবে স্তিমিত হইয়া আসে, গণ্ডদেশ উত্তপ্ত ও আরক্ত হইয়া উঠে, হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হয়, সমস্ত জননযন্ত্রের চতুর্দিক ঘেরিয়া একটা অনিশ্চিত ও অস্বস্তিকর সন্নিবেশের ভাব আসে,—সমস্ত শরীর-মন যেন সুখাবেশে এলাইয়া পড়ে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না সত্যকার সঙ্গম সংঘটন হয়,

* সঙ্গমকাল আশানুরূপ বিলম্বিত হইলে, জগতের প্রায় সকল রমণীই এই রসনিষেকের সঙ্গে-সঙ্গে তজ্জাত 'চরমানন্দ' লাভ করেন। ইহার বিষয় অতঃপর আরো কিছু বলিব।

অথবা তজ্জনিত আনন্দের সে অংশীদার হইতে পারে, ততদিন পর্যন্ত অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তবয়স্কা কোন কুমারীই যথাযথ যৌন-সম্মিলনের জন্য স্বয়ং উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে না।

পুরুষ হাতে-কলমে কাহারো নিকট শিক্ষা না পাইয়াও, স্ত্রী-সহবাসের জন্য ব্যাকুল হইতে পারে; কিন্তু নারীর তাহা নহে। পুরুষের শিক্ষা-সাপেক্ষ আত্মানন্দ ও অন্তানন্দের মধ্য দিয়াই নারীর যৌনবোধ যথোচিত পরিপক্কতা লাভ করে। সেইজন্য জনৈক পাশ্চাত্য যৌন-বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, "Youth spontaneously becomes a man; but the maiden must be kissed into a woman." সুরত-রসে একবার মজিলে, তখন উহার ধ্যানে বা দয়িতের স্পর্শমাত্র যুবতীর বার্থোলিন্ গ্রন্থির রস বিন্দু বিন্দু ঝরিয়া তাহার যোনিপথ সিক্ত করিয়া দেয়; তাহার ক্ষুদ্র ভগপুচ্ছিকা (clitoris) পুরুষের লিঙ্গের ন্যায় কঠিন হইয়া স্পন্দিত হইতে থাকে; ইন্দ্রিয়দ্বার যেন পরিচিত অতিথি-প্রত্যুদ্গমনের আশায় একটা কণ্ডুয়তিকর আবেগে ছট্‌ফট্ করিতে থাকে।

যুবক-যুবতীর আদ্য যৌনবোধে ভিন্নতা

কোন কোন সময় পুরুষ অধিকদূর অগ্রসরে কুণ্ঠিত বা উদাসীন হইলে, নবজাগ্রতা যুবতী তাহাকে নানাভাবে উদ্রিক্ত করিতে চেষ্টা করে, এবং নিজের যৌনক্ষুধা পুরাপুরি না মিটাইয়া পুরুষকে মুক্তি দিতে সম্মত হয় না। অনেক সময় দেখা যায় যে, যে সকল স্বামী তাহাদের যুবতী-পত্নীদিগকে সুরত-স্বর্গের আস্বাদন দান করিয়া, কিছুদিনের জন্য দূর প্রবাসে চলিয়া যান্ অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাঁহাদিগের পত্নীগণ অরমিতা বা অক্ষতযোনি যুবতী-কুমারী কিংবা বালবিধবা অপেক্ষা স্খলিতচরিত্রা বা বিপথগামিনী হন্ অতি সহজে।...নারীর ষোল হইতে আঠার বৎসর বয়সের মধ্যে বিবাহ দেওয়া অর্থাৎ বৈধভাবে পুরুষ সংসর্গ

সংঘটন—কেবল তাহাদের নিজেদের স্বাস্থ্য ও সুখের জন্যই বাঞ্ছনীয় নহে, পুরুষের সুখের দিক্ হইতেও কাম্য।

এই বয়সটি কুমারীর পক্ষে কঠোরতম পরীক্ষার কাল। এমন দৃষ্টান্ত, শুধু আমাদের দেশে কেন, সমগ্র জগতেই বিরল যে, নারী এই সময়টি কায়মনে আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মচর্য পালন কবিয়া চলিয়াছে। তাহার উপর, ইহাও নিঃসঙ্কোচে প্রচার করিতে পারি যে, যে নারী ষোল হইতে আঠার বৎসর বয়সের মধ্যে নিয়মিতভাকে পুরুষ সংসর্গ করিতে পায় নাই, অথবা যে পুরুষ প্রধানত বিবাহের মধ্য দিয়া এই বয়সের নারী-সম্ভোগের সুযোগ পায় নাই, তাহারা যৌন-জীবনের অর্ধেক না হৌক অন্তত ছয় আনা আনন্দাংশ হইতে নিজেদের বঞ্চিত করিয়াছে।

কৈশোরের শেষ দেড় বৎসর বিবাহের মুখ্য কাল বলিয়া ধরা হইলে, যৌবনের প্রথম দেড় বৎসর গৌণ কাল বলিয়া ধরা উচিত; উহার পুর্বে বা পরে বিবাহ হইলে, নানা কারণে সে বিবাহ এক পক্ষ বা উভয় পক্ষের নিকট মনঃপূত না হইতেও পারে; নতুবা প্রথম কিছুদিনের জন্য অথবা চিরকালের মতো স্বামীস্ত্রীর মধ্যে মন ও মতের একটা গরমিল থাকিয়া যায়। যৌবনে পদার্পণ করিয়া প্রায় কুমারীরই একটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধ তীব্রতরভাবে জন্মিতে দেখা যায়। তদুপরি নিতান্ত কুৎসিতা না হইলে, আত্মবিজ্ঞাপনেচ্ছা, আত্মগরিমা, মাৎসর্য ও সকলের প্রতি একটা উপেক্ষা বা তাচ্ছিল্যের ভাব আসিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার মনে বাসে বাঁধে।

তদুপরি, স্কুল-কলেজের ছাত্রী হইলে ত কথা নাই,—অপেক্ষাকৃত অল্প-স্বাধীনতা-ভোগিনী অশিক্ষিতা কুমারীও আত্মীয়স্বজনের প্রতি পূর্বের ন্যায় আর শ্রদ্ধাশীলা থাকিতে পারে না; যুবকদের মতোই তাহাদের আচার-ব্যবহারে সর্বদা একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা যায়। বিশেষভাবে মাতা, দিদিমা, ঠাকুরমা, বর্ষিয়সী পিসীমা প্রভৃতি

বাটীর আত্মীয়াদিগের সহিত কারণে-অকারণে খুটিনাটি লইয়া তর্ক ও ঝগড়া করিতে তাহারা সর্বদা যেন উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। পিতৃগৃহের সামান্য অসুবিধা বা দুঃখকষ্টের বিরুদ্ধে তাহাদের অভিযোগের আর অন্ত থাকে না। অথচ প্রায় সকল যুবতীরই পিতার প্রতি ভক্তি অবিচল থাকে; এমন কি, তাঁহার প্রতি তাহাদের সেবা ও শ্রদ্ধার ভাব পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়া যাইতেও পারে। মনোবিশ্লেষকগণ ইহার সুন্দর যুক্তিযুক্ত কারণাবলী প্রদর্শন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা এস্থলে সম্ভবপর হইবে না।

আর একটি প্রবৃত্তি সতের-আঠার বৎসরের সকল যুবতীর মধ্যেই মাথা নাড়া দিয়া উঠে;—সেটি হইল আমোদ-ঐশ্বর্যের প্রলোভন এবং আপন অঙ্গরাগ-প্রসাধন ও বেশভূষার প্রতি অখণ্ড মনোযোগ। নিতান্ত দরিদ্র প্রেমিক

আড়ম্বরপ্রিয়তা

বা পতিপ্রবরকেও এই সময়টিতে তাহাদের সবচেয়ে বেশী আবদার ও অক্ষমতার গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়—নিত্য নূতন কাপড় চোপড়, অলঙ্কার ও প্রসাধন-সামগ্রীর জন্য। অধুনা সহরের শিক্ষাভিমানিনী যুবতীদিগের মধ্যে অলঙ্কারের স্পৃহা কিঞ্চিৎ হ্রস্বতা প্রাপ্ত হইলেও নূতনতর ফ্যাশনের শাড়ী ও ব্লাউজের প্রতি অনুরাগ যেমন বাড়িয়াছে, তেমনি অন্যদিকে আবার থিয়েটার, চলচ্চিত্র, সার্কাস, প্রদর্শনী, কার্নিভাল, মিটিং, মজলিস, প্রমোদ-ভ্রমণ ইত্যাদির প্রতি তাহাদের কামনা সহস্রমুখী হইয়া পড়িয়াছে।

বর্তমান যুগের নাগরিকা-চরিত্র সম্বন্ধে সুঅভিজ্ঞ একাধিক ব্যক্তি গ্রন্থকারের নিকট রহস্যচ্ছলে একটা চিন্তনীয় সত্যকথা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, নিজের একখানা মোটর গাড়ী ও পকেটে সামান্য দুই-চারিটি টাকা থাকিলে, শহরের তথাকথিত জ্ঞানালোকপ্রাপ্তা বহু যুবতীকে প্রলুব্ধ করিয়া,

স্বচ্ছন্দে বিপথে চালিত করা যায়।...পাশ্চাত্য দেশসমূহে ও আমেরিকার শহুরে যুবক-যুবতীদিগকে অবনতির পথে মোটর গাড়ী যেরূপ দ্রুত অগ্রসর করিয়া দিয়াছে, সেরূপ আর কোন যুগেই কোন যান-বাহনই পারে নাই। প্রমোদানন্দ-লাভের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা যৌবনের ধর্ম; এবং এই ধর্ম নারীর মধ্যে চিরকালই পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর প্রনোদনা জাগাইয়াছে।

কিন্তু ওই ধর্ম-পালনের যে সকল প্রণালী সেকালে উন্মুক্ত ছিল, সেগুলি নীতির তত পরিপন্থী ছিল না—এখন যতটা হইয়াছে। তদুপরি প্রণালী-গুলিও একদিকে যেরূপ নিত্যনূতন ধরণের হইয়া সংখ্যায় বাড়িতেছে, অন্যদিকে তেমনি যুবকযুবতীদের নিকট সেগুলি তদ্রূপ সহজলভ্য হইয়া পড়িতেছে। আবার ছায়াচিত্র ও উপন্যাসের দুর্নীতিকর প্রভাব, অসূয়া ও অনুকরণপ্রিয়তা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ঘরের অসামান্য বা সামান্য রূপময়ী যুবতীকে প্রলোভনের পথে অতি সহজে পরিচালিত করিতে পরে। পারি-বারিক বন্ধন, গুরুজনদিগের শিক্ষাদীক্ষা, শাসন ও সৎপরামর্শ অনেক ক্ষেত্রেই আশানুরূপ কার্যকরী হয় না। ধনাঢ্যদিগের জীবনযাত্রা-প্রণালীর অন্ধ অনুকরণ-স্পৃহার খোরাক্ যোগাইতে, বা অভিজাতবংশীয়া বন্ধুবান্ধবীর চাল-চলনের সহিত সমান পদবিক্ষেপে চলিতে গিয়া, মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র ঘরের যুবতীরা প্রায়ই যখন নিজেদের অসামর্থ্যের বেদনা মর্মে মর্মে অনুভব করে, তখন তাহারা আত্ম-সংযমের বাঁধ যেমন হেলায় ভাঙ্গিয়া দিতে পারে, তেমন বোধহয় খুব কম ভদ্রবংশীয় যুবকই পারে। সেইজন্যই এই সকল দুষ্প্রবৃত্তির কবলগত হইবার পূর্বে, যুবতীদিগের বৈধ প্রণালীতে স্থায়ীভাবে মনামত পুরুষ-সংসর্গ ঘটাইয়া দেওয়া বিধেয়।

আমেরিকাযুক্তপ্রদেশের ছোটবড় শহরগুলিতে মোটর-গাড়ীতে চড়িয়া আমোদ-ভ্রমণের বাতিক কিশোর-কিশোরীদিগকেও কিরূপ পাইয়া

বসিয়াছে এবং এই আমোদ-ভ্রমণ কিরূপ বিস্ময়কর ত্রস্ততায় 'প্রমোদ-বিহারে' পরিণত হইতেছে, তাঁহার সজীব শিক্ষাগর্ভ কাহিনী জজ্ বেন্ লিণ্ড্সে তাহার "Revolt of Modern Youth" নামধেয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুবিখ্যাত ইয়াঙ্কী যৌন বৈজ্ঞানিক ডাঃ বার্নাড্ ট্যাল্মি বলিয়াছেন, "The automobile has caused the ruin of more respectable girls than all the poverty of the slums has ever been able to accomplish."...ঘরের গাড়ী, নিদেন্ পক্ষে ট্যাক্সী-বাসে অবাধ ভ্রমণ, কার্জন পার্ক, ইডেন্ গার্ডেন্, ঢাকুরিয়া হ্রদ, চিত্রগৃহের আকর্ষণ ও সহাধ্যয়নের উপাদেয় ধুয়া আমাদের দেশেও অসংযমের অগ্নিবীণায় যে অশ্রুতপূর্ব ঝঙ্কার তুলিয়াছে, তাহা নিতান্ত বধিরেরও কানের ভিতর দিয়া অহরহ মরমে পশিতেছে।...

প্রথম যৌবনে যাহারা বিবাহের বাহিরে পুরুষ-সংসর্গ পায়, তাহারা অচিরে প্রথম প্রেমিককে বিবাহ করিবার সুযোগ পায় ত ভালই, নচেৎ এক পুরুষে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না—যুগপৎ বা ক্রমান্বয়ে একাধিক পুরুষের হৃদয়-পরীক্ষার নিমিত্ত নিজেকে সুলভ করিয়া আনন্দ লাভ করে।

ক্ষতযোনি যুবতী-কুমারীর স্বভাব

অথচ প্রায়ই তাহার এই বাহ্যিক আত্মদানের মধ্যে লুকাইয়া থাকে—তাহার আত্মকাম, ক্ষমতাপ্রিয়তা ও নিজেকে জাহীর করিবার অদম্য এষণা। ইহাদের যৌনবোধ যথেষ্ট সজাগ হইলেও যৌনক্ষুধা সহজে পরিতৃপ্ত হইতে পারে না এবং উহার প্রসাদন বহু বাহ্যিক কার্যকারকতার উপর নির্ভর করে। ভালবাসার অভিনয় করিতে করিতে অনেক সময় ইহারা হয়ত সত্যকার ভালবাসা হইতে দূরে সরিয়া যায়, নচেৎ অনাগত প্রেমিকের আদর্শ তৈয়ারী করিয়া রাখে অসম্ভব উচ্চে। শেষে আদর্শের অন্বেষণে পরিশ্রান্ত হইয়া, তাহারা মনে মনে ঘোরতর

পুরুষবিদ্বেষী হইয়া উঠে; জীবনে কোন পুরুষকেই আর প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারে না। অতঃপর লোক-সমাজে সর্বতোভাবে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত কোন্ স্বামীরত্ন লাভ করিয়াও এই সকল যুবতী প্রায়শ খুশী হয় না; ক্ষ্যাপার পরশ-পাথর খোঁজার মত তাহাদের মনের মতো পুরুষ লাভের প্রয়াস তখনো সমান টানে চলিতে থাকে।

আবার হয়ত কেহ কেহ সারা জীবনই অবিবাহিত থাকিয়া; পুরুষজনোচিত জীবিকা-নির্বাহের কার্যে আত্মনিয়োগ করে। কেহ হয়ত বা পুরুষসুলভ কৈশোরের কদভ্যাসগুলি অর্থাৎ সমমেহন, স্বমেহনাদিতে নিজেদের বিকৃত যৌনক্ষুধার তৃপ্তিবিধান করিতে থাকে। নারীদের মধ্যে এই অভ্যাসগুলি যে গঠিত হইতে পারে, এ ধারণা অনেক পুরুষেরই বোধহয় নাই। কিন্তু তৎসম্বন্ধে অনেক কিছু বলিবার আছে বলিয়া, পরে একটি পৃথক অধ্যায় আমরা নিয়োজিত করিব।

যাহাহউক, একটি কথা এই সূত্রে ধ্রুবসত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়া লইতে হইবে, যে সকল যুবতী একাধিক পুরুষকে লইয়া নাড়াচাড়া করে, অতিরিক্ত যৌন-ক্ষুধার তাড়নাই যে তাহাদিগকে সাধারণত ক্ষিপ্ত করিয়া তুলে, এরূপ মনে করা অন্যায়। পূর্বে বলিয়াছি, এখনো বলিতেছি, নিজের বিলাসপ্রিয়তা, সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া ব্যাপক ও বিচিত্র সুখ-ভোগের অভিলাষ তাহাদিগকে প্রায়শ পুরুষের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে উদ্দীপিত করে। পুরুষকে ইহারা চায় ও পায় তাহাদের ভোগরাগের মুগ্ধ নিষ্প্রাণ যন্ত্ররূপে; তাহার লালসাচাঞ্চল্য—তাহার বিভ্রান্তি—তাহার আত্মসমর্পণের সকরুণ মোহ, এই সকল নারীর নীরব আত্মপ্রসাদের ইন্ধন যোগায় মাত্র!

যে সকল অবিবাহিত নবযুবতী বাহিরের পুরুষ-সংসর্গে আসিবার সুযোগ বা স্বাধীনতা পায় না, স্কুল-কলেজ বা হোস্টেলের বালাই যাহাদের

নাই, মাতার শাসনবাক্য ও সতর্ক-চক্ষু যাহাদিগকে উদ্যতফণ ভুজঙ্গের মতো দিবারাত্র পাহারা দিতেছে, তাহাদের স্বমেহনাদির প্রবৃত্তি স্বতঃই জাগিতে পারে ; নচেৎ গৃহশিক্ষক, দূর বা নিকটসম্পর্কীয় যুবক-আত্মীয় প্রভৃতির সহিত তাহাদের নবজাগ্রত মন ঘনিষ্ঠতা পাতাইবার জন্য সহজেই সচেষ্ট হইতে পারে। গুরুজনের শাসন বা সতর্কতাকে প্রতারিত করিবার সহস্র উপায় ও অছিলা তখন তাহারা উদ্ভাবন করিতে পারে অতি চমৎকার কৌশলে।

যাহাদের বিবেক বা পারিবারিক সদাচারের উচ্চাদর্শ—হৃদয়ের ওই তীব্র যৌনপ্রগতির পথে হন্তারক হয়, তাহাদের মধ্যে ক্রমে একটা ব্যর্থতা ও জীবনে বিতৃষ্ণা-বোধ আসে, বিশ্বপ্রকৃতির অবিনশ্বর রূপৈশ্বর্য ও মানব-সমাজের একটানা আনন্দস্রোতের মাঝখানে সে নিজেকে নিতান্ত অসহায় ও উদ্দেশ্যহীন বলিয়া মনে করে। তাহার অন্তরে যেন একটা অপরূপ romanticism ও ভাবভূয়িষ্ঠতা সঞ্চারিত হয় ; নিজেকে সে ক্রমশ গুটাইয়া আনে। জার্মান্ দার্শনিকগণ যৌবনের এই অবস্থার নাম দিয়াছেন 'Weltschmerz'. অনেক সময় তাহারা নিরালে বসিয়া কাঁদে ; সামান্য কারণে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে ; কেহ কেহ বা ফিটের ব্যায়রামে আক্রান্ত হয়। দারুণ অভিমান, ঘোরতর আলস্য ও বিষম বাৎসল্য-বিরাগ ইহাদের ব্যর্থযৌবনের চরম লক্ষণাবলী। ঋতুও হয় ইহাদের অত্যন্ত অনিয়মিত ; তৎফলে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, পৃষ্ঠ ও কুক্ষিবেদনা, শিরঃপীড়া, অস্থৈর্য প্রভৃতি নানা উপসর্গ দেখা দেয়। পরিশেষে আত্মবিনাশের প্রবৃত্তি জাগাও কিছু অস্বাভাবিক নহে।...

এইবার আমরা যথাকালে-বিবাহিতা পূর্ণযুবতীদের স্বাভাবিক যৌন-জীবনের প্রসঙ্গ আরম্ভ করি।...যৌনসম্মিলনে অল্পবিস্তর পশ্চাদ্গামীতা ও নিষ্ক্রিয়তা প্রকাশ করা স্ত্রীলোকের যৌনজীবনের একটি বিশেষত্ব, সত্য।

জগতের সর্বকালীন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণই এই জায়গায় একমত। এ বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে এইটুকু নূতন তথ্য সংযোজন করিতে পারি যে, পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের মধ্যেই রতি-ক্রিয়াকালীন্ কর্মিষ্ঠতা ও নিশ্চেষ্টতার প্রবৃত্তি সংগুপ্ত থাকে। তবে স্বভাবত পুরুষের মধ্যে কর্মিষ্ঠতার ভাগ বেশী, স্ত্রীলোকের মধ্যে কম; তেমনি আবার স্ত্রীলোকের ভিতর নিশ্চেষ্টতার ভাগ বেশী, পুরুষের ভিতর কম। আমাদের দেশে ঋতু-দর্শনের অব্যবহিত পূর্বে বা পরেই অধিকাংশ বালিকার অদ্যাপি বিবাহ হইয়া যায়। প্রায় সকল ভর্তাই ঋতু-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীতে অভিরত হন্; আবার কোন কোন ধৈর্যহীন পুরুষ তৎপূর্বেই রতিদেবীর রুদ্ধ মন্দির-দ্বারে অযথা করাঘাত করিতে থাকেন। পূর্বেই বলিয়াছি, আদ্যঋতু দর্শনের এক হইতে দেড় বৎসর পর পর্যন্ত কিশোরীরা যৌন-জীবনের একটা প্রাণস্পর্শী সাড়া ও সুরত-ব্যাপারে আংশিক আনন্দানুভূতিও পায় না। কাযেই ওই অকাল-সহবাসে তাহারা কষ্ট ও বিরক্তি-বোধ, নচেৎ নিশ্চেষ্ট উদাসীনতা প্রকাশ করে। ইহাকে আমরা স্বভাবগত নিষ্ক্রিয়তা বলিতে রাজী নহি।

যৌন-সম্মিলনে নিষ্ক্রিয়তা

যখন স্বামীর প্রতি নারীর মমত্ব ও গভীর যৌনবোধ (১৬-১৮ বৎসর বয়সের ভিতর) জন্মে, তখন রতিক্রিয়ার মাঝামাঝি বা শেষাশেষি সময়ে তাঁহারা কটি-নিতম্ব আন্দোলন, কঠিন বাহু বেষ্টন, চুম্বন-দংশনাদি দ্বারা পুরুষের সক্রিয়তার যোগ্য প্রতিদান দিতে সহজভাবেই চেষ্টা করেন। হিন্দু ও মুসলমান ঘরের অতিরিক্ত লজ্জাশীলা কোনো কোনো যুবতী-বধূ এই স্বভাবজাত উদ্যমকে জোর করিয়া চাপিয়া রাখেন—কেবল এই ভয়ে, পাছে তাঁহাদের এই 'বেহায়াপনা' স্বামীপ্রবরের নিকট নিতান্ত অশোভন প্রতীয়মান হয়।

এইরূপ অনেক দৃষ্টান্তের কথা জানি যে, পরিপূর্ণ যৌনবোধ জাগ্রত

হইবার পর স্বামী যদি সময়মতো তাহাদের পিপাসা চরিতার্থ না করেন, তাহাহইলে পত্নী নিদ্রিত-স্বামীকে নাড়া দিয়া, চিম্‌টি কাটিয়া বা অন্য কোন অছিলায় জাগাইয়া তুলে ; তারপর নানাবিধ গৌণ উপায়ে তাঁহাদের কামোদ্রেক্ করিবার চেষ্টা করে। নারী যৌনপ্রবুদ্ধা

সক্রিয়তা অস্বাভাবিক নহে

হইলে ও পুরুষের প্রেমের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসবতী থাকিলে, সহবাসের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত জড়বৎ নিচেষ্ট থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। যিনি প্রতি রমণের আগাগোড়াই এই নিশ্চেষ্টতার ভাব দেখাইয়া চলেন, বুঝিতে হইবে যে, হয় তিনি যৌনবোধ-পরিশূন্যা, নচেৎ উপগত পুরুষটি তাঁহাকে আনন্দ দিতে অসমর্থ। অত্যন্ত প্রেমশীলা রমণী কোনো কোনো সময় রতি-বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা সাহসী ও অগ্রবর্তিনী হইয়া থাকেন।

ভারতচন্দ্র-বর্ণিত বিদ্যাসুন্দরের "বিপরীত বিহারের" সহজ অভিনয় বহু দম্পতি বহুকাল হইতেই স্বেচ্ছা-প্রণোদিতভাবে করিয়া আসিতেছেন ; তাঁহাকে নারী-স্বাধীনতা-যুগের আবহাওয়া-পুষ্ট অশালীনতার অন্যতম দৃষ্টান্ত বলিয়া দোষ দিলে চলিবে না। আমরা এরূপ একাধিক কেস্ জানি, যেখানে অন্যান্য বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়া পরিগণিতা রমণী সহবাসকালে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য বিপরীত বিহার ব্যতীত পূর্ণপরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না। পাশ্চাত্য দেশে ত এরূপ কেসের সংখ্যা নির্ণয়ই করা যায় না। জয়দেব তাঁহার "গীতগোবিন্দের" একস্থলে ও বিদ্যাপতি প্রমুখ পদকর্তারা বহুস্থলে শ্রীমতীর দ্বারা বিপরীত বিহার করাইয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের 'বৈকুণ্ঠের গানে' বাস্তবেরই প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে *।

* "গীতগোবিন্দে" 'কিশলয় শয়নতলে কুরু কামিনী' শীর্ষক পদ ও "বৈষ্ণব পদাবলীতে"র ৭০ পৃষ্ঠাস্থিত ১০৩তম পদটি দেখুন।

দুই সহস্র বৎসর কাল পূর্বে কামকলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাখ্যাতা, ঋষি বাৎস্যায়ন রতি-ব্যাপারে নারীর পুরুষবৎ আচরণকে "পুরুষায়িত" সংজ্ঞা দান করিয়া, একটি স্বতন্ত্র প্রকরণে উহার বিস্তৃত ব্যবহার লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সূত্রে যশোধরেন্দ্র তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন, "পূর্বে নায়ক যে সকল চেষ্টা দেখাইয়াছিল, নায়িকা কেশকুসুম ছড়াইয়া, শ্বাসের বিচ্ছেদে বিচ্ছেদে হাসিয়া হাসিয়া, চুম্বনচেষ্টায় স্তনযুগদ্বারা বক্ষঃপীড়া উৎপাদন করিয়া, বারংবার মস্তক নামাইয়া, সেই সকল চেষ্টা আবার নায়ককে প্রদর্শন করিবে। 'যেমন তুমি আমাকে নীচে ফেলিয়া ক্লেশ দিয়াছ, এইবার আমিও তোমাকে পাড়িয়া ফেলিয়া প্রতিশোধ দিব—' এইরূপ বলিয়া হাস্য করিবে, তর্জন-গর্জন করিবে ও প্রতিঘাত করিবে। আবার মধ্যে মধ্যে স্বীয় স্বভাবসুলভ লজ্জাভাবও দেখাইবে। শ্রান্ত না হইলেও শ্রম দেখাইবে। রমণ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও বিরামের ইচ্ছা প্রকাশ করিবে। তারপর যেরূপ পুরুষে উপসর্পণ করে, সেইরূপ করিতে থাকিবে *।"...

বাৎস্যায়নের পুরুষায়িত

বিবাহিত বালিকা মোটামুটি সাড়ে তের-চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতে সুরতের স্বাদ একটু একটু করিয়া পাইতে থাকে। কিন্তু এই সময়ের পূর্বে উপসর্পণ-কালে সুখবোধের অভাব বশত যে বালিকা আন্তরিকভাবে বাধা দান করিয়াছিল, এই সুখ-বোধ জন্মানোর পরই সেই বালিকা মনের মধ্যে বেশ একটু প্রখর লিপ্সা পোষণ করিয়াই স্বামীর প্রত্যেক উপক্রমের সময় একটু সলজ্জ বাধার ভাব দেখায়। কিন্তু এই বাহ্য বাধা-দানের উগ্রতা ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসে ; এবং চতুর

সত্য ও মিথ্যা প্রত্যাখ্যান

* কামসূত্রম্, মহেশচন্দ্র পালের বাঙ্গালা সং (১৩১৩ সাল), ৫৯৬ পৃষ্ঠা।

স্বামী যদি ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার রঙ্গ-চটুল প্রত্যাখ্যানের পথ ধরিয়া সোহাগের ডালি হস্তে ধৈর্য সহকারে দৌড়াইতে পারেন, তাহা হইলে সিদ্ধি অনিবার্য।

যুবতীর যৌন-জীবনের আগাগোড়া এই ছলনাময় প্রত্যাখ্যানের ভাব অল্পাধিক বর্তমান থাকে। তাহার অনিচ্ছার "না" শব্দটি যখন ক্রমশ মৃদু হইতে কঠিনতর হইয়া উঠে ও তাহার বাধা-দানের সচেষ্টতা ২।১ মিনিটের মধ্যে দুর্বল হইয়া পড়ে না, তখন বুঝিতে হইবে—বাস্তবিকই তাঁহার মনে আসঙ্গ-লিপ্সার অভাব। কিন্তু বারবার জিজ্ঞাসায় যে "না" শব্দটি ক্রমশ উচ্চতর স্বর-গ্রাম হইতে নিম্নে নামিয়া আসিয়া শেষে ওষ্ঠপ্রান্তে বিলীন হইয়া যাইতেছে, হস্তপদাদি-দ্বারা বাধাদানের শক্তি দুই এক মিনিট্ পরিচালনের পর ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া গেল, তখন বুঝিতে হইবে—উহা নারীর চিরমধুময় রহস্য-যবনিকা, উহার পশ্চাতেই তাহার উদগ্র পিপাসা সহস্র সহাস্য ওষ্ঠপুট মেলিয়া বসিয়া রহিয়াছে!

রতি-সম্মতির ভাষা

অভিধান-বিরুদ্ধ হইলেও, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, নারীর যৌন-জীবনে অনেক সময় "না" শব্দটি স্বীকারাত্মক্ হইয়া দাঁড়ায়। এই "না" শব্দটির মনস্তত্ব লক্ষ্য করিয়া, জনৈক আদিরসের প্রাচীন কবি বলিয়া গিয়াছেন—

নবা কাঞ্চী নোবা কটকমমলং বক্ষসি পুন
র্নবা মুক্তাহারং হারো বিকসিত রুচির্ভাতিহি তথা।
যথা রত্যারম্ভে দৃঢ়তর পরিরম্ভ-সময়ে
ন-কারোলঙ্কারো বদন-সরদিন্দৌ মৃগীদৃশাং॥

[অর্থ—রমণীর চন্দ্রহার বা 'গোট্', সুন্দর বলয় অথবা বক্ষের মুক্তাহার সেরূপ শোভা পায় না, যেরূপ রতি-আরম্ভ-কালে প্রগাঢ় আলিঙ্গন-সময়ে

মৃগীদৃশা রমণীর বদন-সরসিজ হইতে ঐ 'না' শব্দটি অলঙ্কারের ন্যায় বিকসিত হইয়া উঠে।]

আসঙ্গ-লিপ্সায় যৌনপ্রবুদ্ধা রমণীর 'বুক্ ফাটে ত মুখ ফোটে না'—খাঁটি সত্য কথা, এবং এই সূত্রে কথাটি যেরূপ প্রযোজ্য, অন্যত্র সেরূপ নহে। তাঁহারা কামেচ্ছা কখনো ভাষায় প্রকাশ করেন না, হাব-ভাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন মাত্র; আর ঐ ভাব বেশ নিবিড়ভাবে ফুটিয়া উঠে তাঁহাদের নয়নযুগলে। সেক্স্‌পীয়ার তাঁহার 'মার্চেণ্ট্ অব্ ভিনিস্'-এ পোর্সিয়ার প্রেম-অঙ্কুরিত হওয়ার পরিচয়-প্রসঙ্গে যে বলিয়াছেন—

প্রেমের মূক বাণী—চক্ষে

"she sent speechless messages to his heart," সে ত ওই চোখের মধ্যবর্তিতায়ই! সমঝ্‌দার প্রেমিক পুরুষ এই নয়নের ভাষা পড়িয়াই বুঝিতে পারেন—নারীর হৃদয়ে এখন বসন্তের মলয়—না, কাল-বৈশাখীর পাগল ঝড় বহিতেছে! "ঢুলু ঢুলু দুটি নয়ান-নাচনি চাহনি মদন বানে। তেরছ বন্ধনে বিষম সন্ধানে মরমে বরজ হানে।"…বৈষ্ণব-কবিদের এই সকল পদপংক্তি নারীর প্রেম-জীবনে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

প্রেমের আমন্ত্রণ করিতে নারী অদূর হইতে শুধু চক্ষু-চালনা করিয়াই ক্ষান্ত হন্ না। আরো যে কতরূপ আকার-ইঙ্গিত-ভাবভঙ্গী প্রকাশ করেন, তাহার চূড়ান্ত চিত্র কামসূত্রকার বহুকাল পূর্বেই অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। তদুপরি কালিদাস, ভারবী, ভবভূতি [illegible]স, বররুচি প্রমুখ প্রাচীন

প্রেম-জ্ঞাপনের প্রণালীসমূহ

কবিগণ, মধ্যযুগের পদকর্তাগণ এবং আধুনিক যুগের উপন্যাসকারবৃন্দ নানা কৌশলে নানা ভঙ্গিমায় সজীবভাবে উহা বিবৃত করিতে কুণ্ঠিত হন্ নাই। প্রসঙ্গক্রমে দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলে বোধহয় মন্দ হইবে না।

জনৈকা সুরসিকা যুবতী কোন পুরুষ সম্বন্ধে তাহার সখীর কানে-কানে বলিতেছেন :—

"আলোলিলোচনমচালি হৃদোত্তকূল
মুদ্বাহুমূলমনুকূলমিতঃ কিমীহে।
এতেন চেতিতমনেন ন চেৎ কিমালি
নীরেন নীরসতরোরভিসেচনেন ॥"

[অর্থ—লোচন চালনা করিলাম, বক্ষের বসন একবার সরাইয়া আবার টানিয়া পরিলাম, বাহুমূল উঠাইয়া দিলাম ; ইহাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা আর কি হইতে পারে ? লো সখি, ইহাতেও যাহার চৈতন্য না হয়, তাহাকে আর কি দিয়া সচেতন করিব ? নীরস তরুতে বারি-সিঞ্চনের ন্যায় উহা নিস্ফল।]

"বারবার চোলি-বন্ধ্ খোরে।
নিরখি শ্যাম্কো হসি মুখ মোরে ॥
শ্যামদাস কহে ঝলক্ দেখায়কে
এইসি যাদু ডারি ॥"

[চোলি-বন্ধ্ খোরে=রসজ্ঞা রাধিকা কাঁচুলির বোতাম খোলেন্ আর বন্ধ করেন ; মোরে = ফিরাইয়া লন্।]...সঙ্গমের পূর্বে এই-যে ছলা-কলা, চটুল চাহনি, আড়-আড়-ছাড়-ছাড় ভাব, বিলাস-বিভ্রম...এইগুলি যুবতীর প্রণয়-জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ এবং মূল আসঙ্গ-ব্যাপারের আবশ্যকীয় গৌরচন্দ্রিকা। এ গৌরচন্দ্রিকা যতই অগ্রসর হয়, ততই পুরুষ একদিকে যেমন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, নারীর মধ্যেও তেমনি অতনু কাম তুষের আগুনের মত তলে তলে প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া জ্বলিতে থাকে।

ইংরাজী ভাষায় coquetry বা flirtation অর্থে ব্যবহার হয় এবং একটি শব্দের মধ্যে এতখানি তাৎপর্য সংগুপ্ত থাকে, সংস্কৃত, পালি বা

বাঙ্গালা ভাষায় ঠিক্ সেইরূপ একটি শব্দ খুঁজিয়া পাওয়া দুঃসাধ্য। অথচ আবহমানকাল হইতে ভারতীয় নাটকে, কাব্যে, ইতিহাসে, উপন্যাসে ও বাস্তব জীবনে যুবক-যুবতীদের মধ্যে flirtationয়ের অভাব ছিল না ও এখনো কিছু অভাব নাই; বরং পাশ্চাত্য সভ্যতার আওতায় উহার বিভিন্ন ধরণ ও কার্যক্ষেত্র বাড়িয়া গিয়াছে।

ঠাট্-ঠমক্ বা FLIRTATION

অনেক সময় আমাদের ভাষায় লীলাবিভ্রম, ভাব-চটুলতা, রাগভঙ্গিমা, ঠাট্-ঠমক্, ঠসক্, রঙ্ঢঙ্ প্রভৃতি দ্বারা ইংরাজী ঐ শব্দটির অর্থ প্রকাশ করা হয়। ঠাট্-ঠমক্ অসময়ে ও অপাত্রে প্রদর্শন করিলে, অথবা মাত্রা ছাড়াইয়া গেলেই আমরা উহাকে অভদ্র ভাষায় 'ছেনালি' বলিয়া ঘৃণা ও বিদ্রূপ করি। ঠাট্-ঠমক্ যৌনভাবাবেগের বাহ্য ইঙ্গিত বা বিজ্ঞাপন বলিয়া পরিচিত হইলেও উহা যে রমণীদেরই একচেটিয়া—এরূপ কথা বলা চলে না এবং সকল সময়ই যে ইচ্ছাপ্রসূত—তাহাও মনে করা অনুচিত। কন্বমুনির আশ্রমে শকুন্তলা দুষ্মন্তকে দেখিয়া যে ভাবভঙ্গী দেখাইয়াছিল, তাহা প্রেম-জাগৃতির দ্যোতক বটে, কিন্তু তাহা যেমন স্বতোৎসারিত, তেমনি স্বভাবমধুর। তাহার flirtationএর মধ্যে ছিল দর্শন ও স্পর্শনলাভের একটা অহেতুক্ ও আকস্মিক্ আবেগ, ও এই আবেগ তীব্র আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তজ্জনিত একটা অবিরাম ব্রীড়াভাব।

আর একটা কথা। কামাতুরা হইয়া, অথবা পুরুষবিশেষের প্রতি সত্য সত্য আকৃষ্ট হইয়াই যে স্ত্রীলোক সর্বদা ঠাট্-ঠমক্ দেখান, এমন কিছু কথা নাই। কেবলমাত্র নিজের সৌন্দর্য দেখাইবার বাহাদুরীর জন্য, পুরুষকে এতদ্বারা রাগচঞ্চল করিয়া কৌতুক দেখিবার জন্য, অথবা নিজের দেহ-মনকে যথোচিত কামোপভোগের অবস্থায় আনয়ন করিবার জন্যও অনেক সময় তাঁহারা লীলাবিভ্রম দেখান ও লজ্জার মনোরম অভিনয় করেন। পুরুষের

ধৈর্য, একাগ্রতা ও বিশ্বস্ততা পরীক্ষার জন্যও কোন কোন রমণীকেও ঠাট্-ঠমকের আশ্রয় লইতে দেখা যায় : এতদ্বারা তাঁহারা পুরুষের নিকট ধরা দিয়াও ধরা দেন না ; ধরা যদি আদৌ দেন্ তো ধীরে ধীরে—ধাপে ধাপে। তাঁহাদের লীলাচাঞ্চল্য যেন আলেয়ার আলো,—স্থিরতা নাই, নিশ্চয়তা নাই, সর্বদা একটা খেয়ালী হেঁয়ালির ছন্দে নৃত্যদোদুল্।

রূপসী নারীর অতিরিক্ত লীলাবিভ্রমে কোন কোন পুরুষ সাময়িকভাবে ক্ষিপ্ত, অসংযত ও অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে ; এমন কি, কাহারো কাহারো এরূপ উদ্বেল অবস্থার উদ্রেক করিতে পারে যে, কিছুক্ষণ দর্শনের ফলে বা স্পর্শনমাত্র বীর্যস্খলন হইয়া যায়। অবশ্য ডন্ জুয়ান্ বা ক্যাসানোভা ছাঁদের এরূপ বৈশিক পুরুষও আছে (অবশ্য সংখ্যায় অল্প), যাহাদের সত্যকার বা ভান-করা রাগভঙ্গিমা দেখিয়া, বা দুই চারিটা হাস্য-পরিহাসের কথা শুনিয়া, বহু রমণী হয় মনে মনে তাহাদের গোঁড়া ভক্ত হইয়া উঠে, নচেৎ অনুকূল পরিবেশের মধ্যে তাহাকে প্রেমিকরূপে পাইবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস করে। স্বপ্নে ও জাগরণে তাহার সঙ্গসুখ কল্পনা করিবার ফলে ইহাদের বার্থোলিন্ গ্রন্থি হইতে রসনিষেকও হয়।

শিক্ষা, রুচি ও সমাজ-ভেদে ঠাট্-ঠমক্ ও রাগভঙ্গিমার তারতম্য দেখা যায়। আবার মদ্যাদি পানের দ্বারা উহার মধুরিমা ও সূক্ষ্মরসবোধ অনেকখানি কমিয়া যায়। পরিচ্ছদ-পরিধানের কায়দা, বেণী বাঁধিবার ভঙ্গিমা, চলিবার ছাঁদ, বলিবার ঢঙ্, নৃত্যগীত-নৈপুণ্য, মৌলিক রহস্যবাণী, অঙ্গরাগের বিশেষত্ব প্রভৃতি-দ্বারা নারী পুরুষের নিকট প্রেয় ও কাম্য হইবার সাধনা করে। তদুপরি নয়নের একটু মুগ্ধ চটুল দৃষ্টি ও করতল বা অন্য কোন লোভনীয় অঙ্গদ্বারা ক্ষণিকের স্পর্শ যুক্ত হইলে ত কথাই নাই *।

* বৌদ্ধ জাতক ও কামসূত্র স্ত্রীলোকের প্রেমানুকূল ভাবভঙ্গিমাগুলি নিখুঁতভাবে

পুরুষ অসহিষ্ণু, হঠকারী ও অতিসাহসী হইয়া অনেক সময় নারীর স্বভাবসঙ্গত লীলালাস্যের ভাবমাধুর্য নষ্ট করিয়া দেয়; হয়ত বা নিজের অবিমৃষ্যকারিতায় নারীর নিকট অপ্রিয় হইয়া পড়ে। অশিক্ষিতের মধ্যে অশ্লীল বিদ্রূপ, বস্ত্র-আকর্ষণ, অঙ্গ-সম্পীড়ন, চুম্বন, আলিঙ্গন, জননেন্দ্রিয়-প্রদর্শন ও নানাপ্রকার ইতর ইসারা যেখানে flirtationয়ের স্থান অধিকার করে, শিক্ষিতের মধ্যে তাহার মার্জিত বিকাশ দেখা যায়—অঋজু, ভাবগর্ভ, দর্শনলব্ধ ও দ্ব্যর্থবোধক কথাবার্তা ও ঘনিষ্ঠের ন্যায় সহজ সুষ্ঠু ছোটখাট আচার-ব্যবহারের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে', 'গোরা' ও 'নষ্টনীড়ে', শরৎচন্দ্রের 'দত্তা', 'চরিত্রহীন' ও 'শেষপ্রশ্নে', প্রভাতচন্দ্রের 'নবীন সন্ন্যাসী', 'সিন্দুর কৌটা', 'গরীব স্বামী' প্রভৃতি, শচীন্দ্রবাবুর 'ঝড়ের রাতে' নামক নাটকে এবং বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য, প্রবোধ, প্রেমেন্দ্রের উপন্যাসাবলীর নারীচরিত্রে আমরা এইরূপ উচ্চাঙ্গের লীলাবিভ্রমের সন্ধান পাই।

স্বভাবের অন্যান্য দিক্‌গুলিতে প্রত্যেক রমণীর মধ্যে কিছু-না-কিছু

পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন। এই সকল ছলাকলার মধ্যে প্রধান চল্লিশটির নামোল্লেখ জাতকে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ এস্থলে এই কারণে প্রয়োজনীয় যে, ভারতের তথা জগতের সকল চতুরা নারী এখনো তদ্দ্বারা তাঁহাদের অন্তরের উদ্দীপিত কামনার পরোক্ষ পরিচয় দিয়া থাকেন; যথা,— হঠাৎ অত্যন্ত ক্রিয়া-চাঞ্চল্য প্রকাশ করা, লাজরক্তিম মুখে নীচু হইয়া পড়া, একটি জঙ্ঘার উপর অন্য জঙ্ঘা স্থাপন করা, ছড়ি, কাঠি বা লম্বা কোন জিনিষ দ্বারা ভূমিতলে আঁচড় কাটা, শিশুকে তুলিয়া ধরিয়া উচ্চাবচভাবে নাচান ও তাহাকে পুনঃপুন চুম্বন করা, ক্রমান্বয়ে একবার অত্যন্ত উচ্চগ্রামে ও অন্যবার অত্যন্ত নিম্নস্বরে সুস্পষ্ট বা অসংযত, অস্পষ্ট বাক্য বলা, প্রেমের গান গাহিয়া শুনান, নিত্যনূতন বসনভূষণ ও বেশবিন্যাস দ্বারা দয়িতের মনোযোগ আকর্ষণের প্রয়াস; অসতর্কতা বা অন্যমনস্কতাবশতঃ করিয়া পদোর্দ্ধভাগ, বক্ষস্থল, নাভিমূল বা কক্ষদেশ অসংবৃত করিয়া রাখা ও সচকিত হইয়া তাহা ঢাকিয়া ফেলা, ভ্রূযুগ উঠাইয়া আলস্যের জড়িমায় চক্ষু মুদ্রিত করা, অধর ও জিহ্বাগ্র দংশন করা… ইত্যাদি। [Fausboll, The Jatakas V, pp. 433—434.]

পার্থক্য থাকিলেও, কামোদ্রেক বিষয়ে তাহাদের সকলেরই কতকগুলি সাধারণ বাহ্য লক্ষণ আছে। সে লক্ষণগুলি এখানে উল্লেখ করিয়া গেলে বোধহয় কিছু অসঙ্গতি হইবে না। এই লক্ষণগুলির কতক-গুলি অবশ্য ইচ্ছাপ্রসূত, কতকগুলি আবার স্বতোৎপন্ন। অবশ্য অপূর্বরতা বা লজ্জা-কাতরা নবপ্রেমিকার মধ্যে নিম্নোক্ত সকল বা অধিকাংশ ভাব-লক্ষণই পরিস্ফুট দেখিতে আশা করা সমীচীন নহে।

কামেচ্ছার বাহ্য লক্ষণাবলী

রমণীগণ কাম-পীড়িতা হইলে, তাহারা অধিকতর প্রগল্‌ভা হইয়া স্বামী বা প্রেমিককে সমুৎসুক শিষ্যার মতো কাম সম্বন্ধীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে; নানাভাবে তাঁহার প্রশংসা করে, নানা অঙ্গে হস্তার্পণ করে, হয় তো সুড়্‌সুড়ি দেয়, আদর-সোহাগ করে; বক্ষ বা অধোদেশের কতকাংশ হইতে যেন একান্ত অনবধানতা বশত বস্ত্র অপসৃত করিয়া ফেলে; তাহাদের মুখমণ্ডল অত্যন্ত উৎফুল্ল ও লোহিতাভ হয়, চক্ষু বেশ উজ্জ্বল, গভীর ভাবব্যঞ্জক অথচ আবেশময় দেখায়; স্তন স্ফীত ও স্তনবৃন্ত কঠিন হইয়া উঠে। অধরোষ্ঠ একটু দৃঢ় ও অননুভবনীয়ভাবে কম্পিত হয়, ঘন-ঘন শ্বাস বহে, গাত্র-তাপ ঈষৎ বর্ধিত হয়, কখনো পদাঙ্গুলি কাঁপিতে থাকে; প্রেমিকের গাত্রের উপর হয়তো সে এলাইয়া পড়ে অথবা হস্ত বা পদদ্বয় ন্যস্ত করে। শেষাশেষি সময়ে, কণ্ঠ ভার ও তালু শুষ্ক হয়; স্বর কম্পিত, মৃদু ও গদ্‌গদ হয়, কথাবার্তা ক্রমশ যেন অসংবদ্ধ ও অস্ফুট হইয়া পড়ে।

এই সময় পুরুষকে উদ্যোগী হইতেই হয়, নচেৎ নারীর নিকট তাঁহার মানও থাকে না—নারীর অকপট অনবচ্ছিন্ন প্রেমের পূর্ণ অধিকারীও তিনি হইতে পারেন না।

পঞ্চম প্রপাঠ

যৌনক্ষুধার বৈশিষ্ট্য

পুরুষের সহিত যৌনক্ষুধার তুলনা

নারীর যৌনবোধ ও যৌনক্ষুধা পুরুষের চেয়ে বেশী না কম, এই প্রশ্ন মানব-সভ্যতার প্রভাতকাল হইতেই মনীষীদিগের বিচারবুদ্ধি আলোড়িত করিয়া আসিতেছে। কন্‌ফুসিয়াস্ হইতে হজরৎ মোহাম্মদ, বুদ্ধ হইতে মার্টিন্ লুথার, হার্বার্ট্ স্পেন্সার হইতে ফ্রয়েড্—উপনিষৎ হইতে ওল্ড টেস্‌টেমেণ্ট, পুরাণ হইতে জাতক, অবদান হইতে বিদ্যাসুন্দর—সর্বযুগে সকল চিন্তাশীল ভূয়োদর্শী ব্যক্তি নিজ নিজ ভাবে তাঁহাদের বক্তৃতা, উপদেশ ও সাহিত্যে এই গুরুতর সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। বেশীর ভাগ ব্যক্তিই, সাধারণভাবে পুরুষ অপেক্ষা নারীর দ্বিগুণ, চতুর্গুণ, বা অষ্টগুণ অধিকতর কাম সম্বন্ধে মুখর সাক্ষ্য দিয়াছেন; এবং এখনো আপামরসাধারণ লোকসমাজে এইরূপ মতই প্রবল। এমন কি, প্রাচীন ভারতের কামকলাবিশেষজ্ঞ বাভ্রব্য, গোনার্দীয়, ঘোটকমুখ, দত্তক, চারায়ণ প্রমুখ ব্যক্তিগণও স্ত্রীপুরুষের কামতৃষ্ণার তৌল করিতে গিয়া, নারীর দিক্‌কার তুলাদণ্ডের পাল্লাখানিই নিম্নে নামাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। মনু ও উনবিংশ-সংহিতাকারগণ, পুরাণকারগণ ও মহাভারতকার কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন নারীর অতিরিক্ত যৌনাবেগ ও প্রচেষ্টার যে বর্ণাঢ্য চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—তাহা অবশ্য অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের তুলিকা হস্তে

লইয়া *। বাৎস্যায়ন ও কল্যাণমল্ল তবু এই উগ্র মতবাদকে যথাসাধ্য প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

যাহাহউক, পাশ্চাত্য দেশেও নারীর কাম সম্বন্ধে দুই বিপরীত চিন্তাধারার পরিপোষক দল দেখা গিয়াছে। এই দুই দলের মতবাদ লইয়া বিচার-বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, এতদুভয়ের মধ্যে যেমন আংশিক সত্য নিহিত রহিয়াছে, তেমনি উহাদের মধ্যে স্বমতপ্রাধান্যের ছাপ পড়িয়া একটা অসম্পূর্ণতা প্রকট করিয়া দিয়াছে। যাহাহউক, এ বিষয়ের একটা সাধারণ ও সর্বজনপ্রযোজ্য নীতি প্রতিষ্ঠিত করা শক্ত কথা। ডাঃ অটো য়্যাড্লার ও তাঁহার পূর্বে মিসেস্ ডাফি এবং আমাদের দেশের কোন কোন স্ত্রী ও পুরুষ সাহিত্যিক স্ত্রীলোকের যৌনক্ষুধা ও যৌনবোধ অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া প্রকারান্তরে প্রচার করিয়াছেন; ভোগরাগে স্ত্রীজাতির আপন নিষ্প্রয়োজনীয়তা ও নিষ্ক্রিয়তার দামামা বাজাইয়া, তাঁহারা তাঁহাদের মতবাদকে আরো জোরালো করিয়া তুলিয়াছেন।

দুই শ্রেণীর মতবাদী

কিন্তু ফোরেল্, কীশ্, ক্র্যাফ্ট্ এবিং, স্টেকেল্, রবিনসন্, ইউলেনবুর্গ্ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ—বিস্তীর্ণক্ষেত্রে বহু পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও অনুসন্ধানের পর স্থির করিয়াছেন যে, পরিবেশ, শিক্ষা, বয়স ও শ্রেণীভেদে নারী পুরুষ অপেক্ষা

* মহাভারত (বোম্বাই সংস্করণ), দ্বাদশ অ, ৩৯—৪৫, ত্রয়োদশ অ, ৩৮—৪৩ ইত্যাদি।

মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অ, ২১৫।

বেতাল পঞ্চবিংশতি, তৃ. অ, ৯—১০।

গড়ুর পুরাণ, ১০৯ অ, ৩৬—৩৭।

ভাগবত পুরাণ, নবম অ, ১৭—১৯।

অধিকতর যৌনাবেগশালিনী হইতে পারে, এবং তাহাদের জীবনে এমন একটা কাল আসিতে পারে যে-সময় যৌনবিষয়ক চিন্তাই তাহাদের সমস্ত সত্বাকে অধিকার করিয়া বসে। জগৎপ্রসিদ্ধ ধাত্রীবিদ্যার মহাজন ডাঃ কীশ্ এ কথাও ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না যে, স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থিত সুস্থ পরিণতবয়স্কা অধিকাংশ যুবতী, গর্ভধারণের আশঙ্কায় বেপথুবতী হইয়াও অথবা গর্ভধারণের চিন্তা মনের কোণেও ঠাঁই না দিয়াও, সম্প্রয়োগের জন্য উদ্‌ব্যস্ত হইয়া পড়িতে পারে *। এস্থলে তাহারা পুরুষমানুষের সহিত একই সোপানে সমারূঢ়, বরং সময় সময় এক ধাপ উচ্চে উঠিয়া যায়।

ডাঃ মেরী ষ্টোপ্‌স, এলেন্ কে, ডাঃ এম্, গ্লাস্‌গো প্রমুখ নারী-সমাজের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করাজী একথা অস্বীকার করিতে পারিলেন না; আমাদের দেশের অত্যাধুনিক লেখিকারাও ইহার সহিত কণ্ঠ মিলিত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন না। শ্রীমতী গ্লাস্‌গো এমন কথাও বলিলেন,— "যে জাতি ক্ষণিক ভোগসুখের মুহূর্তে জীবসৃষ্টির একটিমাত্র বীজ দিয়াই নিশ্চিন্ত হয়, তাহাদের যৌনস্পৃহা কোনমতেই নারীজাতি অপেক্ষা বেশী হইতে পারে না, কারণ উহাদিগকে জীবসৃষ্টির জন্য কয়েকমাস ধরিয়া ধৈর্য-সহকারে পরিশ্রম করিতে ও ক্লেশ সহিতে হয় *।" যৌনপ্রচেষ্টা ও সম্ভোগে নারীর যে নিশ্চেষ্টতা, তাহা চুম্বকের নিষ্ক্রিয়তার সহিত তুলনীয়। নারী সুকৌশলে মানুষের মনে এই ধারণা জন্মাইয়া দিতে পারে যে, সে যৌনসুখে অসংবেদনশীল,—তাহার আত্মদান শুধু পুরুষের প্রতি অনুগ্রহের

* H. E. Kisch, THE SEXUAL LIFE OF WOMAN, (Eng. trans. Rebman, 1908) •

A. Eulenburg, SEXUAL NEUROPATHY (Leipzig, 1895), pp. 89-82.

* REVIEW OF REVIEWS, 1912, p. 319.

নিদর্শন মাত্র। কিন্তু আমাদের মনে হয়, নারীর যৌনস্পৃহা দীঘির ন্যায় বিস্তৃত, পুরুষের নলকূপের ন্যায় সঙ্কীর্ণ ও সুগভীর!

এই সূত্রে আর একটা তথ্য উদ্ঘাটন করিয়া গেলেও মন্দ হয় না। সহবাসকালে রমণীর আনন্দ পুরুষ অপেক্ষা গাঢ়তর হয় কিনা, তৎসম্বন্ধেও বহু বিচক্ষণ, বহুদর্শী ব্যক্তি মস্তিষ্কচালন করিয়া গিয়াছেন। এবিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিতে গ্রীস্, রোম, কার্থেজ, মিশর ও চীন যখন ইতস্তত করিতেছিল, তখন ভারতবর্ষ চুল চিরিয়া তাহার মীমাংসা করিয়া দিতে চাহিয়াছে। তারপর দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ শতকের মধ্যে অল্ জাহীজ্-প্রণীত 'কিতাব অল্ আর্স ওয় অল্ আরাইস', আবুল বরকৎ মোহাম্মদ-প্রণীত 'কিতাব আস্ শেখ্ ইলা সাবাহ ফিল্ কুব্বৎ আলাল্ বাহ্', শেখ্ নেফ্জাউই প্রণীত 'আর্ রুদ্ আল্ আতার্ পূনেজাহা আল্ খাতার্' আদি যে সকল প্রমাণিক গ্রন্থ আরব্য ভাষায় লিখিত হইল, তাহার সবগুলিতেই ভারতবর্ষীয় মতবাদের প্রতিধ্বনি জাগিয়া রহিল। সকলেই স্বীকার করিলেন যে, সুরতসুখে রমণী অধিকতর সুখী। এখন আমেরিকা ও ইয়োরোপের নৃতত্ত্ব-ধুরন্ধরগণ এ সত্য মানিয়া লইতে একটুও ইতস্তত করিতেছেন না।

সহবাসে কার সুখ বেশী?

ইহার সপক্ষে অবশ্য কয়েকটি যুক্তিই খাড়া করা যাইতে পারে। বিশ্বপ্রকৃতি বড় সূক্ষ্ম বিচারক। প্রথমত যে জাতিকে প্রতিমাসে ঋতুশোণিত-ক্ষরণ, গর্ভধারণ, স্তন্যদান ও সন্তানপালন প্রভৃতির দ্বারা অনেকখানি ত্যাগস্বীকার ও দুঃখকষ্ট বরণ করিতে হয়, তাহাদিগকে প্রকৃতিদেবী যে সহবাস-সুখানুভূতি নিবিড়তরভাবে উপভোগ করিবার অধিকার প্রদান করিবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের কারণ কি আছে? গর্ভধারণ-আদি

অধিকতর সুখের হেতু

ত্যাগ-স্বীকারের উপযুক্ত খেসারৎ স্ত্রীলোকেরা প্রধানত উপসর্পণের মধ্য দিয়াই আদায় করিয়া লন।

দ্বিতীয়ত—সামাজিক অনুশাসন ও পারিবারিক বন্ধন নারীজাতির উপর যতখানি কঠিনতার সহিত প্রযুক্ত, পুরুষদের উপর ততখানি নহে। সংসারে সমস্ত অহোরাত্রের মধ্যে নারীদের জন্য পর্যায়ক্রমে সম্পাদ্য যে-সকল কর্তব্যকর্মের নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা আছে, আপন স্বামী-শ্বশুর-দেবর-ভাশুর পুত্র কন্যাদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ-বিধানের জন্য যে চিন্তা ও চেষ্টার মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে দিনের পর দিন অতিক্রম করিতে হয়, তাহাতে সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের নারীদিগের ভাগ্যে বিশ্রাম, পঠন্-অধ্যয়ন, বিশ্রম্ভালাপ ও চিন্তাবিলাসের অবসর ঘটে অত্যন্ত অল্প। শাসন-চালিত বা স্বেচ্ছাকৃত এই সকল গৃহকার্য বিগত সুখের স্মৃতি বা অনাগত আনন্দের কল্পনা-কুসুম লইয়া বিরলে মালা গাঁথিবার অবকাশ না দিলেও এই শ্রেণীর নারীকে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে সেই পরম আনন্দ-যজ্ঞের জন্য প্রস্তুত করিয়া দেয়।

ধরাবাঁধা কাজের চাপ ও সংসারের শাসন-রজ্জুর বন্ধনমুক্ত হইয়া যে মহামুহূর্তটিতে তাঁহারা স্বামী-সহবাসের সুযোগ পান, তাহা যে তাঁহাদিগকে অধিকতর সুখের সন্ধান দিবে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। বেলা দশটা হইতে একটা পর্যন্ত ক্লাসে আবদ্ধ থাকিয়া ছেলেরা যখন টিফিনের ছুটি পায়, তখন তাহাদের স্ফূর্তি যাহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহারা এই সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বাড়ীতে যে ছেলেটি শিক্ষক বা অভিভাবকের শাসনাতীত হইয়া দিবারাত্র খেলাধূলা করিয়া বেড়াইতেছে, তাহার আনন্দবোধ কি ওই অর্ধঘণ্টা-ছুটি-পাওয়া ছেলেদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত তরল নয়?

পুরুষের যৌনস্বাধীনতার গণ্ডী মেয়েদের চেয়ে অনেক বড়;

স্বাভাবিক বা কৃত্রিমভাবে, বস্তুগত বা ভাবগত-ভাবে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে যৌনলিপ্সার চরিতার্থতা-সাধনের অবসরও থাকে তাহাদের প্রচুর। শিশুকাল হইতে গৃহের বাহিরে সর্বদা চলাফিরা করিয়া এবং অবিরত নানারূপ উৎসবামোদ-সভা-মজলিসে যোগদান করিয়া, তাঁহারা যেমন ভাবের আদান-প্রদানের যথেষ্ট সুযোগ লাভ করেন, তেমনি দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, অধ্যয়নাদি-দ্বারাও অসাক্ষাৎভাবে তাহাদের যৌন-আবেগ অনেকটা প্রশমিত হয় এবং গৃহাবদ্ধা রমণীর ন্যায় ততটা শাণিত হইতে পারে না। ক্ষুধা পাওয়ামাত্রই বাড়ীতে, হোটেলে বা দোকানে বসিয়া যে পেট্ ভরিয়া না হউক, সামান্য কিছু জলখাবারও খাইতে পায়, নিমন্ত্রণ খাইতে বসিয়া তাহার তৃপ্তি ঠিক্ ততখানি হয় না—যতখানি একজন সারাদিন উপবাসী ব্যক্তির ভোজনকালে হয়।

তদুপরি, শাসনের কঠিন গ্রন্থিবন্ধন রমণীর মনে যৌনরাজ্যের নানা দুর্জ্ঞেয় ও আবৃত বিষয়ের প্রতি অন্তরের নিভৃততম স্তরে একটা সতৃষ্ণ আগ্রহ ও একাগ্র আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া রাখে। অথচ সংসারে যাঁহাদের পাচক-দাস-দাসী ও অন্যান্য সাহায্যকারিনী থাকায় অবসর থাকে বিস্তর অথবা স্বাধীন বিচরণের ক্ষেত্র হয় অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত, তাঁহাদের ঐ বিষয়ক আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা প্রথমটা অত্যন্ত প্রখর থাকিয়া, শেষে ভোঁতা হইয়া যায়। অন্যদিকে সহজে উহা অব্যবস্থিত ও বহুমুখী হইবার সুযোগ পায় এবং স্বামী বা অন্য কোন প্রেমিকের সম্মিলনে আশানুরূপ সুখানুভূতি লাভ করে না। অথচ অল্প স্বাধীনতাভোগিনী, শ্রমশীলা নারীর দেহ যখন মদন-দেবালয়ের ভোগারতিতে নিযুক্ত হয়, তখন ঐ ছুটি-পাওয়া মনের সমস্ত কৌতূহল নিমেষে নিবৃত্ত হইয়া একটা সুগভীর তৃপ্তিরসে মজিয়া যায়,—সমস্ত বিচ্ছেদ-ক্লেশ ও ক্লান্তির স্মৃতি তখন আনন্দের পটভূমিটিকে স্বর্ণসুষমায় সমুজ্জল করিয়া তুলে।

তৃতীয়ত—যে পক্ষ রতিক্রিয়ায় অপর পক্ষের রস গ্রহণ করে ও নিজের রসও নিঃসারণ করে, তাহার আনন্দ এই শেষোক্ত পক্ষ অপেক্ষা যে বেশী হয়—তাহা অনুমান করা বোধহয় অন্যায় হইবে না। আরো একটা যুক্তি এই সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া চলে। ক্রমাগত কটিদেশ আন্দোলন, আপনার বাহুদ্বয়ের উপর সমস্ত দেহের ভারার্পণ প্রভৃতির দ্বারা পুরুষ যতটা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন, নারী ততটা হন্ না; পরন্ত অধিকতর সুবিধাজনক স্থিতির মধ্যে থাকিয়া সুরতের আগাগোড়াই রমণী প্রায় সমান সুখ বোধ করেন। পুরুষ প্রথমে কিছুক্ষণ ও বীর্যস্খলনের সমসময়ে ক্ষণিকের জন্য সুখানুভব করেন। তাহার কারণ, সুরতের আদ্যন্তকাল নারীর ভগনালীর মধ্যস্থ বার্থোলিন্ গ্রন্থিদ্বয় হইতে একপ্রকার পাৎলা রস চুঁয়াইয়া পড়ে, পরিশেষে পুরুষের শুক্রক্ষয়ের অনুরূপ ঘন রস-নিষেক ত আছেই। যাহাহউক, এই রসদ্বয় সম্বন্ধে পরে আরো কিছু বলিব। সার্ধদ্বিসহস্রাধিক কাল পূর্বে ভারতীয় যৌনজ্ঞানের অভ্রান্ত পণ্ডিত বাভ্রব্য যে বলিয়াছেন,—"সুরতান্তে সুখং পুংসাং স্ত্রীণাং তু সততং সুখং," তাহার যথার্থতা সম্বন্ধে সংশয়ের কোন অবকাশ নাই *।

নারীর কাম-কেন্দ্র অবশ্য জনন-যন্ত্রের মধ্যে পুরুষের মতোই নিবদ্ধ বটে; কিন্তু তাহার শাখা-প্রশাখা শরীরের সর্ব অঙ্গে ছড়াইয়া আছে।

---

* কামসূত্র, সম্প্রয়োগিকাধিকরণম্, ১ম অধ্যায়, ২০।

বাৎস্যায়ন কিন্তু বহু যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, বাভ্রব্যের এই মত খণ্ডনের জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "তেনোভয়োরপি সদৃশী সুখ প্রতিপত্তিরিতি" অর্থাৎ উভয়েই সমানভাবে রতিক্রিয়ার কর্তা বলিয়া উভয়েরই সুখানুভব সমান হইয়া থাকে।—ইহার সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। তবে মুনিপ্রবর স্বীকার করিয়াছেন যে, রতিক্রিয়া কিঞ্চিৎ বিলম্বিত হইলে কিংবা পুরুষের বীর্যপ্রক্ষেপ শীঘ্র না ঘটিলে, রমণীগণ নিবিড়তর পুলকপ্রাপ্ত হন্। এতৎসম্বন্ধে আমাদিগকে অতঃপর একটু বিশদ আলোচনা করিতে হইবে।

যৌন-যন্ত্রের জটিলতা ও ব্যাপকতা

পুরুষরা কিন্তু এ কথাটা অনেক সময় ভুলিয়া যান্। যৌন-যন্ত্রাদি স্ত্রীলোকের মধ্যে এত জটিল বলিয়াই যৌন-জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞ পুরুষ তাহার প্রতি সুবিচার করিতে ভুলিয়া যান্ এবং তাহাকে অসুখী করিয়া তুলেন। পুরুষের মনে কামনার উদয় হইলে, তাহার সাড়া গিয়া পড়ে তৎক্ষণাৎ জনন-যন্ত্রে, এবং উচ্ছ্রিত লিঙ্গমূলেই তাহার সকল উত্তেজনা যেন কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে; তখন তাহারই চরিতার্থতার উপরই মনের চরিতার্থতা নির্ভর করে। কিন্তু স্ত্রীলোকের সর্ব অঙ্গে কামনার কিরণ-রশ্মি ছড়াইয়া পড়ে। তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিবিড়ভাবে ইহার আবেশ হয় অন্তত চারিটি জায়গায়—(১) জিহ্বা, ওষ্ঠ ও গণ্ডমূল, (২) স্তন-বৃন্ত, (৩) ভগাঙ্কুর (clitoris) ও (৪) যোনিনালি ও তাহার শেষ প্রান্তস্থ জরায়ু মুখ।

রমণীগণ চাহেন, সর্ব নিম্নেরটিকে অধিগম্য করিবার কালে তো বটেই—অপিচ তাহার পূর্বেই, প্রথম দুইটি বা তিনটি শাখা-কেন্দ্রের প্রতি পুরুষের যেন সমধিক দৃষ্টি পড়ে। নারীর যে পুরুষের চেয়ে কামোদ্রেক সহজে হয় না, হইলেও তৎসম্বন্ধে বাহ্যত উদাসীন থাকিতে বা অল্পায়াসে চাপিয়া থাকিতে পারে, তাহার প্রধান কারণ হইল—এই কামকেন্দ্রের ব্যাপকতা। অধরদেশে পুরুষের উপর্যুপরি কয়েকটি উত্তপ্ত চুম্বনেই নারী সন্তুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু নারীর সহস্র চুম্বনে পুরুষ তাহার লালসার পূর্ণ আহার্য পায় না।

অর্থাৎ পুরুষের কামতৃষ্ণার একটি মাত্র হেড্ অফিস্ আছে—তাহার জনন-যন্ত্রে। বড় বড় ব্যাঙ্কের মতো নারীর হেড্-অফিস্ ব্যতীত কতকগুলি ব্রাঞ্চ-অফিস্ আছে; ইহারাও পুরাপুরিভাবে বস্তুগত প্রেমের লেন্দেন্ করে। লালসা-তৃপ্তির সময় স্বার্থপর পুরুষগণ সচরাচর হেড্-আফিসের দিকেই তাঁহাদের সমস্ত তনু-মন প্রসারিত

করিয়া দেন, ব্রাঞ্চ-আফিসগুলির দিকে আদৌ মনোযোগ দেন্ না। দংশন, পীড়ন, চোষণ, হস্ত-বিলেপন (সুড়্সুড়ি) প্রভৃতি দ্বারা ব্রাঞ্চ-আফিসগুলিকে উত্তেজিত করিতে পারিলে, হেড্-আফিসও উত্তেজিত হয়, এবং এই উত্তেজনার ভাবাতিশয্যে নারীর সমস্ত শরীর পুলক-স্পন্দিত হইতে থাকে।

সহবাসের সময় বহু নারী যে নিষ্ক্রিয় থাকে, তাহার প্রধানতম কারণই হইল—তাঁহারা সকল কেন্দ্রে যথোচিতভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন না।

প্রত্যেক পুরুষকে প্রেম-জীবনের এই মহাসত্য কয়টি উপলব্ধি করিতে হইবে যে, (১) **নারীর দেহে কাম-কেন্দ্র একাধিক, নারীর রাগসাধনে উহাদের কোনটিকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না ; (২) সমগ্র বিবাহিত জীবনে প্রত্যেক সঙ্গমের পূর্বেই চুম্বন, সম্বাহন, বিলেপন, চোষণাদি দ্বারা স্ত্রীর যথাবিহিত রাগ ও ভাবসঞ্চার করা উচিত, নচেৎ তাহা বলাৎকারেরই নামান্তর হয় ; (৩) সুরতসুখে নারীও অন্তত অর্ধেক অংশীদার,—পুরুষের ভোগরাগের অনড়, অসাড়, অসংবেদনশীল যন্ত্রস্বরূপ হইয়া থাকিতে সে গ্লানি ও ঘৃণাবোধ করে ; (৪) নারীর কামোত্তেজনা সহজে জন্মে না, এবং একবার জন্মিলে, তাহা সহজে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে অবসাদ লাভ করে না।**

নারীর যৌনজীবনের একটা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব তাহার ঋতুস্রাব। পূর্বেই বলিয়াছি (এবং পুনরায় বলা বোধহয় অনাবশ্যক) যে, প্রতি আটাশ দিন অন্তর বারো-তের হইতে পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক সুস্থ রমণীর প্রতি চান্দ্রমাসে একবার করিয়া ঋতুস্রাব হয়।

ঋতুস্রাব ও মধ্যঋতু

ঋতুস্রাব তিন হইতে পাঁচ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং এই কয় দিনে তিন হইতে পাঁচ আউন্স্ (দেড় হইতে আড়াই-ছটাক) পরিমাণ জরায়ু-গাত্রের শ্লেষ্মার টুক্‌রা ও অন্যান্য ক্লেদ-মিশ্রিত গাঢ় শোণিত নিঃসৃত হইয়া থাকে। অবশ্য অসুস্থ বা রুগ্‌ণ স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাবের স্থায়িত্ব বা পরিমাণ কম-বেশী হইতে পারে এবং উহা অনিয়মিতভাবে আবির্ভূত হইতে পারে।

যাহাহউক, সম্প্রতি জগতের সর্বত্র কোন কোন স্ত্রীলোকের ঋতুকাল-চক্র দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যাইতে দেখা যায় অর্থাৎ প্রতি মাসিক প্রধান ঋতু আরম্ভের চৌদ্দ-পনের দিনের মাথায় আর একটা ক্ষুদ্র ঋতুস্রাবের আবির্ভাব দেখা যায়। ইহার স্থায়িত্বকাল সাধারণত দুই দিনের বেশী হয় না। এই সময় কাহারো ঈষৎ রক্তস্রাব হয়, কাহারো বা রক্তবিহীন প্রচুর শ্লেষ্মামিশ্রিত লসীকা (অর্থাৎ রক্তের ঘোলাটে হরিদ্রাভ জলীয়াংশ) নির্গত হয়, কুক্ষিতে বেদনা বোধ হয়, মনে ঈষৎ চাঞ্চল্যভাব আসে, এবং দেহের উত্তাপও সামান্য বাড়িয়া যায়। বহু শিক্ষিতা ও অর্ধশিক্ষিতা বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের নিকট এ ঘটনা অজ্ঞাত নহে। জার্মান্ দেহবৈজ্ঞানিকগণ ইহার নাম দিয়াছেন 'নবঋতু' বা 'মধ্যঋতু' (Neben-menstrazun or Mittelschmerz).

আভ্যন্তরিক যৌন-যন্ত্রাদির ক্রিয়াসংস্থান ও ঋতুস্রাব, গর্ভাধান প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীক্, আরবিক্ ও হিন্দু কামশাস্ত্রে যে সকল ভ্রান্তিপূর্ণ জ্ঞানের অবতারণা করা হইয়াছিল, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সেগুলির নিরসন করিয়া দিয়া, আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছে। অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, চান্দ্রমাসিক ওই স্রাবের রক্ত শূন্যগর্ভ 'জরায়ু' বা 'গর্ভাশয়ের' (Uterus) * মধ্য হইতে

* আমাদের দেশে চলিত কথায় জরায়ুকে অনেক রমণীই 'নাড়ী' বা 'পো-নাড়ী'

আসে; কিন্তু কেন আসে—তাহারো সঠিক্ উত্তর আবিষ্কার করিতে নব্য-বৈজ্ঞানিকগণ পশ্চাৎপদ হন্ নাই।

কিন্তু প্রয়োজনীয়তার অনুরোধে এই উত্তরের আভাষটুকু দিয়া যাইবার পূর্বে, সাধারণ পাঠকদিগের দৃষ্টি আর এক জোড়া আবশ্যকীয় যন্ত্রযগলের প্রতি না ফিরাইলে চলিবে না। াদের নাম 'অণ্ডাণুকোষ' (ovaries),—দেখিতে অনেকটা পৌষপার্বণের সিদ্ধপিঠার ন্যায়। জরায়ুর অনতিদূরে দক্ষিণে ও বামে দুইটি অণ্ডাণুকোষের অবস্থান। ইহাদের কার্য হইল—প্রতি চান্দ্রমাসে একবার (কাহারো মতে দুইবার) করিয়া একটি (ক্বচিৎ হয়ত দুইটি) অতিক্ষুদ্র পরিণতাকার অণ্ডাণু আপন গাত্রপৃষ্ঠের একবিন্দু স্থান উদ্ভিন্ন করিয়া বাহির করিয়া দেওয়া। পুস্তকের উপক্রমণিকায়ই বলিয়াছি যে, নারীর অণ্ডাণুকোষদ্বয় পুরুষের অণ্ডকোষদ্বয়ের (testicles) সহিত তুলনীয়। অণ্ডকোষদ্বয়ের মধ্যে যেমন কৃমির ন্যায় চলচ্ছক্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র 'শুক্রকীটের' জন্ম হয়, তেমনি স্ত্রীলোকদের অণ্ডাণুকোষদ্বয়ের মধ্যে শুক্রকীট অপেক্ষা ঈষৎ ড় (অথচ কোনটিকেই অনুবীক্ষ্য-যন্ত্র ব্যতিরেকে পর্যবেক্ষণ করা যায় না) 'অণ্ডাণুর' উৎপত্তি ও ক্রমপরিণতি। প্রতি চান্দ্রমাসের একটি বিশেষ দিনে একদিকের অণ্ডাণুকোষের গাত্র ফাটিয়া যখন একটি অণ্ডাণু বাহিরে আত্মপ্রকাশ করে, তখন 'অণ্ডাণুপ্রবা' (Fallopiam tubes) নামক শীর্ণ, অসরল, নলাকার যন্ত্রের চওড়া মুখ ঈষৎ অবনমিত হইয়া, ঐ পরিপক্ক অণ্ডাণুকে নিজের মধ্যে শোষণ করিয়া

অণ্ডাণু ও শুক্রকীট

বলিয়া থাকেন; জরায়ুঘটিত কোন ব্যায়রাম হইলে, তাহাকে 'নাড়ীর অসুখ' বলা হয়। কিন্তু জরায়ুকে নাড়ী বলার কোন সঙ্গত কারণ নাই; এবং শরীরসংস্থান-মতে উহা ভ্রমাত্মক। একমাত্র nerve অর্থেই নাড়ী শব্দ ব্যবহার্য। [৪৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা দেখুন।]

লয়। উভয় অণ্ডাণুপ্রবারই এক এক প্রান্ত থাকে জরায়ুর সহিত যুক্ত। সুতরাং জরায়ুমুখে বীর্যস্খলনের পর, অসংখ্য শুক্রকীট জরায়ুর ভিতর প্রবেশ করিয়া থাকে, এবং উহাদের কয়েকটি কৃমিবৎ ধীরে ধীরে জরায়ুর ভিতর গাত্র বাহিয়া উপরে উঠিয়া যে-কোন একটি অণ্ডাণুপ্রবার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। এইরূপ প্রবেশ করিয়া, যদি তাহারা কোন অণ্ডাণুকে সম্মুখে দেখিতে পায়, তাহাহইলে যে-কোন একটি শুক্রকীট নিজের মস্তকভাগ কোমল অণ্ডাণুগাত্রে বিদ্ধ করিয়া দিয়া, আপনার সত্বা বিসর্জন করে। ইহাকেই বলে জীবাঙ্কুর, এবং এই ব্যাপারকেই বলা যায় গর্ভোপক্রম (fecundation).

কিন্তু অনুকূল অবস্থায় এই জীবাঙ্কুরকে (অর্থাৎ অণ্ডাণু-শুক্রকীটের যুক্ত সংমিশ্রণ) বৃক্ষবীজের ন্যায় জরায়ুর গাত্রে প্রোথিত না হইলে, উহা প্রকৃতপ্রস্তাবে অঙ্কুরিত হইয়া উঠে না, বা ভ্রূণসৃষ্টির সূচনা করিতে পারে না। জরায়ু-অভ্যন্তরের শ্লেষ্মাময় ও পেশীময় আস্তরণ সম্ভবনীয় জীবসৃষ্টির নিমিত্ত সর্বতোভাবে প্রস্তুত করিবার জন্য, অথবা জীবসৃষ্টির সম্ভবনীয়তার কাল অতিক্রান্ত হইলে উহার ভিতরকার মৃত শুক্রকীটাদির দেহাবশেষ ও শুষ্ক পুরাতন চর্মাদি পরিষ্কার করিয়া ফেলিবার জন্য, প্রতি আটাশ দিন অন্তর একটী করিয়া ঋতুস্রাবের উৎপত্তি হয়। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, ঋতুস্রাব আরম্ভের অব্যবহিত পূর্বে অথবা উহার সমসময়ে অণ্ডাণুকোষস্থ এক-একটি "গ্র্যাফিয়্যান্ ফলিক্ল্" ফাটিয়া এক-একটি পরিণত অণ্ডাণু বাহির হইয়া আসে; ইহাকে আমরা 'অণ্ডাণুস্ফোটন' (ovulation) বলিতে পারি।

অণ্ডাণুস্ফোটন

তৎপরে উহা অণ্ডাণুপ্রবার মধ্যে আসিয়া সাধারণত ৭।৮ দিন পর্যন্ত সতেজ ও কার্যক্ষম অবস্থায় থাকিতে পারে। ইতোমধ্যে উহা কোন শুক্র-

কীটের সাক্ষাৎকার পাইয়া তাহার সহিত সম্মিলিত হইতে পারে তো ভাল ; নচেৎ নিস্তেজ হইয়া সেইখানেই অনাঘ্রাত কুসুমের মতো শুকাইয়া যায়। কোন কোনটি আবার সতেজ অবস্থায় বিপথে পরিচালিত হইয়া উদর-গহ্বরে আসিয়া মারা পড়ে।...যাহাহউক, কোন কোন পণ্ডিত কিন্তু মত প্রকাশ করিতেছেন যে, শেষঋতুস্রাব-সূচনার চৌদ্দ হইতে আঠার দিন পরে অণ্ডাণুস্ফোটন হয় *। আমাদের কিন্তু মনে হয়, প্রতি চান্দ্রমাসে প্রত্যেক দিকের অণ্ডাণুকোষ হইতেই একবার করিয়া অণ্ডাণুস্ফোটন হয় ; অর্থাৎ ঋতুস্রাব আরম্ভের পর চতুর্দশ বা পঞ্চদশ দিবসের সন্নিকটে একবার, পুনরায় অষ্টাবিংশ বা ঊনত্রিংশ দিবসের মাথায় একবার। এই মতবাদ কোন কোন আধুনিক পণ্ডিত একেবারে উড়াইয়া দিতে পারিতেছেন না ; এবং উহা স্বীকার করিয়া লইলে, নারীর কাম-জীবনের একটি নিগূঢ় তথ্য উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। সেই তথ্যটি বুঝাইবার জন্যই এতগুলি কথার অবতারণা করিতে হইল।

মনুষ্যেতর প্রাণীজগতে ঋতুস্রাব ও কামোদ্রেক

মানুষ ব্যতীত অন্য প্রাণীর ভিতর মাসে মাসে নিয়মিত ঋতুস্রাবের রীতি নাই ; কেবল নিষ্পুচ্ছ বানর জাতীয় জীবের (গরিলা, শীম্পাঞ্জি, ওরাং-উটাং ও উল্লুকের) স্ত্রীজাতির মধ্যে প্রায় প্রতিমাসে একবার করিয়া ঋতুস্রাব হইতে লক্ষ্য করা গিয়াছে। তবে মানুষের মতো ঠিক্ আটাশ দিন অন্তরই উহার আবির্ভাব হয় কিনা, তৎসম্বন্ধে এখনো বিস্তৃত অনুসন্ধানের দ্বারা স্থিরনিশ্চিত হওয়া যায় নাই। গাভী, কুকুর, ঘোটক, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত প্রাণীদিগের মধ্যে কখনো খুব

* "Ovulation usually occurs fourteen to eighteen days after the beginning of the last menstruation."—J. Tenenbaum, M D, OP. CIT. p, 39.

অনিয়মিতভাবে যোনিনালি হইতে দুই তিন দিন যাবৎ শ্বেত বা ঘোলাটে রঙের স্রাব হইতে দেখা যায়; উহাকে অবশ্য প্রকৃত ঋতুস্রাব বলিয়া অভিহিত করা চলে না।

অন্যান্য স্তন্যপায়ী স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যে বৎসরের মধ্যে একবার কিংবা দুইবার যৌনসম্মিলনের জন্য একটা সহজ প্রেরণা জাগে। তখন তাহাদের সমস্ত দেহের ভিতর একটা অস্থিরতা, একটা অস্বাভাবিক উত্তাপ ও আহার্য-গ্রহণে বিতৃষ্ণার ভাব আসে যোনিমুখও স্থানীয় ঘর্মস্রাবী গ্রন্থিনিঃসৃত রসে অত্যন্ত সিক্ত ও ঈষৎ স্ফীত হইয়া উঠে; সমস্ত গাত্র হইতে একটা তীব্র গন্ধ নির্গত হয়। পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যেও অনেকটা এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইতে দেখা যায়। ইংরাজ-বৈজ্ঞানিকগণ ইহার নাম দিয়াছেন, "œstrus," "rut," বা "ardour."

সাধারণত হেমন্ত ও বসন্তকালে œstrus অর্থাৎ উচ্চ প্রাণীদের আসঙ্গকাম প্রস্ফুরিত হইয়া উঠে। এই ঋতু দুইটিতে অধিকাংশ প্রাণীজগৎ একদিকে যেমন পুনঃপুন কয়েকদিন ধরিয়া যৌনসম্ভোগে নিরত হয়, অন্যদিকে তেমনি সুনিশ্চিত নবজীবনদানের সূচনা করে। নিম্নশ্রেণীর কীটাদি, মৎস্যজাতি ও গৃহপালিত বা গৃহাশ্রিত বিহঙ্গমকুল ব্যতীত অন্য সমস্ত ইতর প্রাণী বহুলাংশে এই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। মানুষ ও বানর-জাতীয় প্রাণী ব্যতিরেকে অবশিষ্ট সকল স্ত্রী-প্রাণীরই এক, দুই বা তিনবার পুরুষ সংসর্গে সুনিশ্চিত গর্ভোৎপত্তি হয়।

মেরুদণ্ডবিশিষ্ট প্রাণীদিগের মধ্যে বৎসরের একটি বা দুইটি ঋতুর কয়টি মাত্র দিনে আসঙ্গলিপ্সা উদ্দীপিত করা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রকৃতিদেবী উহাদিগকে এই অন্ধ অসংজ্ঞাত সহজ সংস্কারের বশবর্তী করিয়া কেবল প্রজননের উদ্দেশ্য সাধন করাইয়া লইতেছেন। কিন্তু নিষ্পুচ্ছ বানর ও মনুষ্যের বেলায় ওই সহজ সংস্কারকে বুদ্ধির জোয়ালে

জুড়িয়া ক্রমশ সুস্পষ্ট, সুলভতর, সুমার্জিত ও স্বেচ্ছাধীন করা হইয়াছে; কারণ সারা বৎসরের কয়েকটি দিন নহে—প্রতি মাসের কয়েকটি দিনেই তাহাদের সম্ভোগেচ্ছা আপনাআপনি জাগে। শুধু প্রজাসৃষ্টির উদ্দেশ্যেই যদি মানুষেব যৌনক্ষুধার সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহাহইলে বৎসরে একবার অথবা দুই-তিন বৎসর অন্তর এক-একবার উহা বিকশিত হইলেই তো চলিতে পারিত!

স্বয়মাগত কাম-জোয়ার

শীতপ্রধান দেশের রমণীগণের যৌন-জীবনের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া দেখা যাইতেছে যে, সাধারণত সুস্থ, সবল, মোটামুটি কায়িক পরিশ্রমী, অনতিশিক্ষিত পল্লীবাসিনী ভদ্রমহিলারা স্থূলভাবে প্রতি চৌদ্দ দিন অন্তর স্বয়ম্ভুব কাম-জোয়ার অনুভব করেন। ডাঃ মেরী ষ্টোপ্‌স বলিতেছেন যে, তাঁহাদের দেশের উপরিবর্ণিত শ্রেণীর রমণীগণের স্বতস্ফূর্ত কামনা জাগে মাসিক ঋতু-আরম্ভের দুই-এক দিন পূর্বে এবং ঋতু-আরম্ভের ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ দিবসে। একটি কাম-জোয়ার তিন দিন, অন্যটি চারি দিবস কাল স্থায়ী *। এই শেষের প্রেরণাটিই হয় সব চেয়ে নিবিড় ও চাঞ্চল্যকর †। কিন্তু হ্যাভলক্ এলিস্ তাঁহার বিরাট প্রামাণিক গ্রন্থে ইয়োরোপ ও আমেরিকার বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদিগের এই বিষয়ক অনুসন্ধানের যে ফলসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, সাধারণত পাশ্চাত্য রমণীগণের স্বতোৎসারিত কামের প্রেরণা জাগে ঋতুস্রাবের অব্যবহিত পূর্বের দুই-তিন দিনে, ঋতুস্রাব-সময়ে এবং ঋতুস্রাবের অব্যবহিত পরের দুই-তিন দিনে।

† PHISIOLOGY OF REPRODUCTION by F. H. A. Marshall, p. 138.

* MARRIED LOVE by M. C. Stopes, D. Sc., Ph. D. (Putnam, March. 1927) pp. 34—49.

আমাদের দেশের রমণীগণের কাম-জোয়ার আগমনের একটা সাধারণ নিয়ম-সূত্র ও কার্য-কারণ-সম্বন্ধ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিতে পাইলাম

নারীর কাম-জোয়ারের সময় নির্দেশ

যে, পাশ্চাত্য রমণীগণের কাম-জাগৃতির নিয়ম আমাদের দেশের নারীদিগের সহিত ঠিক খাপ্ না খাইলেও উভয়ের মধ্যে একটা স্থূল সামঞ্জস্য আছে। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে উভয় দেশের রমণীগণের প্রতি প্রযোজ্য একটা সাধারণ নিয়ম-ভিত্তি স্থাপন করা খুব কষ্টসাধ্য নহে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এক একটি চান্দ্রমাস লইয়া রমণীগণের এক-একটি ঋতু-মাস গঠিত, অর্থাৎ আটাশ দিন পর পর তাঁহাদের ঋতুস্রাব হয়। অনেক নামজাদা যৌন-বৈজ্ঞানিক বহু গবেষণার পর একমত হইয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রত্যেক সুস্থ স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক কাম-জাগৃতির সহিত একদিকে তাহার ঋতুস্রাব ও অন্যদিকে চান্দ্রমাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে ; হয় তাহা প্রতি আটাশ দিন অন্তর, নচেৎ আটাশের কোনো সমবিভাজ্য সংখ্যক দিনের মাথায় আত্মপ্রকাশ করে। আমরা এই মতবাদকে আর একটু পরিমার্জিত ও ব্যাপক করিতে উহার সহিত এই কয়টি কথা যোগ করিয়া দিতে পারি যে, নারীর কাম-জাগৃতির সহিত শুধু ঋতুস্রাবের নহে, অণ্ডাণুস্ফোটনেরও একটা নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে।

আচ্ছা, আটাশকে সমান ভাগ করিয়া যেমন চৌদ্দ পাইতেছি, আবার তেমনি চৌদ্দকে সমান ভাগ করিলে সাত পাই। নাতিব্যাপক স্থানীয় অনুসন্ধানের ফলে আমরা এই সত্যে উপনীত হইয়াছি যে, আমাদের দেশেব স্বাস্থ্যবতী, প্রাপ্তবয়স্কা, নাতিশিক্ষিতা, কর্মঠা রমণীগণ প্রতি সাত দিন অন্তর অথবা প্রতি সপ্তম দিনের কাছাকাছি কোন সময় এক-একটি কাম-জোয়ার অনুভব করেন। পূর্বে ইয়োরোপীয় রমণীগণের প্রতি কাম-

জোয়ারের স্থায়িত্ব-কাল তিন বা চারি দিন বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষে রমণী-বিশেষে, বয়স-বিশেষে বা শহর ও পল্লী-বিশেষে বিভিন্ন কাম-জোয়ারের স্থায়িত্ব কিছু হ্রস্ব-দীর্ঘ হইলেও একটা সার্বজনীন্ নিয়ম-গঠনের খাতিরে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, সচরাচর ঋতুপূর্বিক্ কাম-জোয়ারটির অথবা ঋতুর অব্যবহিত পরের কাম-জোয়ারটির স্থায়িত্ব-কাল মোটামুটি তিন দিন, এবং বাকী কাম-জোয়ারগুলি স্থায়িত্ব-কাল একদিন মাত্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কা, প্রেমবতী, স্বাস্থ্যপূর্ণা রমণীর প্রতি আটাশদিনের মধ্যে চারিবার কাম-জোয়ার আসে এবং এই চারিটি কাম-জোয়ারের মোট্ ভোগ-কাল স্থূলভাবে পাঁচ-ছয় দিন।

কিন্তু 'দিন' শব্দটি এতক্ষণ নির্বিবাদে ব্যবহার করিয়া আসিয়া, সূক্ষ্ম বিচারক্ষেত্রে উহার ব্যবহারে আমরা নিজেরাই আপত্তি তুলিতেছি। 'দিন' না বলিয়া 'তিথি' বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কারণ, চন্দ্রমাস (আটাশ দিনের মাস) লইয়া যাঁহাদের কারবার, তাঁহাদিগের তিথি এড়াইয়া যাওয়া তো চলে না। সাধারণ পাঠককে ব্যাপারটা একটু ভাঙ্গিয়া বলিতে হইবে।...মানুষ আপন প্রয়োজন অনুসারে বার ও দিন তৈয়ারী করিয়া লইয়াছে,—ইহার সহিত সূর্যের যতখানি সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, চন্দ্রের তদ্রূপ নহে। তিথি হইল চন্দ্রের কালাংশ। ঋতু হিসাবে সূর্যের অবস্থানের তারতম্য ঘটায় দিনমান-রাত্রিমান ঈষৎ ছোট-বড় হয়, এক একটী তিথিরও ভোগ-কাল তেমনি ছোট-বড় হইয়া থাকে। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে দিনমান-রাত্রিমান ছোট-বড় হইলেও আমাদের হিসাবের সুবিধার জন্য ২৪ ঘণ্টা লইয়া এক একটি দিন বা বার খাড়া করা হইয়াছে (যদিও হওয়া উচিত—এক সূর্যোদয় হইতে আর এক সূর্যোদয়-কাল পর্যন্ত)।

মোটামুটি হিসাবে দেখা যাইতেছে, আটাশ দিনে এক-একটি চান্দ্রমাস

হয়। আমরা যে মাস ধরিয়া কার্য করি ও পঞ্জিকার গণনা অধ্যয়ন করি, তাহা সৌর মাস—সাধারণত ২৯ হইতে ৩১ দিন লইয়া সেইরূপ একটি মাস গঠিত। একটি চান্দ্রমাসকে অসমান ত্রিশ অংশে ভাগ করিয়া এক-এক অংশকে তিথি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ১৫টি তিথিতে এক পক্ষ; দুই পক্ষ (শুক্ল ও কৃষ্ণ) লইয়া এক-একটি চান্দ্রমাসরূপী বিহঙ্গের সৃষ্টি। পূর্বেই বলিয়াছি, ঋতু বিশেষে এক-একটি তিথি ছোট-বড় হয়। সেইজন্য এক দিনের (২৪ ঘণ্টার) মধ্যে একটি সম্পূর্ণ তিথি ও তাহার অগ্রে বা পশ্চাতে একটি তিথির কিয়দংশ, নতুবা অগ্র-পশ্চাৎ আরো দুইটি তিথির কিয়দংশ, সম্মিলিত হইতে দেখা যায়; এই শেষোক্ত সংঘটনকেই ত্র্যহস্পর্শ বলে। কাজে কাজেই ঠিক আটাশ দিনের মধ্যেই যে ৩০টি তিথির (অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত) ভোগকাল শেষ হইবে, এমন কোন কথা নাই। হয়ত কোন চান্দ্রমাস পউনে আটাশ, কোনটি সওয়া আটাশ, কোনটি সাড়ে আটাশ, কোনটি পউনে আটাশ, কোনটি বা সওয়া ঊনত্রিশ দিনেও শেষ হয়। সুতরাং রমণীর ঋতুস্রাব খুব নিয়মিত হইলেও ঠিক আটাশ দিন অন্তেই যে আরম্ভ হইবে, এরূপ কথা নিশ্চয়তার সহিত বলা চলে না।

কিন্তু ঠিক্ প্রতি চান্দ্রমাসের প্রথম তিথি অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে জগতের প্রত্যেক অথবা অধিকাংশ রমণীর ঋতুস্রাব আরম্ভ হয় কি না—এ সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। একজন জার্মান্ ও একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ে ভারতবর্ষীয় রমণীগণ কোন "Cosmic influence" অনুসরণ করে কিনা, তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকারকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ইহার মীমাংসার জন্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই; কিন্তু গত তিন বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক স্তরের, বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন স্থানীয়া মাত্র ছাপ্পান্ন জন রমণীর এগারটি হইতে আঠারটি অনুক্রমিক ঋতুস্রাব-

সময়ের সুনির্ণীত হিসাব আমাদের হাতে আসিয়াছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মহিলারা নিজে এই হিসাব রাখিয়াছেন; অবশিষ্ট স্থলে তাঁহাদের স্বামী রাখিয়াছেন, এবং পর্যবেক্ষণ-কালের আগাগোড়াই পঞ্জিকার সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রাখিতে ত্রুটি করেন নাই।

কোন কোন ক্ষেত্রে ঋতুস্রাব ঠিক্ কোন্ সময়টিতে আরম্ভ হইল, তাহা ধরা যায় নাই। কারণ হয়ত উহা রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় অথবা দিবসের এক কর্মব্যস্ততার ক্ষণে নিঃসাড়ে সুরু হইয়া গিয়াছে ও কয়েক ঘণ্টা পরে উহার আবির্ভাব সম্বন্ধে রমণী সচেতন হইয়াছেন। যাহাহউক, এতৎসম্বন্ধীয় বিভিন্ন প্রতিবেদনগুলি তফশিল্‌বন্দী করিবার পর আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বত্রিশ জন রমণী (বয়স ২১ হইতে ৩৬ বৎসর, মোটামুটি সুস্থ ও পুত্রবতী) পূর্ণিমার শেষদিকে বা কৃষ্ণ প্রতিপদের প্রথম ভাগে মাসিক ঋতুশোণিত দর্শন করিয়াছেন। তের জন রমণী শুক্লা সপ্তমী বা অষ্টমী তিথির মধ্যে ঋতুস্রাবের আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। অবশিষ্ট এগার জনের মধ্যে কাহারো কোন ঋতু আরম্ভ হইয়াছে হয়ত শুক্লা ত্রয়োদশীতে, কোনটি বা শুক্লা চতুর্দশীতে, কোনটি বা পূর্ণিমায়, কোনটি বা কৃষ্ণা দ্বাদশীর ভোগকালে ইঁহাদের মধ্যে আবার চারিজনের দেখিতেছি, অধিকাংশ ঋতুস্রাব আরম্ভ হইয়াছে কৃষ্ণা চতুর্দশীর শেষাশেষি কালে বা অমাবস্যায়। সুতরাং এই শেষোক্ত এগার জনকে আমরা 'অনিয়মিত ঋতুস্রাবী' এই পর্যায়ে আপাতত রাখিয়া দিলাম।

এক্ষণে আমামের এই নিতান্ত সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে পর্যবেক্ষণের ফল যদি সমগ্র বাঙ্গালা দেশের প্রাপ্তবয়স্কা রমণীর উপর প্রযুক্তা করা যায়, তাহাহইলে বলিতে হইবে যে, শতকরা ৫৭.৪ জন রমণীর মাসিক ঋতুস্রাব আরম্ভ হয় পূর্ণিমার শেষাংশে বা কৃষ্ণপ্রতিপদের প্রথমাংশে; শতকরা ২৩'২১ জন রমণীর মাসিক ঋতুস্রাব আরম্ভ হয় কৃষ্ণা সপ্তমী বা

অষ্টমীতে; শতকরা ৭·১৪ জন রমণীর ঋতুস্রাব আরম্ভ হয় কৃষ্ণা চতুর্দশী বা অমবস্যা তিথিতে। ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে অবশ্য এই হিসাবের কিছু তারতম্য ঘটিবে; কিন্তু প্রত্যেক হিসাব-পত্রের ফলাফলই একটি সত্যের প্রতি আমাদের বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া দিবে যে, জগতের বেশীর ভাগ রমণীই পূর্ণিমার নিশি-শেষে বা উহার কাছাকাছি সময়ে ঋতুদর্শন করেন। যাঁহারা অবশিষ্ট থাকেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশ হয় শুক্লা সপ্তমী বা অষ্টমী, নচেৎ কৃষ্ণা চতুর্দশী বা অমাবস্যায় এই সুপরিচিত অতিথির সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

এক্ষণে বাঙ্গালীর রমণীদিগের স্বতঃসঞ্জাত কামনা-জোয়ার সম্বন্ধে স্ফুটতর নির্দেশ দিবার পূর্বে রমণীদিগের ঋতুস্রাবের সহিত চান্দ্রমাসের ঘনিষ্ঠসম্বন্ধের কারণ-নির্ণয়ের একটু নূতনত্বপূর্ণ প্রয়াস পাওয়া বোধ হয় অসমীচীন হইবে না।...গ্রন্থকারদ্বয়ের বিশ্বাস, এখনো জগতের অধিকাংশ রমণীরই পূর্ণিমার ভোগকাল-সময়ে মাসিক ঋতুস্রাব আরম্ভ হয়। তাঁহাদিগের আরো ধারণা যে, আদিম যুগে প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্তা নারীই ঠিক্ পূর্ণিমা তিথিতেই ঋতুস্রাব দর্শন করিত এবং ইহার সমসময়ে তাহাদের মাসিক কাম-জোয়ার পরিপূর্ণতা লাভ করিত। তাহার প্রধান কারণ, ঠিক এই সময়টিতে পুরুষেরো কামনার পারদ-রেখা সর্বোচ্চ সীমায় উঠিত।

আদিম যুগের নরনারী

বানর জাতির মতো প্রথমে ছিল আদিম মানবের গভীর জঙ্গলে গাছে গাছে বাস, তারপর হয় গিরি-গহ্বরে ও মৃত্তিকা-সুরঙ্গে; পরিশেষে তাহার মনে জাগে বাসগৃহ, প্রাচীর ও পরিখার পরিকল্পনা। এক একটি বনে কয়েকটি পরিবার মিলিয়া এক-একটি গোষ্ঠি বা totemএর সৃষ্টি করিত। ইহার দ্বারাই পুরাকালে এক একটি ক্ষুদ্র সমাজের সূচনা

হয়। গোষ্ঠিতে গোষ্ঠিতে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ ছিল অতি সামান্য, বনিবনাও ছিল নিতান্ত কম। আন্তর্গণিক বিবাহ (consanguinity) পৃথিবীর কুত্রাপি কোন গোষ্ঠি বা সমাজে বড় বেশী দিন রাজত্ব করে নাই। সুতরাং এক গোষ্ঠির লোককে প্রথম প্রথম অন্য গোষ্ঠি হইতে নারী-সংগ্রহ করিতে হইত। এবং সংগ্রহ-কার্যটি বহুকাল ধরিয়া বলপ্রকাশ দ্বারাই সম্পন্ন হইত।

এক গোষ্ঠীর বীর যুবকদল বৃক্ষশাখা ও প্রস্তরনির্মিত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া, সাধারণত চতুর্দশী বা পূর্ণিমা রাত্রেই অপর গোষ্ঠির বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিত; কারণ অন্ধকারে একদিকে হিংস্রজন্তুর ভয়, অন্যদিকে ভূত-পরী-দৈত্যদানার ভয়! অভিযানকারী দল যদি জয়ী হইত, তাহাহইলে বিজিত দলের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কা নারীকে তাহারা শ্রেষ্ঠ লুণ্ঠনসম্ভার বলিয়া জ্ঞান করিত। যুদ্ধস্থলেই অনেক সময় বীরগণ তাহাদিগকে ধর্ষণ করিয়া, উভয় পক্ষের স্বতোৎসারিত কামনার জ্বালা প্রশমিত করিত। তারপর স্ত্রীলোকগুলিকে নিজেদের উপনিবেশে আনয়ন করিয়া, পুরুষগণ সাধারণ সম্পত্তিরূপে তাহাদিগকে যতদিন ইচ্ছা উপভোগ করিত। এইভাবে সংহতি-বিবাহের সূত্রপাত হয় *। ইহার বহু সহস্র বৎসর পরে সত্যকার একক-বিবাহের উৎপত্তি হয়। আহৃতা নারীদলের এক-একজনের প্রতি এক-একটি পুরুষের বিশেষ আকর্ষণ, তাহাকে একান্ত নিজস্বভাবে ভোগ করিবার স্পৃহা, অপরের ভোগের দাবীর প্রতি দ্বেষ ও ক্রোধ ইত্যাদি কারণ প্রধানত একক-বিবাহের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল।

* DIE EHE (edited by Dr. Max Marcuse, Berlin, 1927) গ্রন্থে Geza Rohoem-লিখিত "Urformen und Wandlungen der Ehe" শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করুন।

কিন্তু মোট কথা, আদিম যুগের নারীর যৌন-জীবনের হাতেখড়ি সহস্র সহস্র বৎসর কাল ধরিয়া ধর্ষণের মধ্য দিয়া নিষ্পন্ন হইত। সুতরাং নারী যৌবনের সিংহদ্বারে পুরুষের সাক্ষাৎ পাইয়াছে প্রথমে বীররূপে, পরে প্রেমিকরূপে। শত মৃতাহতের মাঝে, বীভৎস-করুণ ক্রন্দনোল্লাসের মধ্যে, অপরিচিত রক্তাপ্লুত যোদ্ধা উন্মত্ত আগ্রহে—হর্ষ ও শোক, আবেগ ও সঙ্কোচ, প্রশংসা ও সংশয়ের মাঝে দোদুল্যমানা তরুণীর সম্মুখে ছুটিয়া আসে। কী অপূর্ব পরিস্থিতির ভিতর, দেহ-মনের কী বিচিত্র ছন্দভঙ্গিম স্পন্দনের ভিতর, রতিরণের সহিত তাহার বাধ্যতামূলক প্রথম পরিচয়!...বীরত্বের আদর—বীরের পূজা তাই নারী এখনো কায়মনোবাক্যে করে; বসুন্ধরার সঙ্গে সঙ্গে নিতান্ত অসুন্দরা বালাও বীরভোগ্যা হইবার সাধ মনে মনে পোষণ করে। তাই যুদ্ধের সময় নিতান্ত সতী-সাধ্বী ও সম্ভ্রান্ত বংশের নারীও অসি-ভূষিত খাকীর উর্দি দেখিয়া সর্বস্ব ভুলিয়া নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দিতে চাহে!···

পৃথিবীর উপর চন্দ্রের আকর্ষণ-শক্তি বৈজ্ঞানিক সত্য। উহার প্রভাবে যেরূপ সাগর-বক্ষ স্ফীত হয়—নদনদীতে জোয়ারের ফেনিল সলিল কিনারা ছাপাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে, ফুলে-ফলে রস-সঞ্চারিত হয়, রজনীতেও প্রজাপতির পুষ্প-বিতানে অভিসার চলে, তেমনি মানুষের

স্ত্রী-পুরুষের উপর চন্দ্রের প্রভাব

ধাতু-প্রকৃতির মধ্যেও একটা পরিপূর্ণতার ভাব দেখা দেয়। প্রাচীন আয়ুর্বেদ-পন্থিগণ ইহাকেই রসবৃদ্ধি বা রসের প্রকোপ বলিয়া অভিহিত করেন। পূর্ণিমা তিথিতে বিশেষভাবে পুরুষের যৌনযন্ত্রাবলীর বাহ্য ও আন্তরস কিছু বৃদ্ধি পায় এবং যৌনবোধ তীব্রভাবে জাগ্রত হয়—ইহা আমরা পর্যবেক্ষণ করিয়াছি, পূর্বেও কোন কোন বৈজ্ঞানিক করিয়াছেন। সুতরাং নারীর কাম-নদীর জোয়ার-ভাঁটা যেমন চান্দ্রমাসিক ঋতুস্রাব-দ্বারা

নিয়ন্ত্রিত হয়, পুরুষের যৌনলিপ্সাও তেমনি মূল চন্দ্রের দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবান্বিত হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

চন্দ্রের সহিত তাই আমাদের আবহমান কালের নাড়ীর টান্। সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহু নারীর ঋতুস্রাব পূর্ণিমার সহিত হয়ত প্রত্যক্ষ যোগসূত্র হারাইয়া বসিয়াছে; মধ্যঋতুর আবির্ভাবের নিমিত্ত বহু রমণী হয়ত অমাবস্যার নিকটবর্তী সময়েও প্রধান ঋতুস্রাব-দর্শনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে; তথাপি চান্দ্রমাসটী এখনো অনেকেরই অব্যাহত আছে।...আকাশে পূর্ণচন্দ্র দেখিলে—কি স্ত্রী কি পুরুষ—উভয়েরই শাশ্বত আত্মার কোন্ এক অজ্ঞাত বীণা-তার লক্ষ লক্ষ বৎসরের ঘুমন্ত স্মৃতির করাঙ্গুলি-আঘাতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে; উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মিলন-রস-মগ্ন মানব-মিথুন তখন প্রাণ খুলিয়া গাহে—"এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো, সে মরণ স্বরগ সমান!"...বিরহী ঘরের কোণে বসিয়া ছট্‌ফট করে, জ্যোছনার এই শুভ্র স্ফটিকাস্তরণের মধ্যখানে ম্লানমুখে বসিয়া সে গুমরিয়া মরে; নচেৎ বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বাতায়নপথে দাঁড়াইয়া গাহিতে থাকে—"এমন যামিনী, মধুর চাঁদিনী, সে যদি গো শুধু আসিত!" কিম্বা—"এত সুখ-আশা প্রাণের পিয়াসা কেমনে আছে সে পাসরি', সেথা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী, সেথা কি বাজে না বাঁশরী!"...অসভ্য, অর্ধসভ্য জাতিদিগের ভিতর যতগুলি প্রমোদ-উৎসব প্রতিষ্ঠিত, তাহার অধিকাংশ পূর্ণিমা রজনীতেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ঝুলন, রাসযাত্রা, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা, পুষ্যাভিষেক, বহ্ন্যুৎসব (চাঁচর) প্রভৃতি হিন্দু পূজাপার্বণ ও নরনারীর আনন্দ-মেলা পূর্ণিমার মুখাপেক্ষী হইয়াই বাঁচিয়া আছে!

সুতরাং একদিকে ঋতুস্রাব, অন্যদিকে পূর্ণিমাকে বাদ দিয়া নারীর কাম-জোয়ারের সময়-নির্ণয় কোনমতেই সুসাধ্য নহে। আমাদের দেশের

রমণীগণের এক শ্রেণীর সব চেয়ে বড় কাম-জোয়ারটি আসে—ঋতুস্রাবের অব্যবহিত পরের মোটামুটি পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম দিবসের তিনটি তিথি ব্যাপিয়া; তারপর চতুর্দশ দিবস-সন্নিকটে আর একটি, একবিংশতি দিবস-সন্নিধানে আর একটি ও অষ্টাবিংশ দিবস-সমীপে আর একটি ক্ষুদ্রতর কাম-জোয়ার আসে; সাধারণত ইঁহাদের মাসিক ঋতুস্রাব আরম্ভ হয় শুক্লা সপ্তমী বা অষ্টমী তিথিতে। আর এক শ্রেণীর ঋতুর সপ্তম, চতুর্দশ ও একবিংশতি দিবসে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কাম-জোয়ার আসে এবং পঞ্চবিংশতি, ষষ্ঠবিংশতি ও অষ্টবিংশতি দিবসের তিনটি তিথি ব্যাপিয়া সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কাম-জোয়ারটির আবির্ভাব হয়; ইঁহারা সাধারণত কৃষ্ণপ্রতিপদ তিথির মধ্যেই মাসিক শোণিত-নির্গমের প্রারম্ভ দেখিতে পান্। অতঃপর-সন্নিবিষ্ট রেখাচিত্রদুইটি দেখিলে বুঝা যাইবে যে, এই উভয় শ্রেণীর রমণীগণই পূর্ণিমার সমসময়ে বৃহৎ কামজোয়ারটি অতিবাহিত করেন। এতৎসহিত আর একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, চতুর্দশ ও অষ্টাবিংশতি দিবস-সন্নিধানে একদিকে যেমন প্রত্যেক নারীর অণ্ডাণুস্ফোটন হয়, অন্যদিকে তেমনি কাম-জোয়ারও উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে। সুতরাং এতদুভয়ের মধ্যে একটা স্বাভাবিক যোগাযোগের অস্তিত্ব অনুমান করা বোধ হয় অন্যায় হইবে না *।

যাহা হউক, পূর্বকথিত কামোদ্রেকের মাসিক চারিটি মরসুম্ ব্যতীত, ঋতুস্রাবের কয়দিনও রমণীর আসঙ্গলিপ্সা নিতান্ত অল্প থাকে না, বরং কাহারো কাহারো অত্যধিক হইয়া উঠে। পূর্বেই আভাস দিয়াছি,—কেবল কান্তিরস-(esthetic

ঋতুস্রাবে রমণীর কাম

---

* Van de Velde's OVARIAN FUNCTIONS, UNDULATORY MOVEMENT, AND MENSTRUAL HAEMORRHAGE নামক গ্রন্থ দেখুন (Jena, 1905).

sentiment) ভঙ্গ ও পুরুষের ঘৃণা-উদ্রেকের আশঙ্কায়, রমণীরা প্রাণপণে এইকালীন্ কামনার গলায় শক্ত শৃঙ্খল পরাইয়া রাখেন। আর্তব-শোণিতের প্রতি চিরপোষিত সামাজিক বিতৃষ্ণার অনুপ্রেরণাই সাধারণত রমণীকে এইকালে কামাবেশ দমনের শিক্ষা দেয়। আদিমকাল হইতে রক্তের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা, বিবমিষা ও একটা সঙ্গত আতঙ্কের ভাব মানব-মনে বাসা বাঁধিয়াছে। সহস্র সহস্র বৎসর পরেও সভ্যতাভিমানী মানবের মন হইতে সেই সংস্কার একেবারে মুছিয়া যায় নাই। এই সময় নারীর মানসিক ও দৈহিক অবস্থার সামান্য পরিবর্তন হয় সত্য ; কিন্তু তাঁহাকে অস্পৃশ্যা করিয়া রাখিবার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ নাই।...

স্বামী ঋতুস্রাবের বিষয় না জানিয়া, অত্যন্ত অধীর আগ্রহ প্রকাশ করিলে এবং পত্নী দুর্দমনীয় ইচ্ছায় আত্মহারা হইয়া পড়িলে, অনেক সময় নারীকে এই সময় যৌন-সম্মতি দিতে দেখা যায়। কিন্তু কাম-নিবৃত্তির পর যখন স্বামীর চক্ষে আসল ব্যাপারটি ধরা পড়ে, তখন নারী একেবারে ন্যাকা সাজিয়া, হয় বলেন যে, সহবাস-সময়ের মধ্যেই তাঁহার ঋতুস্রাব সদ্য আরম্ভ হইয়াছে ; নচেৎ বলেন যে, তাঁহার মাসিক বন্ধু নিঃসাড়ে চুপি চুপি আসিয়া কখন্ যে দেহাঙ্গনের এক কোণে বসিয়া আছে—তাহা তিনি বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই। তারপর তিনি স্বামীর সম্ভাবনীয় বিরক্তির ভাবকে লঘু করিবার জন্য অনুতাপ ও আত্মগ্লানি প্রকাশের মনোজ্ঞ অভিনয় করেন।...ইতঃপূর্বেই আভাষ দিয়াছি যে, ঋতুস্রাবকালীন্ সহবাসে পুরুষের পরিতৃপ্তির যেমন একদিকে অনেকটা ব্যাঘাত ঘটে, সেইরূপ অন্যদিকে উভয়েরই দৈহিক ও মানসিক সুস্থতার যৎসামান্য হানি হইতে পারে। 'যৎসামান্য' শব্দটি ব্যবহারে আশ্চর্য হইবার কারণ নাই। মহামহিম পণ্ডিত হইতে আপামর-সাধারণের ধারণা যে, 'অত্যন্ত বেশী' ক্ষতি হয়। কিন্তু শোণিত-স্রাবে জরায়ু-মধ্যে শুক্রকীট

গমনের বাধা জন্মে ও তৎফলে গর্ভধারণের সম্ভাবনা কম হয় বলিয়াই মুনিঋষিগণ শোণিতস্রাবী নারী-অভিগমন বিষম অনিষ্টকর বলিয়া বিধান দিয়াছেন।

নারীর ন্যায় পুরুষের কাম-জোয়ার চান্দ্রমাসের কোন্ কোন্ তিথিতে জাগে, তৎসম্বন্ধে কোনরূপ প্রণালীবদ্ধ অনুসন্ধানের চেষ্টা আমাদের দেশে বা পাশ্চাত্য জগতে চলে নাই। জার্মান্ ডাক্তার উইলহেল্ম্ ফ্লীজ্, হার্মান্ স্ভোবোডা প্রমুখ মুষ্টিমেয় বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ে যৎসামান্য চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু ব্লক, ফোরেল, হ্যাভ্লক্ এলিস্ প্রমুখ লব্ধপ্রতিষ্ঠিত মহাজনগণ ইঁহাদের আবিষ্কৃত তথ্যের উপর পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। আমাদের দেশের "কামসূত্র," "অনঙ্গরঙ্গ" ও "কোকশাস্ত্রে" স্ত্রী বা পুরুষের কাম-জোয়ার সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া অবকাশ হয় নাই। গত ছয় বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা দেশের নানা স্থানে ও বাঙ্গালার বাহিরে কয়েকটি শহরে সীমাবদ্ধ অনুসন্ধানের পরিণামে আমরা আপাতত সিদ্ধান্ত করিতে পারিয়াছি যে, নারীর ন্যায় পুরুষের যৌন-জীবনে আটাশ দিনের এক-একটা কালক্রম আছে, এবং নর-নারীর সকলেই পূর্ণিমা তিথিতে অবিসম্বাদিতভাবে আপন অন্তর-সৈকতে বসিয়া কাম-জোয়ারের জলকল্লোল শ্রবণ করে।

পুরুষের স্বতঃসঞ্জাত কাম-জোয়ার

একটা সার্বজনীন্ নিয়ম-সূত্র বাহির করিতে গিয়া দেখিতে পাইতেছি যে, পূর্ণিমার সময় যে কাম-জোয়ারটি আসে, তাহা পুরুষের বেলায়ও সর্বাপেক্ষা তীব্র ও অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। মোটামুটি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, শুক্লা চতুর্দশী ও পূর্ণিমা এই দুইটি তিথি পুরুষের প্রধান কাম-জোয়ারের স্থায়িত্ব-কাল। কৃষ্ণা চতুর্দশী ও অমাবস্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—আর একটি তীব্র কাম-জোয়ার। শুক্লা ও কৃষ্ণা সপ্তমী বা অষ্টমীর

নিকটবর্তী সময়ে আর দুইটী ক্ষণস্থায়ী কাম-জোয়ার আসে; ইহা কয়েক ঘণ্টা মাত্র স্থায়ী হইতে পারে। কি স্ত্রী কি পুরুষ, প্রায় সকলেই সমস্ত যৌবনকাল ব্যাপিয়া এই সাত দিন বা সাড়ে সাতটি তিথির মাঝামাঝি আর একটি করিয়া ক্ষীণতম কৃত্রিম কাম-জোয়ার অনুভব করেন। এইগুলি অনেকটা অভ্যাস বশে ও প্রয়োজনীয়তার খাতিরে যেন দ্বিতীয়-প্রকৃতিতে পরিণত করা হইয়াছে।

শাস্ত্রের অশাস্ত্রীয় বিধান

অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পৌরাণিক যুগের সমাজ-গুরুগণ মনসিজের এই স্বতঃজাগৃতির দিন কয়টিতেই (শুক্লা ও কৃষ্ণা অষ্টমী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায়) তৈল-মৎস্য-মাংসাদির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-সম্ভোগও নিষিদ্ধ বলিয়া বিধান দিয়া গিয়াছেন। সংসারী ব্যক্তিদের এ অনাবশ্যক সংযম-শিক্ষা দিবার কি গুরুতর উদ্দেশ্য ছিল জানি না। অন্যান্য দিন অপেক্ষা ঐদিন কয়টিতে অধিকতর বীর্যক্ষয় হয়—এ ধারণাও অমূলক।...এস্থলে পুনরায় উল্লেখ করি যে, শহরের কৃত্রিম আড়ম্বর-বিলাস ও প্রলোভনপূর্ণ জীবন-যাপন ও তথাকথিত সভ্যতার অপরিহার্য অলঙ্কার স্বরূপ কামোত্তেজনার নানাবিধ বাহ্য উপাদানের অস্তিত্ব মানুষের যৌন-জীবনটিকে চন্দ্র ও চান্দ্রমাসের সহিত সম্পর্কশূন্য করিবার চেষ্টা করিতেছে বটে; কিন্তু জগতের বেশীর ভাগ নর-নারীই এখনো সে নাড়ীর টান্ ভুলিতে পারে নাই।

শনি ও রবিবারের কাম-জোয়ার

শহরবাসীগণ পূর্ণিমার মুখ না চাহিয়াও, প্রতি সপ্তাহ-শেষে কাম-জাগরণের একটা সুনিশ্চিত সময় এমনভাবে নির্ধারিত করিয়া লইয়াছেন যে, তাহা কৃত্রিম হইলেও অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। শনি ও রবিবার বহু শহরবাসীর পক্ষেই কাম-জোয়ার-আগমনের

সুপ্রত্যাশিত কাল। কিন্তু দেখুন, চান্দ্রমাসিক সেই সাত দিনের বা সাড়ে সাতটি তিথির নিরীখ্‌টি ঠিক্ আছে। আবার সপ্তাহ-শেষের যাত্রিগণ দয়া করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে, যে শনি বা রবিবারে পূর্ণিমা তিথির উদয় হয়, সেদিন তাঁহাদের যৌনলিপ্সা কত তীব্র হয়—পত্নী-সম্মিলন সেদিন কত প্রগাঢ় আহ্লাদের আস্বাদন দেয়!··· কলিকাতার নিতান্ত অ-কবি অর্থলিপ্সু ব্যবসা-ধুরন্ধর ব্যক্তিও পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল্ বা বোমপাস্ হ্রদে প্রণয়িনীকে লইয়া মোটর-বিহারে বাহির হইতে অনেক সময়ই প্রলুব্ধ না হইয়া পারেন না; অনেক প্রবাসী অধ্যাপকই হোস্‌টেলের জানালার ফাঁকে চন্দ্রালোকের হাতছানি দেখিয়া ব্যথাতুর অনিদ্রায় নিশ্চয়ই শয্যাকণ্টক উপভোগ করেন!

প্রতি চান্দ্রমাসে পূর্বকথিত ছয়টি দিন বা তিথি ব্যতীত অন্য সময় গড়্‌পড়্‌তা রমণীগণ আসঙ্গলিপ্সার জন্য লালায়িত হন না,—বিশেষ করিয়া একবিংশতি দিনের পরবর্তী পাঁচ-ছয়টি দিন। এটা তাঁহাদের যৌন-নদীতে নিরুচ্ছ্বসিত ভাঁটার কাল। এ সময় স্ত্রীতে উপগত হইলে, স্ত্রীর আনন্দও একদিকে যেমন ঘন হয় না, অন্যদিকে তেমনি প্রায় ক্ষেত্রেই গর্ভোৎ-

নারীর কামনার ভাঁটা

পাদনের সম্ভাবনা থাকে অতি অল্প। জন্ম-শাসনের মানসে এই নিরাপদ কালে অভিগমনে পুরুষেরা অনেকটা পরিতৃপ্ত হইতে পারেন, মূল উদ্দেশ্যও বহু পরিমাণে সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু নারীর তৃপ্তির কণ্ঠরোধ করিয়া দেওয়া হয়। পুরুষের নির্বন্ধাতিশয্যে এই সময় স্ত্রী আত্মদান করিতে পারেন, তাঁহার সম্মতি আছে—তাহাও ঘাড় দুলাইয়া স্বীকার করিতে পারেন; কিন্তু ইহা কেবল স্বামী-দেবতার খুশীমতো চাওয়া ও পাওয়ার অধিকারকে খর্ব করার ভয়ে অকাল-বোধনের ভাণ মাত্র!

অবশ্য এরূপ দুই-চারিটি অসাধারণ স্ত্রীলোকের (বয়স ২১ হইতে ৩১ বৎসর) জীবনী আমাদের হাতে আসিয়াছে, যাঁহারা মাসের প্রায় সকল দিনই কামনার স্পন্দনকে উপস্থিত দেখিতে পান ; তবে জোয়ারের সময় ওই লালসার বহ্নি অত্যন্ত বেশী ও অন্য সময়ে অপেক্ষাকৃত কম জ্বলে। ইঁহাদের আরো একটা বিশেষত্ব এই যে, ঋতুকালে আর্তব-স্রাবের কয়েকটি দিন বাদে প্রথম একুশ দিনের প্রায় প্রত্যেক তিথিতেই যাঁহারা কাম-কাতরা হইয়া পুরুষের নিকট উপযাচিকা হইবার নির্লজ্জ-তাকে দমন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন, তাঁহারা শেষের পাঁচ-সাতটি তিথিতে সানুনয় ভিক্ষার হীনতা আর স্বীকার করেন না। তবে প্রেমিক-প্রবর একটু অগ্রসর হইয়া প্রাথমিক সোহাগ আরম্ভ করিলে, সহজে জাগ্রত হইয়া উঠেন এবং আনন্দ-মদিরা পূর্বের ন্যায় প্রায় সমভাবেই উপভোগ করিতে পারেন।

আবার এমন বহু নারী আছেন, যাঁহারা যৌন-মাসিক ভাঁটার সময়ে বহুক্ষণ প্রাথমিক উপচার-লাভের পর তবে কতকটা জাগ্রত হইয়া উঠেন। উপচার নারী সর্ব সময়েই চাহে ; কিন্তু এই ভাঁটার সময়টিতে একটু বেশীক্ষণ ধরিয়া অত্যন্ত নিবিড়ভাবে উহা প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। নচেৎ এই শ্রেণীর নারীর মূলাধার-অধিদেবতার কুম্ভকর্ণ-নিদ্রা কোনক্রমে ভঙ্গ করা যায় না।

অধিকাংশ (শতকরা নিরনব্বইটির কম নহে) নারীই ঋতুকালের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী বৃহত্তম কাম-জোয়ারের শেষ সময়টিতে অসম্বরণীয় আসঙ্গ-লিপ্সার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়েন। সে লিপ্সাকে প্রদমিত করা তাঁহাদের পক্ষে একপ্রকার দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। বিভিন্ন নারীর মধ্যে এই দিনটির বিভিন্নতা দেখা যায়। কেহ ঋতুর

"কামচূড়" বা উচ্চতম কাম-জাগৃতির দিন

সপ্তম দিবসে (অর্থাৎ সাড়ে সাতটী তিথির মাথায়) কেহবা ঋতু আরম্ভের পূর্বদিন এই কামচূড়ের আবির্ভাব অনুভব করেন। পূর্বে যে কাম-জোয়ারের চারিটী মরসুমের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহারই মধ্যকার সর্ববৃহৎ মরসুমটীর শেষদিকেই ইহার উদয় হয়। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ রমণীরই পূর্ণিমা-তিথির ভোগকালের মধ্যেই কামচূড়ের কলোচ্ছ্বাস আসিতে দেখা যায়। স্বামী সন্নিকটে থাকিলে এবং তিনি নারীর ভাব-ভঙ্গীর মোহন আমন্ত্রণের মর্ম বুঝিতে না পারিলে, অনেক রমণী এই বিশেষ দিনটিতে স্বামীর নিকট অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থবোধক ভাষায়, ও প্রয়োজন হইলে নিজেই উদ্যোগী হইয়া, অবুঝ স্বামীর কামনা উদ্দীপিত করিতে বাধ্য হন্।

ঋতুস্রাবের অব্যবহিত পূর্বের বা পরের এই বিশেষ দিনটি রমণীর পক্ষে মহাদৌর্বল্যময় কঠিন পরীক্ষার কাল। এই কামচূড়ের দিন স্বামী অনুপস্থিত থাকিলে, রমণী একদিকে যেমন অতিশয় ক্ষুব্ধা, ক্রুদ্ধা, বিষণ্ণা, ক্ষিপ্তা বা অভিমানিনী হইয়া পড়েন, অন্যদিকে তেমনি অপর পুরুষের সামান্য প্রলোভনের পাদপীঠতলে অনায়াসে আত্মবলি দিতে পারেন। ক্রমাগত ব্যর্থকাম কামচূড় আসা-যাওয়া করিতে করিতে ও তজ্জনিত নৈরাশ্য-জ্বালা সহিতে সহিতে বহু পূতচরিত্রা কোমলাঙ্গীর একটা অশুভ সন্ধিক্ষণে এমন অসম্বরণীয় লিপ্সা জাগিতে পারে যে, তাহা উল্লঙ্ঘন করা দুঃসাধ্য বলিয়া বোধ হয়; তখন আর আত্মসম্ভ্রম, জাতি-কুল, সুনাম, সম্পর্ক প্রভৃতির বিচার-বুদ্ধি থাকে না। এ পর্যন্ত বিবাহ-জীবনে অল্পাধিক সুখী ও সন্তুষ্টা যত নারী স্খলিতচরিত্রা হইয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই বোধ হয় চান্দ্রমাসের এই দুর্দম্য কাম-চূড়ের দিনটিতেই, স্বামীর অনুপস্থিতিতে বা হতাদরে, পর-পুরুষের নিকট অন্ধ উন্মত্ততায় আত্মবিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন।...সমগ্র মাসের অন্যান্য দিনগুলিতে

স্বামীর আদর-যত্ন প্রাণ ভরিয়া পান্ বা না পান্, কামচূড়ের দিনে নারী—পুরুষের বিস্মৃতি, অবহেলা বা উদাসীনতা আদৌ সহ্য করিতে পারেন না।

মোট্ কথা, প্রত্যেক বুদ্ধিমান পুরুষেরই পত্নী বা উপপত্নীর রজোনির্গম-কালের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, উহার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কালাগত বৃহত্তম কাম-জোয়ারটির সম্মুখীন্ হওয়া উচিত সশ্রদ্ধ ব্যাকুলতায়। এই কাম-জোয়ারের মধ্যস্থ একটি বা দুইটি রাত্রে রমণীকে দুই তিন বার যৌনানন্দ দান করিয়া, তাঁহারা একপ্রকার নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে আরো সাতাশ-আটাশ দিন নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন। প্রবাসী ভদ্রলোকদিগকে বিশেষভাবে শুনাইয়া দিতে চাহি যে, ঋতুস্রাবের কয়টি দিনে এবং ওই বৃহত্তম কাম-জোয়ারের সমসময়ে, যুবতী—যুবতী কেন—প্রৌঢ়ার মনও যেমন চঞ্চল, তেমনি দুর্বল হইয়া পড়িতে পারে; কামোন্মাদ-বশে অনেকে শুধু যে দ্বিচারিণী বা বহুচারিণী হইয়া পড়ে—এমন নহে, বহু ফৌজদারি অপরাধও অসঙ্কোচে সাধন করিতে পারে; কেহ কেহ হত্যা পর্যন্ত।... সুতরাং সাবধান!

এখানে দৃষ্টান্ত দিয়া ব্যাপারটির উপর একটু ভালো করিয়া আলোকপাত করিবার চেষ্টা করিলে ক্ষতি নাই। অধ্যাপক ফোরেল্ তাঁহার "Sexual Question" নামক গ্রন্থে (৯২ পৃষ্ঠায়) এমন একটি নারীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যিনি প্রতি চতুর্দশ দিবসের একটি বিশেষ সময়ে এরূপ দুঃসহ কামজ্বালায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেন যে, স্বামীর অনুপস্থিতিতে তিনি যাহাকে সম্মুখে পাইতেন, তাহার দ্বারাই আত্ম-প্রশমনের উদ্যোগ করিতেন।...

কামচূড়ের প্রভাব সম্বন্ধীয় উদাহরণ

কলিকাতার কোন্ শিক্ষিত ধনীর গৃহে জনৈক মোটামুটি শিক্ষিত ব্রাহ্মণ যুবক মোটর-

চালকের কার্য করিত। গৃহে প্রায় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বৎসর বয়স্কা গৃহিনী ও তাঁহার সতের-আঠার বৎসর বয়স্কা কন্যা, আর একটী ছোট ছেলে; স্বামী কলিকাতার অনতিদূরে কোন দায়িত্বমূলক উচ্চপদে কার্য করেন। শনিবার সন্ধ্যায় তাঁহার নিজের মোটর গিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিত; পুনরায় সোমবার প্রাতে মোটর তাঁহাকে কর্মস্থলে পৌছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিত। ঘটনাচক্রে সেই ব্রাহ্মণ-যুবকের সহিত মহিলাটির কলুষিত সম্পর্ক স্থাপিত হয়; নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও ড্রাইভার যুবকটি এই লীনযৌবনার কাম-বহ্নিতে ইন্ধন যোগাইতে বাধ্য হইত।

এই যুবকটির পরিবারের সহিত গ্রন্থকারের বহুদিনের পরিচয়। গ্রন্থকারের নিকট এই গুপ্তপ্রণয়-কাহিনী বিবৃত করিয়া উপদেশ লইবার কালে, যুবকটী বলিয়াছিল—পূর্ণিমা বা তন্নিকটবর্তী দুই-তিনটি দিনের রাত্রে গৃহিণী একাকিনী নিজ-মোটরে চড়িয়া, গঙ্গার ধার, সাহা-গঞ্জ ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চতুর্দিকে বেড়াইতে বাহির হইতেন; একান্তে উপযাচিকা হইয়া যুবকটিকে আদর-সোহাগ করিতেন এবং গৃহে ফিরিয়া মধ্যরাত্রে তাহাকে পুনঃপুন রতিক্রীড়ায় নিযুক্ত করিতেন। কিন্তু আশ্চর্য যে, মাসের অন্য দিন কয়টিতে স্বামীর অনুপস্থিতি ও যথেষ্ট সুযোগের বিদ্যমানতা সত্বেও তিনি শীতল ও গম্ভীর থাকিতেন; প্রকাশ্যে বা গোপনে নিষ্ঠাবতী প্রভুপত্নীর ভূমিকা স্বভাবসঙ্গতভাবে অভিনয় করিয়া যাইতে তাঁহার কোথাও বাধিত না। যুবকটি আরো লক্ষ্য করিয়াছিল যে, কোন কোন মাসে নিধুবন-সম্পাদনের অব্যবহিত পরেই সে রমণীর যোনিনালী রক্তাক্ত দেখিতে পাইত, অর্থাৎ সেই সময়টিতে তিনি ঋতুদর্শন করিতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে স্রাবকালের মধ্যেও তিনি যুবকটিকে নিজ শয্যাপার্শ্বে আমন্ত্রণ করিতেন। এই অশালীন রঙ্গনাট্যের উপসংহার

অত্যন্ত মর্ম্মন্তুদ—একান্ত বিয়োগান্ত ;—তাহার বিবরণ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন !···

পল্লীগ্রামের কোন্ সচ্ছল গৃহস্থ-ঘরের বধূর স্বামী কলিকাতায় কোনো সদাগরী আফিসে একশত টাকা মাহিনায় চাকুরী করিতেন। যুবকটির বয়স প্রায় ত্রিশ, বধূটির বয়স প্রায় উনিশ। যুবকটির প্রকৃত নাম গোপন রাখিয়া একটা মন-গড়া নাম রাখা গেল—ফণীবাবু ; যুবতীটির কাল্পনিক নাম দেওয়া গেল ললিতা। দেশে এক প্রৌঢ় ভাসুর, তাঁহার পত্নী, এগারো বৎসরের একটি ভাসুর-পো, এণ্ট্রান্স ক্লাসের ছাত্র—একটি অবিবাহিত ছোট ভাই, বৃদ্ধা মাতা, একটি চল্লিশ বৎসর বয়স্কা বিধবা ভগ্নী, একটী সাত বৎসর বয়স্ক ভাগিনেয় ও এই বধূটি থাকেন। এক শত টাকায় কলিকাতায় বাসা করিয়া স্বামী-স্ত্রীতে ভালো রকমে থাকা চলে বটে ; কিন্তু সমস্ত সংসারটিকে কলিকাতায় আনিয়া সংপোষণ করা বস্তুত অসম্ভব।

দেশে বৎসরের খরচ চলার মতো ধান্যের সংস্থান ছিল। ফণীবাবু একশত টাকা মাহিনা হইতে বাড়ীতে চল্লিশ টাকা ও স্ত্রীর হাত-খরচের জন্য পৃথক পাঁচ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দিতেন। নিজের খরচ ও প্রতি মাসে লাইফ্ য়্যাসিওরেন্সের পাঁচ টাকা প্রিমিয়াম দিয়াও মাসিক পনের কুড়ি টাকা করিয়া তাঁহার জমিত। পূজার সময় বারো দিন ও বড় দিনের সময় দশ দিন ছুটি থাকিত। যাতায়াতের সময়টুকু বাদ দিয়া, বৎসরে মাত্র আঠারোটি রাত্রি ফণীবাবুর স্ত্রীর মুখ দেখিতে পাইতেন।···পূর্ণ যুবক-যুবতীর প্রখর প্রথম-প্রেম-লালসা-পরিতৃপ্তির পক্ষে এই কয়টি দিনই কি যথেষ্ট ছিল ?—নিশ্চয়ই নহে।

বিবাহিত জীবনের সাতটি বৎসর এইভাবেই উভয়ের কাটিয়াছে। পুরুষের কাম-লালসা অন্যভাবে চরিতার্থ করিবার শত পন্থা উন্মুক্ত ছিল ;

কিন্তু ওই মুখ্‌চোরা অবগুণ্ঠিতা নতশিরা নারীর অন্তরের অন্তরালে প্রতি মাসের একটি বা দুইটি দিনে যে মহাযজ্ঞের প্রচণ্ড অনল জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে, তাহার হবি কোথায়—তাহার হোতা কোথায়—তাহার বসুধারা কই?...বলা বাহুল্য, গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া ললিতা এক-একটা বিশেষ দিবসে স্বামীর অভাব বিশেষ করিয়াই বোধ করে। বিশেষ করিয়া ঐ সময়ে সে নিরালে বসিয়া কাঁদে, পেট ভরিয়া আহার করে না, স্বামীর পত্রের উত্তর দেয় না, কেশ-বেশ-প্রসাধনে যত্ন লয় না, প্রাকৃতিক ও সামাজিক কোনো উৎসবেই সাড়া দেয় না। কলের পুতুলের মতো শুধু সংসারের নিত্যকার কর্ম করিয়া যায়,—শ্বাশুড়ীর আপ্যায়ন, জায়ের মৃদু ভর্ৎসনা, ননদের প্রচ্ছন্ন গঞ্জনা শুনে,—তাহাতে অনুরণনা নাই, সাড়া নাই, ভ্রূক্ষেপ নাই!

কিন্তু এই জোর-করিয়া-আনা বাহ্য বৈরাগ্যের অন্তরালে তাহার মনের নিভৃততম কোণে একটা অতৃপ্তির চির-অকুণ্ঠিত বহ্নি যে প্রধূমিত হইয়া বাড়িয়াই চলিয়াছে, তাহাকে নির্বাপিত করার সাধ্য তো তাহার নাই! সমস্ত বক্ষ জুড়িয়া একটা শিকল-পরা অদৃশ্য পাগল যে দাপাদাপি করিয়া তৃষাতুর কণ্ঠে বুক-ফাটা চীৎকার করিতেছে, তাহার কণ্ঠরোধ করার ক্ষমতা সে তো খুঁজিয়া পায় না। ফণীবাবু তো প্রতিবারেই পূজার সময় ভালো কাপড়-জামা-বিলাস-দ্রব্যাদি আনেন্, বড়দিনের অবকাশ-বাসরে ষোড়শোপচারে প্রেয়সী-পূজা করেন্। নির্মম আফিস্ যে সামান্য কয়টা দিন তাহাকে স্বর্গের সুধা-ভাণ্ড মুখে তুলিবার স্বাধীনতা দিয়াছে—সেই কয়টা দিনই বেশ নিবিড় উৎসাহের সহিত সুরতানন্দ উপভোগ করেন্। তবু নারীর বিদ্রোহী বেইমান্ মন উচ্চতর আশার মোহে দেহ-কারাগারের লৌহ কবাটে মাথা খুঁড়িয়া মরে কেন?

সেবার মাতাঠাকুরাণী সূর্যগ্রহণোপলক্ষে সপরিবারে কলিকাতায়

যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ; সেই যাত্রায় কয়দিন থাকিয়া কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা প্রভৃতি দেখিয়া আসাও সকলের সাব্যস্ত হইল। হাওড়ায় গৃহিনীর এক মাসতুতো ভাইয়ের বাসা আছে, সেইখানেই উঠিবেন স্থির হইল। মেজো ছেলেকে স্টেসনে হাজীর থাকিবার আদেশ-পত্র ডাকে দেওয়া হইল। দুর্দৈব,—রওনা হইবার পূর্বদিন প্রাতে ললিতা রজোদর্শন করিল। শ্বাশুড়ী রাগ করিলেও; ভাসুর বলিলেন—এক পক্ষে ভালোই হইল, খোকার (ছোট ভাইয়ের) সম্মুখে ম্যাট্রিক্ পরীক্ষা, এ সময়ে কলিকাতায় গেলে তাহার পড়াশুনার যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। বউমা আর খোকা দুজনে থাকুক্,—চাকর ত রহিলই। আমরা দিন পাঁচকের মধ্যেই তো ফিরিয়া আসিতেছি !···

ললিতা দুই দিন পরে ঋতুস্নান করিল। দুই জনেই এক ঘরে শয়ন করে—খোকা তক্তাপোষের উপর, বউদিদি মাটিতে বিছানা পাতিয়া। এমনি করিয়া এক, দুই, তিন দিন যায় ; তারপর সেই সুপরিচিত অতিথি—দুর্দমনীয় কামচূড়ের আবির্ভাব !...তেপান্তরের মাঠের মধ্যে মানুষের তৃষ্ণা যখন দুরন্ত হইয়া উঠে, তখন আপনার খিড়্কীর-দ্বারে স্বচ্ছ জলের পুষ্করিণীর কথা মনে পড়িয়া আপ্শোষ জাগিলেও সম্মুখে কাদা-ঘোলা জলের বিশীর্ণ ডোবা দেখিয়া বিচার করিবার অবসর থাকে না যে, এই জল পান করিয়া আমার তৃষ্ণা নিবারণ হইবে বটে, কিন্তু পরে হয় তো মারাত্মক কলেরা বা আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইব। যদি বা কেহ এইরূপ বিচার করে, তথাপি ভবিষ্যতের বিপদকে তুচ্ছ করিয়াই সে বর্তমানের সঙ্কটকে কাটাইয়া উঠিতে ব্যগ্র হইয়া উঠে। ইহাই মানুষের স্বভাব ; এবং সর্ব দেশের সর্বকালের সর্বপ্রকার সাধারণ মানুষের পক্ষেই এ সত্য প্রযোজ্য।···এতদিনের ক্রমাগত উপেক্ষিত ক্ষুধিত অতিথি আজ রুদ্র অভিশাপের ভয় দেখাইয়া গৃহস্থের কুটির-মধ্যে আসন বিছাইয়া

বসিল ।···কেবল মাত্র একটি দিনের সৎকারেই দুর্বার অতিথি যেন কিছুদিনের জন্য পরিতৃপ্ত হইল ; তাহার শুষ্ক মুখে হাসি ফুটিল—তাহার শীর্ণ বুকে বসন্তের বাগান বসিল !

কিন্তু সমাজের সহস্র জাগ্রত চক্ষুকে এই নীরব অতিথি-সৎকার ফাঁকি দিতে পারিল না ; প্রকৃতিও ছিন্নমস্তার মতো আপন খেয়ালের প্রবল প্রতিশোধ আপন হস্তে লইতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। তখন ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি ; ফণীবাবু তিন মাস পূর্বে বড় দিনের বন্ধে বাড়ী আসিয়া গিয়াছেন। সুতরাং স্বামীর তিন মাস কাল অনুপস্থিতির পরে বধূর গর্ভসঞ্চার অমার্জনীয় অপরাধ। সমাজকে ফাঁকি দিবার যো ছিল না,—পরিবারস্থ কাহারো, এমন কি স্বামীরও ইচ্ছা ছিল না। পাঁচ মাসের গর্ভ-ভারাক্রান্ত নারী শুষ্কচক্ষে কলিকাতার এক অবলাশ্রমে আসিয়া আশ্রয় লইল। শ্বশুর-বাড়ীর সকলে পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া ও শ্বেত পৈতার পদতলে মোটা দক্ষিণা ফেলিয়া, শুদ্ধ ও সমাজগ্রাহ্য হইলেন।...

আর এক কথা,—দুধের বাছা সতেরো বৎসরের অপাপবিদ্ধ "খোকা" যে এরূপ পৈশাচিক কর্মের প্রলুব্ধ অংশীদার হইবে, একথা কেহই বিশ্বাস করে নাই ; সুতরাং বাটীর প্রৌঢ় ভৃত্যটির সহিত এই ঘটনার সম্বন্ধ-সূত্র স্থাপিত হইল। অবশ্য বহুদিনের পুরাতন চাকর, এবং ভাসুর-পোকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে,—কাযেই বেচারী বিনা দোষে হাত দুই নাকে-খৎ দিয়া নিষ্কৃতি পাইল !······

ষষ্ঠ প্রপাঠ

যৌবনান্তে যৌন-জীবন

বাঙ্গালীর মেয়েদের যৌবন ত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। ক্বচিৎ কখনো কোন কোন বাঙ্গালী রমণী বড় জোর ছত্রিশ পর্যন্ত তাঁহাদের প্রলম্বিত যৌবন ধরিয়া রাখিতে পারেন; তারপর প্রৌঢ়ত্ব আসিয়া তাঁহাদের দেহ অধিকার করে। অনেক সময় আমরা নারীর বহুপুত্রবতীত্ব ও স্তনাবনমনকেই বিগতযৌবনত্বের লক্ষণ বলিয়া স্থির করি। কিন্তু এই ধারণাকে আংশিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও আর একটা সত্যকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না যে, কৈশোরে বিবাহ করিয়া বহু সন্তানের জননী হওয়ার ফলে যৌবন যত শীঘ্র যায়, তদপেক্ষা দ্রুত যৌবন চলিয়া যায় তাহাদের—যাহারা যৌবনের প্রথম তিন-চারি বৎসরের মধ্যেও নিয়মিত ও নিশ্চিন্তভাবে পুরুষ-সংসর্গ করিতে পায় না। অকালমাতৃত্ব ও দ্রুতপর্যায়ে গর্ভধারণ নারীর রূপ-যৌবন-স্বাস্থ্য নির্মমভাবে হরণ করে সত্য; কিন্তু এরূপ তথাকথিত "কুড়িতে বুড়ী" সধবা যদি দশটি পাওয়া যায়, তাহাহইলে যৌনবোধে সুপরিপক্কা কলেজগামিনী কুমারীদিগের মধ্যে "উনিশে ফিনিশ্" আরো দশটি নিশ্চয় দেখিতে পাইবেন।

প্রথমোক্তের স্তনযুগ দুগ্ধভারে যদি অবনত হইয়া পড়ে, শেষোক্তের পয়ঃবাহী গ্রন্থি শুষ্ক হইয়া যাওয়ার ফলে কুচদ্বয় ক্রমশ বিশীর্ণ হইয়া যায়, মুখে ব্রণ বা ছুলি হয়, চর্ম লাবণ্যহীন হয়। একদলের যদি গর্ভিণী-আক্ষেপ (Puerperal eclampsia) বা সূতিকা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, অন্য দলের তেমনি যক্ষ্মা, মেল্যান্কলিয়া, বাধক, প্রদর, রজঃরোধ প্রভৃতি নানা

ব্যাধির কবলে পতিত হওয়ার নিশ্চয়তা থাকে খুব বেশী রকমের। আমরা যুক্তি-প্রমাণের অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়াই বলিতেছি যে, আমাদের দেশের গড়্‌পড়তা মেয়েদের কুড়ির মধ্যে বিবাহ হওয়াই শুধু উচিত নহে—অন্তত একটি গর্ভধারণ করাও উচিত। সন্তানের জননী না হইলে কোন নারীরই যৌনজীবন সম্পূর্ণতা লাভ করে না, পুরুষ-সংসর্গে পূর্ণ রসবোধ বা আদর্শ তৃপ্তি জন্মে না।

উপর্য্যুপরি বহুসন্তান-জনন স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই স্বাস্থ্যহীনতার কারণ;—একজনের প্রত্যক্ষভাবে, অন্যজনের অসাক্ষাৎরূপে। কিন্তু

বহুমাতৃত্বে যৌনানুভূতি

অনেকের ধারণা যে, বহুমাতৃত্ব রমণীর যৌনানুভূতি ভোঁতা করিয়া ও যৌনক্ষুধায় অরুচি ধরাইয়া দেয়। কিন্তু সাধারণভাবে এ কথা অভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলে না। অধিকাংশ রমণীই যৌবনের প্রথমে বা কৈশোরের শেষভাগে যেরূপ আবেগসম্পন্ন ছিলেন, যৌবনের শেষ পর্যন্ত সেইরূপই থাকেন। তবে অহোরাত্র সন্তান-সন্ততির তত্ব ও যত্ন লইতে, তাহাদের আহার্য, পরিচ্ছদ, শয়ন, পঠন প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে, তাহাদের আব্দার ও অভিযোগ শুনিতে শুনিতে অথবা তাহাদের পীড়া ও আকস্মিক বিপদাপদে সেবা-শুশ্রূষা করিতে করিতে দরিদ্র গৃহস্থের অনেক রমণীরই যৌনক্ষুধার প্রশমন করিবার ঐকান্তিকতা অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে; নিশ্চিন্তে একটু নিদ্রা ও বিশ্রামই যেন তখন তাঁহাদের সর্বাপেক্ষা প্রেয় হইয়া উঠে।

ইঁহাদের সহবাসের ইচ্ছা হয়ত নিয়মিত, স্বভাবনির্দিষ্ট ক্ষণে ঠিকই জাগে;

মিলনের প্রতিবন্ধক

কিন্তু সারাদিনের কঠোর সাংসারিক পরিশ্রমের অবসন্নতা হয়ত ঠিক সেইসময় এমন করিয়া তাঁহাদিগকে পাইয়া বসে যে, তখন আর

নিজে উদ্যোগী হইয়া স্বামীর কামোদ্দীপনার্থ বিবিধ লীলাচাটুল্যের আশ্রয় লইতে প্রেরণা দেয় না ; কিছুক্ষণ শয্যায় উশীখুশী করিয়া শেষে হয়ত তাঁহারা অঘোরে ঘুমাইয়া পড়েন। তবে যদি স্বামী নিজে অগ্রগামী হইয়া তাঁহাদের শয্যাশ্রয়ী হন্, তাহাহইলে আপত্তির সুর তুলিবার মূর্খতা কোন পরিণতবয়স্কা ছেলের মা'রই যে হয় না—তাহা একপ্রকার নিশ্চিত। তদুপরি, গৃহস্থ-ঘরে দুই-তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর হইতেই সাধারণত স্বামী-স্ত্রী একই ঘরে পৃথক শয্যায় শয়ন করিতে থাকেন ; সঙ্গতিতে কুলাইলে, কেহ কেহ পৃথক কক্ষেও রাত্রি যাপন করেন। এরূপ ক্ষেত্রে সন্তান-সন্ততিগুলি মাতার শয্যায়ই শয়ন করে, পিতা বিজন শয্যায় একাধিপত্য করেন। সুতরাং স্বামীই সচরাচর স্ত্রীকে আপন প্রয়োজন মতো নিজের শয্যায় টানিয়া আনেন। আবার কখনো কখনো যুবতী-স্ত্রীও স্বামীর বিনা আমন্ত্রণেই তাঁহার শয্যায় গিয়া নিজের আসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থ করিতে কুণ্ঠিতা হন্ না।

পুত্র-কন্যারা একটু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, কে কখন্ জাগিয়া উঠে, কে কখন্ দেখিয়া ফেলে—এই আশঙ্কা গৃহস্থঘরে স্ত্রী-পুরুষের ইচ্ছামতো নিশীথ-মিলনের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে। নচেৎ ক্রমাগত পুত্রকন্যাদের অসুস্থতা, বাহির হইতে আত্মীয়-জ্ঞাতিবর্গের আগমন ও কিছুকালের জন্য তাঁহাদের ঘর দখল করিয়া অবস্থান, শিশুদের মধ্যে রাত্রে কাহারো স্তন্যপানের জন্য নিদারুণ ক্রন্দন...ইত্যাদি কারণ স্ত্রীপুরুষের আসঙ্গ-লিপ্সা চরিতার্থতার পথ কণ্টকিত করিয়া দেয়। এই সকল বাধা-বিঘ্নের অবিচ্ছিন্ন আবির্ভাব কোন কোন স্থৈর্যশালিনী, [illegible]তি-আবেগময়ী, বুদ্ধিমতী রমণীকে ধীরে ধীরে নিজের কামলিপ্সা প্রদমিত করিবার ইঙ্গিত দেয় ; কিন্তু এই প্রদমন-প্রচেষ্টার অন্তরালে প্রথম প্রথম সকলেরই বেশ একটু ক্ষোভ, বিরক্তি, অতৃপ্তি, হতাশা ও অস্বস্তিবোধ থাকে।

অবশ্য সংসারের গুরুদায়িত্ব, ভার স্কন্ধে আসিয়া গুরুতর বোঝার আকার ধারণ না করিলে, পুনঃপুন সন্তান-প্রসবের জন্যই হোক বা অন্য কারণে হোক নিজের দেহ রোগক্লিষ্ট না হইলে, কিংবা সংসারে অবিরত শোক-দারিদ্রের অস্বাস্থ্যকর বাতাসে অতিষ্ঠ না হইয়া উঠিলে, কোন রমণীরই ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্বে যৌন-লালসা-স্রোতে ভাঁটা পড়ে না, কিংবা রতিক্রীড়ায় যথার্থ বিতৃষ্ণা আসে না।...হ্যাঁ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিতৃষ্ণা আসে বটে; কিন্তু তাহারা যৌবনের প্রথম হইতেই অথবা বিবাহের কিছুদিন পর হইতেই স্বামী-সম্মিলনে এইরূপ উদাসীন। এই যৌন-উদাসীনতা স্থান-কাল-পাত্র পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দূরীভূত হয়। জগতে খুব অল্পসংখ্যক নারীকেই স্বভাবত কামশীতল হইতে দেখা যায়।

বন্ধ্যা ও একসন্তান-বতীর কাম

যৌবনে একটি সন্তানের জননী সাধারণত বন্ধ্যা রমণী অপেক্ষা অধিকতর যৌনরসজ্ঞা ও রতিক্রীড়ায় অধিকতর পটীয়সী হন্—ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। এমন কি, অসংশোধনীয়ভাবে স্বাস্থ্যভঙ্গ না হইলে, তিন চারিটি সন্তানের জন্ম পর্যন্ত বহু রমণীরই যৌনলিপ্সা ধাপে ধাপে বর্ধিত হইতে থাকে। তারপর বাহ্যিক কারণে ও ভিতরের প্রেরণায় এমন একটা স্থৈর্য ও আত্মসংযমের ভাব আসে—যদ্দারা তাহারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত যৌনসংযোগের অভাব সহ্য করিতে সমর্থ হয়।...রতিলীলার প্রচণ্ডতা ও পৌনঃপুনিকতা সন্তানের মাতা যেরূপ অক্লেশে সহ্য করিতে পারেন, বর্ষিয়সী বন্ধ্যা সেরূপ পারেন না। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রথমোক্তকে যৌনানন্দ দেওয়া ও তাঁহার নিকট হইতে যৌনানন্দ পাওয়া, গড়্‌পড়্‌তা পুরুষের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে, একথা অনেকটা সত্য হইলেও এ ধারণা মিথ্যা যে, প্রত্যেক প্রসবের পরই একটু একটু করিয়া রমণীর যোনিনালি প্রশস্ত হইয়া

যায়। একটি সন্তান-জননের পর উহা যেরূপ থাকে, তিন-চারিটি সন্তান-জননের পরিণামে তদপেক্ষা যৎসামান্য অধিক বিস্ফারিত হইতে পারে; তারপর সারাজীবন প্রায় সমানই থাকে। সাধারণ স্বাস্থ্য ও গঠন-সৌষ্ঠব এই ব্যাপারটিকে বহুক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত করে।

গর্ভ-ধারণ-কালে রমণীর পুরুষ-সংসর্গ প্রয়োজন হয় না, এরূপ মনে করাও অসঙ্গত। বরং অধিকাংশ রমণীই গর্ভাবস্থার প্রথম অর্দ্ধাংশে

গর্ভাবস্থায় লিপ্সার হ্রাসবৃদ্ধি

অধিকতর কামপীড়িতা হন্; যিনি কোনকালে মুখ ফুটিয়া স্বামীর সোহাগ যাচ্ঞা করেন নাই, তিনিও এ সময়ে দুই-একবার উপযাচিকা হইয়া তাঁহার অনুগ্রহ-ভিক্ষা করিতে লজ্জাবোধ করেন না। এমন কি, বহু সাধ্বী স্ত্রীও নাড়ীজনিত বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন যৌন-ব্যাপারে অদৃষ্টপূর্ব মানসিক দুর্ব্বলতা, অবাধ্যতা ও অবিমৃষ্যকারিতা প্রকাশ করিতেও পারেন। কোন কোন সুন্দরী কেবল গর্ভকালেই পর-পুরুষের কুপ্রস্তাবের নিকট নমনীয় হইয়া পড়িয়া থাকেন।···কিন্তু শেষ চারি পাঁচ মাস—বিশেষভাবে অষ্টম, নবম ও দশমের কয়েকদিন নারীর লিপ্সা বেশ একটু একটু করিয়া নিম্নতম ধাপে আবরোহণ করে। তবে প্রথম প্রসূতির গর্ভকালীন্ কাম প্রায় ক্ষেত্রেই গর্ভের সূচনা হইতে ক্ষীণ হইতে দেখা যায়। অত্যধিক বমন, আহারে অরুচি, অতিরিক্ত নিদ্রালুতা, আলস্য-জড়িমা, রুক্ষ স্বভাব, অসামাজিক ভাব···প্রভৃতি লক্ষণ-দ্বারা তাহাদের অবচেতন মন সহবাস-বিতৃষ্ণা প্রকারান্তরে প্রকাশ করিয়া দেয়। মৃতবৎসা রমণীগণও গর্ভাবস্থার প্রথম ও শেষভাগে সুকঠিন কামবিরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

সন্তান-প্রসবের পর বয়স ও পাত্রী-ভেদে তিন হইতে নয় মাস কাল পর্যন্ত রমণীর সঙ্গমেচ্ছা খুব অল্প থাকে। শিশু-পালনে তাঁহারা যে

আনন্দ পান, তাহার মধ্যে থাকে একটা নূতনত্ব—একটা বিশেষত্ব—একটা সঙ্কোচহীন তৃপ্তির মাধুর্য ও প্রেমের একটা অভিরাম বিকীরণ। স্বামীর হস্ত-নিপীড়নে যে স্তনযুগ এতকাল পুলকাবেশে সমস্ত শরীরকে আবেগকম্পিত করিয়া দিত, তাহাই সন্তানের তপ্ত ওষ্ঠ-সঞ্চাপন ও কোমল করপল্লব-স্পর্শে যেন একটা অপরূপ সান্ত্বনা পায়। নবপ্রসূতের যত্ন লইতে গিয়া অনেক পত্নী স্বামীর প্রতি অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে রাত্রিকালে শিশুর ক্রন্দন স্বামীর শুধু নিদ্রাভঙ্গ করে না, তাঁহার নিরুপদ্রব পত্নীসম্মিলনেও বাধা জন্মায়; তখন পিতার তরফ হইতে সন্তানের প্রতি সাময়িকভাবে একটা নিষ্ফল আক্রোশ আসা বিচিত্র নহে। সাধারণত প্রসবের তিন চারিমাস পর হইতেই যুবতীদিগের পূর্ববৎ যৌনক্ষুধা প্রত্যাবর্তন করে,—অনেকেরই আসে দ্বিগুণ শক্তি লইয়া। কিন্তু সারা স্তন্যদানকাল তাঁহারা, ইচ্ছা করিলে, পুরুষের সোহাগ-আদরকে উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারেন; কারণ আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিকগণ একবাক্যে মতপ্রকাশ করিতেছেন যে, "The lactating mother has some kind of sexual equivalent in the sucking of the baby."

প্রসবান্তে আসঙ্গলিপ্সা

ত্রিশের পর (কাহারো—ত্রিশ হইতে ছত্রিশের মধ্যে) যৌবন নিঃশেষ হইয়া যখন প্রৌঢ়ত্বকে তাহার রাজাসন ছাড়িয়া দিয়া যায়, তখন আমাদের দেশের সাধারণ রমণীগণ পাকা গৃহিনী-পদবাচ্যা হন্। এই সময়ে হয়ত ছেলেপুলের ঘর ভরিয়া যায়; অনেকেরই দু'টি-একটি জামাতারো আবির্ভাব হইতে পারে। আত্মীয়-স্বজন, লোক-লৌকিকতা, সংসারধর্ম, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতির মধ্যে তাঁহাদের মন এমন করিয়া বসিয়া যায় এবং ব্যাপৃত হইয়া পড়ে যে, যৌনবিষয়ক চিন্তার অবসর থাকে

প্রৌঢ়া গৃহিনী

খুব কম; অথচ বগতযৌবনত্বের সংবিৎ তাহাদিগকে সময়ে-অসময়ে পীড়া দিতেও ছাড়ে না। যৌবনের ঠাট্-ঠমক্, নিজেকে জাহীর করিবার একটা আধ-ইচ্ছা-আধ-অনিচ্ছাকৃত প্রয়াস, জগতের নিকট হইতে নিজের ষোল আনা পাওনা-গণ্ডা সুদে-আসলে আদায় করিয়া লইবার এক্টা প্রচ্ছন্ন লালসা, আপন বসন-ভূষণের প্রতি অত্যধিক মোহ···ইত্যাদি অকস্মাৎ দ্রুতগতিতে হ্রাস পাইতে থাকে। সে যেন তাহার অবচেতন মানসে একটু একটু করিয়া উপলব্ধি করে যে, স্বামী বা অন্য পুরুষকে আকর্ষণ করিয়া ক্ষমতা সে হারাইতে বসিয়াছে।

বাঙ্গালী ভদ্রঘরের প্রৌঢ়া রমণীর যৌন-জীবনে পুরুষের চেয়েও বৈচিত্র কম। তাহা আফিসের বাবুর দৈনন্দিন কর্মতালিকার মতোই নিতান্ত এক-ঘেয়ে, একটানা, কবিত্বহীন। যেদিন চান্দ্রমাসিক ঋতুস্রাব চিরতরে বন্ধ

ঋতুসংহার

হইয়া যায়, সেইদিন হইতে প্রকৃতপক্ষে রমণীর যৌন-জীবনের উপসংহার আরম্ভ। সাধারণত বিয়াল্লিশ বৎসর হইতে আটচল্লিশ বৎসর বয়সের মধ্যে ভারতবর্ষীয় নারীর "ঋতুসংহার" (Menopause) হয়; অর্থাৎ তাহার পর হইতে ঋতুশোণিতের উপদ্রব আর তাঁহাদিগকে সহ্য করিতে হয় না। ঋতুসংহারের বৎসরখানেক বা কয়েক মাস পূর্ব হইতেই প্রত্যেক স্ত্রীলোক তাঁহার দেহমনে একটা অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষ্য করেন,—কৈশোরের ঠিক বিপরীত একটা মনোবৃত্তির ঘূর্ণাবর্তে তাঁহারা পতিত হন্। এইকালে ঋতুস্রাব অনিয়মিতভাবে দেখা দেয়, কাহারো প্রচুর—কাহারো অত্যন্ত অল্প; তৎসহিত আসে একটা দারুণ অস্বস্তিকর আবেশ, আহারে বীতরাগ, আত্মীয়-স্বজনের উপর অকারণ বিরক্তি-ভাব, শান্তির আকাশে একটা অস্বাচ্ছন্দের গুমট্, অহেতুক মান-অভিমান, অকারণ আশঙ্কা, দুঃখবাদের প্রতি অনাবশ্যক আসক্তি।···

ঋতুসংহারের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বা পরবর্তীকালে (অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে চুয়াল্লিশ হইতে ছেচল্লিশ বৎসর বয়সের মধ্যে) রমণীর যে অপরূপ অবস্থান্তরের যুগ আসে, সে সময়ে তাঁহাদের মন-মেজাজের রূপান্তর যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই বিস্ময় মানিয়াছেন। প্রতিদিন একটা-না-একটা সত্যকার বা কল্পিত অসুখ লাগিয়াই আছে—মাথাধরা, অনিদ্রা, কটিবেদনা, অঙ্গের এক-একস্থলে ক্ষুদ্র মাংশপেশীর স্পন্দন, চক্ষের দৃষ্টিহ্রাস, হিস্‌টিরিয়ার মতো অবস্থা, পেটের গোলমাল, অম্ল, অজীর্ণ ইত্যাদি। যিনি এতকাল শান্তিপ্রিয়া ও মধুরভাষিণী ছিলেন, তিনি কেমন করিয়া হঠাৎ এক অশুভ প্রভাত হইতে কলহপ্রিয়া, অপ্রিয়বাদিনী, অস্থিরচিত্তা হইয়া পড়েন—তাহা তিনি নিজেই বুঝিতে পারেন না। কেহ অতিরিক্ত সংশয়শীলা, চিন্তাপ্রবণ ও খামখেয়ালী হইয়া পড়েন, কেহ বা সময়ে-অসময়ে যাহার-তাহার সহিত অনাবশ্যকভাবে কথোপকথন করিতে ভালবাসেন; পরনিন্দা, পরচর্চা ও হৃদয়হীন সমালোচনায় তাঁহারা যেন পান্ সুগভীর আনন্দ।

ঋতুসংহার্‌কালীন্ ভাবান্তর

কেহ কেহ আবার স্বামীকে বা আপন কোলের শিশুটিকে দ্বিগুণ আগ্রহের সহিত যত্ন করিতে আরম্ভ করেন। অনেকের যৌনক্ষুধাও এই সময় কিছুদিন প্রবল আকারে দেখা দেয়। বার্ধক্যনির্জিত পতি যদি তাঁহার পুনঃপ্রজ্জ্বলিত কাম-হুতাশনের যথাবিধি প্রসাদন না করিতে পারেন, অথবা কার্যে, বাক্যে বা ইঙ্গিতে তাঁহার তরফ্ হইতে কোনরূপ উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য বা নির্বেদের ভাব প্রকাশ পায়, তাহাহইলে আর রক্ষা নাই;—ত্রিশ বৎসরের সযত্নে বোনা প্রেমের রেশমী জাল একটি করাঘাতেই ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে। কেহ পাগল, কেহ মূর্চ্ছারোগে আক্রান্ত হন্; কেহ হঠাৎ গুরুকরণ ও ধর্মানুষ্ঠানে অত্যন্ত

শ্রদ্ধাশালিনী হইয়া পড়েন (কিন্তু প্রকৃত বৈরাগ্যে নহে—রাগে ও অভিমানে); কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়াও এই অন্তর্দাহ উপশম করিতে উদ্যোগী হইতে পারেন। আবার কোন কোন রমণী অকস্মাৎ অত্যন্ত কর্মকুণ্ঠ ও বিলাসপ্রিয় হইয়া পড়েন; কোন কোন প্রৌঢ়া হয়ত বিস্মৃতপ্রায় ঠাটঠমক্ ও পরের স্তুতিবাদ আহরণের সংগুপ্ত এষণাকে বহুদিন পরে জাগাইয়া তুলেন,—স্নেহের বঞ্চনাকর বর্ণে ঢাকিয়া কোন পরিণত কিশোর বা যুবককে প্রচণ্ডভাবে ভালবাসিয়া ফেলিতেও পারেন; কাহারো কাহারো "বিরাজ-বৌ" সাজিতেও আপত্তি থাকে না। বহু যৌবন-বিধবা এই বয়ঃসন্ধ্যায় উপনীত হইয়া হঠাৎ পাপাচরণে বা আইনভঙ্গে প্রবৃত্ত হইতে পারে। অনেকে আবার বিপদসঙ্কুল সমাজরাষ্ট্রিক্ কোন দুঃসাহসিক কর্ম-স্রোতে ফলাফল চিন্তা না করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে*। অনেক ঠাকুর্মাই এই সময়টিতে নিজের বা দূরসম্পর্কীয় নাতিদিগের সহিত যে সকল অশোভন ঠাট্টা-ইয়ার্কি করেন, তাহার মধ্যে অবচেতন মনের নিছক্ সত্য এষণাও লুকাইয়া থাকিতে পারে।...ঘড়ীর কাঁটা পশ্চাতে ঘুরাইয়া দিতে সকলেরই অন্তরে একটা অদ্ভুত আগ্রহ প্রধূমিত হইতে থাকে!

এই বয়সের সময় কোন কোন রমণী হঠাৎ অত্যন্ত মেদোবহুলা, স্থূলোদরা হইয়া পড়েন; কেহ কেহ আবার অত্যন্ত ক্ষীণা, রুগ্ণা ও অস্থিচর্মসারা বৃদ্ধায় পরিণত হইয়া যান্।

বার্ধক্যে যৌনবোধ

আটচল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইলে, উপরিকথিত মনোভাব অপসৃত হয়—একটা স্বাভাবিক প্রশান্তির পরিস্থিতি দেখা দেয়। ইহার পর শতকরা নিরনব্বইটি বাঙ্গালী সধবার আর পুত্র-সম্ভাবনা থাকে না।...তাহার পর হইতে রমণীর বার্ধক্য। চিরাচরিত

* কংগ্রেসের বিগত "নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ"-আন্দোলনে এই বয়সের মহিলারা দলে দলে যোগ দিয়াছিলেন।

অভ্যাসবশে তাঁহারা পুরুষ-সহবাসে প্রবৃত্ত হইতে থাকিলেও কামনার পারদ-রেখা আট্‌চল্লিশের পর হইতে দ্রুত হ্রস্ব হইতে থাকে। নির্বন্ধাতিশয় অতিথিরূপে যে লিপ্সা প্রথম যৌবনে সপ্তাহে একবার ও প্রৌঢ়কালে চতুর্দশ দিন অন্তর একবার করিয়া দেখা দিত, তাহা হয়ত মাসে একবার করিয়া ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতরভাবে জাগিতে থাকে। ষাট্ বৎসরে গড়্পড়্তা প্রত্যেক সৌভাগ্যবতী সধবারই যৌনজীবনের চিরাবসান হয়।···

পঁয়তাল্লিশ বৎসরব্যাপী সুখদুঃখের লীলামাধুরী-বিমণ্ডিত স্মৃতিসৌধে নির্বিবাদে বসিয়া তিনি একদিকে পরকালের চিন্তা—অন্যদিকে অথর্ব স্বামীর যথাশক্তি সেবা ও সান্নিধ্য-লাভের মধ্যে খুঁজিয়া পান দিব্য তৃপ্তি;—লোলচর্মে কামকেলির ব্যর্থ বিদ্রূপ তাঁহার নিকট দুঃসহ—দারুণ বিরক্তিকর বলিয়াই প্রতীত হয়!

সপ্তম প্রপাঠ

স্ত্রী-পুরুষের যৌনাচরণে পার্থক্য

পূর্বেও বলিয়াছি, পুরুষের যত শীঘ্র কামোত্তেজনা জাগে, রমণীর সেরূপ জাগে না। রমণীর যৌন-জীবনের এই নীতিটি না জানার দরুণ, অনেক সময় পুরুষ আপনার অজ্ঞাতসারে রমণীর নিকট ঘোর স্বার্থপর সাজিয়া বসেন। প্রায় গৃহস্থ-সংসারেই নারীর অগ্রেই পুরুষ নিশীথ-শয্যা গ্রহণ করেন। আপন প্রয়োজন-মাফিক্ দিনে মদনপীড়িত হইয়া, নারীর সঙ্গ-সুখাশায় তীব্র উৎকণ্ঠায় পুরুষ তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষা করেন। তারপর সারাদিনের গৃহকর্ম সদ্য সমাপনান্তে নারী শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া, শয্যার উপর শুইয়া একটা আরামের দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে-না-ফেলিতেই পূর্ব-হইতে-প্রস্তুত পুরুষ অন্ধআগ্রহে বিনা গৌরচন্দ্রিকায় তাঁহার অভিলাষ পূরণে ব্রতী হন্।

উভয়ের রমণের তাল-গতি-মাত্রা

অথবা এমনও হইতে পারে যে, স্ত্রী স্বামীর অগ্রে শয়ন করিয়া সবেমাত্র তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছেন, এমন সময় স্বামী বাহির হইতে বেড়াইয়া আসিয়া, বেশ তপ্তকাম হইয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। হয়ত তিনি থিয়েটার-বায়োস্কোপ হইতে লালসোদ্দীপক চিত্র দেখিয়া অথবা বন্ধুমহল হইতে ব্যক্তি বিশেষের রতিশক্তির চমৎপ্রদ কাহিনী সবেমাত্র শুনিয়া আসিতেছেন; সুতরাং ধৈর্যধারণ অসম্ভব। নারী ইহার জন্য মোটেই প্রস্তুত থাকেন না, কাযেই এ ব্যাপার তাঁহার নিকট 'তুলসী বনে

বাঘের ডাকে'র মতোই বিসদৃশ ও অতর্কিত বলিয়া অনুভূত হয়। তদুপরি, নারী—পূর্ববর্ণিত যে উপচার বা কন্যা-বিস্রম্ভনের এত পক্ষপাতী, তাহা প্রদর্শন করিতে পুরুষ প্রায় ভুলিয়া যান; ভুলিয়া যান যে, আস্থানন্দ যত নিবিড় হয়, অন্তানন্দ সেই পরিমাণে তত গভীর—তত তৃপ্তিদায়ক হয়।...

তারপর হয়ত যখন রমণীর মনের উদয়-গিরির পশ্চাৎ হইতে কামনার তরুণ-সূর্য সবেমাত্র উঁকি দিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন তৃপ্ত পুরুষের শ্রান্ত কামনা-রবি অস্তগিরির পশ্চাতে ঢলিয়া পড়িল!......

রেখাচিত্র নং ৩
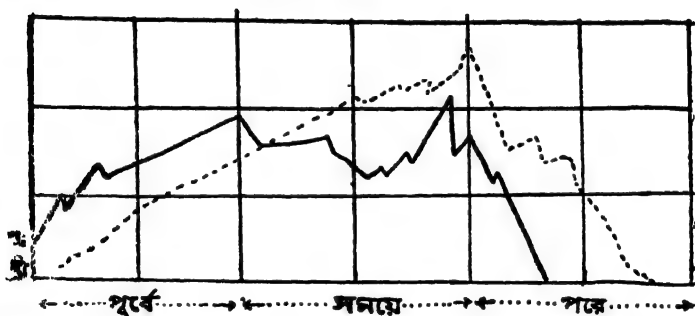
সহবাসকালে স্ত্রী-পুরুষের কামোৎসাহের তুলনামূলক অধ্যয়ন।

পুরুষের রমণেচ্ছা ধাঁক্ করিয়া জাগে। যৌন-সম্মিলন আরম্ভ হইলে, তাহার প্রথম অবস্থায় পুরুষের যতটা কামোৎসাহ থাকে, উহার মধ্যাবস্থায় অনেকের তাহা হ্রাস পায়; কিন্তু একেবারে শেষের দিকে বীর্য-পতনের অব্যবহিত পূর্বে তাহা ক্ষণিকের জন্য বেশ একটু জ্বলিয়া উঠে, এবং বীর্য-পতনের সঙ্গে সঙ্গে ও অব্যবহিত পরে নিমেষের জন্য চরমানন্দ লাভ হয়। পক্ষান্তরে নারীর কামোৎসাহ ধীরাবরোহী—একটির পর একটি করিয়া দীর্ঘ

সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া, যেন তাহা কাম-চন্দ্রনাথের চরম শীর্ষে উঠে।

রতিকালে কায়িক বা মানসিক পরিশ্রম পুরুষের যতটা হয়, উৎসাহিনী নারীর তদপেক্ষা সামান্য কিছু কম হইতে পারে; তথাপি সাঙ্গমিক ব্যায়ামে পুরুষের যত শীঘ্র ও যতটা পরিমাণে শক্তি নষ্ট হয়, নারীর ততটা হয় না। কোন কোন যুবক অজ্ঞতাবশত আপন শরীরের উপরার্ধের গুরুত্ব নারীর বক্ষের উপর আংশিক বা পূর্ণভাবে সঞ্চাপিত করিয়া, তাহার সহজভাবে শ্বাসগ্রহণ-ক্রিয়ার পথ রুদ্ধ করিয়া দেন্; ইহাতে তাঁহারা যথেষ্ট কষ্ট ও শ্রম অনুভব করেন।

ইহা বহুপরীক্ষিত সত্য যে, নারীর কামোৎসাহ অতি ধীরে জাগ্রত হয় এবং তাহা একবার জাগ্রত হইলে, তাহার শক্তি হয় সাংঘাতিক। পুরুষের কাম—শুষ্ক কাষ্ঠের আগুন, জ্বালিতেও কষ্ট নাই, নিবাইতেও কষ্ট নাই। নারীর কাম—কয়লার আগুন, জ্বালিতেও বেগ পাইতে হয়, এবং একবার জ্বলিলে, তাহার আঁচ্ যেমন তীব্র—তাহার স্থায়িত্ব তেমনি দীর্ঘ হয়। বিবাহের একটা প্রধান উদ্দেশ্যই হইল—পরস্পরের গতি ও প্রগতিকে অখণ্ড যুগ্ম জীবনের প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, স্বামী-স্ত্রীর সমান্ তালে পা ফেলিয়া চলা। বিবাহিত পুরুষকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যৌন-জীবনের চিরকাম্য পথে রমণীর কামোত্তেজনার গতি কচ্ছপের মতো এবং পুরুষের গতি শশকের মতো! চেষ্টার দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা, সামান্য স্বার্থত্যাগের দ্বারা, একের গতিকে একটু চঞ্চল এবং অন্যের গতিকে একটু মন্থর করিয়া লইতে হয়। ..

কামকেলিতে উপযুক্ত বয়স্কা রমণীকে পরাস্ত করিতে যাওয়া পুরুষের পক্ষে ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নহে। কুঁড়ি-পঁচিশ বৎসরের বলিষ্ঠ যুবক সহজ অবস্থায় এক রাত্রে ক্বচিৎ তিন বা চারিবার রমণ করিয়া আশাতিরিক্ত তৃপ্ত

ও পরিশেষে অবসন্ন হইয়া পড়েন ; অথচ ষোল হইতে আট্‌চল্লিশ বৎসর বয়স্কা যে-কোনো সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থার নারী তাঁহার তৃপ্তির সীমাকে যদৃচ্ছ বাড়াইয়া চলিতে পারেন,—ছয়-সাতবার রমণেও ক্লান্তিবোধ করেন না। ফ্রান্সের য়্যারাগন্ নামক প্রদেশের রাণী বলিতেন, প্রতি রাত্রে তিনবার সহবাস ব্যতীত তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না, সুতরাং এই মাত্রাই প্রত্যেক স্বাভাবিক রমণীর আদর্শ হওয়া উচিত। জনৈক পত্র-প্রেরক আমাদিগকে জানাইয়াছেন, "একবার একটি বন্ধু ব্রহ্মদেশে এক ইংরাজ কুমারীর সহিত সম্ভোগ-সৌভাগ্য লাভ করেন। ২৷৩ বার সহবাসের পর যুবতী তাঁহাকে পুনঃপুনঃ উত্তেজিত করিয়া ৬ বার সহবাস করিতে বাধ্য করেন। স্ত্রীলোকের তৃপ্তির মাত্রা বা সম্ভোগ-পিপাসা কত অধিক, এ ঘটনাটি তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।"...

বাঙ্গালী বেশ্যাদের একরাত্রে বারো হইতে ছাব্বিশ বার কামুকীর আক্রমণ অল্পায়াসে সহিতে যেমন শুনিয়াছি, ভদ্রবংশীয়া নারী একরাত্রে চারিবার সঙ্গম ব্যতীত তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না—এমন প্রতিবেদনও আমাদের কর্ণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তবে ইহা সিদ্ধান্ত করিতে আমাদের কষ্ট পাইতে হয় নাই যে, মধ্যম রকমের কামশীলা বঙ্গযুবতী একরাত্রে দুইবার রমণে অধিকতর আনন্দ অর্জন করিতে পারেন ; ইহার বেশী হইলে তাঁহাদের শ্রান্তি বা বিরক্তিবোধ আসে। ইঁহারা প্রতিরাত্রে সঙ্গমাভিলাষিনী নহেন বটে ; কিন্তু কাম-জোয়ারের একটি বা একাধিক তিথিতে দুইবার উপসর্পণ লাভ করিলে, সত্যই আশানুরূপ আনন্দিতা হন্।

এমন পুরুষ আমাদের দেশে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি একাদিক্রমে পনের মিনিটকাল রমণ করিতে পারেন ; পূর্ণ যুবকদের দশ

ও প্রৌঢ়দিগের পাঁচ মিনিট পর্যন্ত সুরত-কাল স্থায়ী হইলেই যথেষ্ট বলিতে হইবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহু বাঙ্গালী প্রৌঢ়েরই দুই-তিন মিনিটের বেশী সুরতানন্দ স্থায়িত্ব লাভ করে না বলিয়া আমরা অবগত। কিন্তু সকল দেশের সুস্থদেহী, অধিক-শ্রমশীলা ও অল্পশিক্ষিতা রমণীগণ দশ হইতে কুড়ি মিনিটের কম সময়ে চরমানন্দ (orgasm) কদাচ লাভ করেন *। অবশ্য উপচারাদি-দ্বারা রমণীর কামনাকে জাগাইয়া ও কিছুক্ষণ খেলাইয়া লইলে, পাঁচ-ছয় মিনিট সহবাসেই তাঁহারা প্রায়শ চরমানন্দ লাভ করিতে পারেন।

চরমানন্দ ও বিস্যষ্টিরস

এই 'চরমানন্দ' শব্দটি ইতঃপূর্বে দুই তিনবার ব্যবহার করিয়াছি; কিন্তু ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে পাঠকগণ একটা ধারণা করিয়া লইলেও, এখনো খুলিয়া বলা হয় নাই। সঙ্গমের শেষ অবস্থায় একটা জড়িমাজনক উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে যে আবেশময় পুলক ও তৃপ্তির ভাব আসে, তাহাই চরমানন্দের অবস্থা। বীর্যনির্গমের সহিত পুরুষের সর্বক্ষেত্রেই চরমানন্দ লাভ হয়, কিন্তু রমণীর ঠিক বীর্যের অনুরূপ কোন রস না

* Though in some instances the woman may have one or more crises before the man achieves his, it is perhaps hardly an exaggeration to say that 70 or 80 per cent. of our married women (in the middle classes) are deprived of the full orgasm through the excessive speed of the husband's reaction. But even after a woman's dormant sex-feeling is aroused and all the complex reactions of her being have been set in motion, it may even take as much as from ten to twenty minutes of actual physical union to consummate her feeling, while two or three minutes often completes the union for a man."—Dr. Mary C. Stopes, D. Sc. in MARRIED LOVE ...জগতে সর্বত্র মধ্যবিৎ ভদ্র-পরিবারের পুরুষ-মহিলাগণের এই একই অবস্থা !

থাকিলেও প্রায়ই জরায়ু-মুখ হইতে একপ্রকার অতিঘন আঠালু রস বিন্দু-মালার ন্যায় নাতিবেগে নিপতিত হয়; পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদের ভাষায় ইহাকে বলা হয়—Kristller's slimy plug. মনে রাখিবেন, এই রসের সহিত গর্ভধারণের কোন সম্পর্ক নাই। বহু রমণী এই রস-নিষেকের অনুভূতি অনেক সময় ভাল করিয়া টের পান না, অথচ চরমানন্দ সংঘটিত হইল—তাহা সর্বদা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারেন। এই রসের নাম "বিসৃষ্টিরস"।

পুরুষও অনেক সময় অপর পক্ষের বিসৃষ্টিরস-নিষেক অনুভব করিতে পারেন না। বিসৃষ্টিরস কদাচিত গড়াইয়া বাহিরে আসে, সাধারণত জরায়ুগ্রীবার চতুষ্পার্শ্বে ও শিশ্নমুণ্ডেই লাগিয়া যায়। কিন্তু রমণীর চরমানন্দ-লাভ সর্বক্ষেত্রে, সর্বপাত্রে বা সর্বসময়ে বিসৃষ্টিরস-নিঃসরণের মুখাপেক্ষী নহে, উহা স্বতঃই আগমন করিতে পারে। চরমানন্দের সময় রমণীর দেহ-মনের অবস্থা প্রায় পুরুষের অনুরূপ হয়—তবে অপেক্ষাকৃত প্রগাঢ়ভাবে। ঐ সময় যোনিনালির পেশীময় প্রাচীর ঈষৎ আক্ষেপগ্রস্ত হয়, অর্থাৎ একবার সঙ্কুচিত একবার বিস্তারিত হয়, জরায়ু-মুখের স্বভাবত গুটানো ওষ্ঠ প্রলম্বিত হইয়া ভিতর দিকে মুড়িয়া যায়—কোনো কোনো সময়ে শিশ্ন-মুণ্ডের উপরাংশ আঁকড়াইয়া ধরে—জরায়ু-মুখের সূক্ষ্ম নালিপথ অল্পবিস্তর ফাঁক্ হইয়া যায়; পরিপূর্ণ সুখ-সংবেদনের আবেশে ক্ষণিকের জন্য উন্মাদনা ও গতচেতনার মাঝামাঝি একটা অনির্বচনীয় অবস্থা আসে।

অনুকূল পরিবেশের মধ্যে কোন একটি সহবাস প্রলম্বিত হইলে, বহু রমণীই দুই বা তিনবার চরমানন্দ লাভও করিতে পারেন।

কামোত্তেজনার সূত্রপাত হইতে অথবা সহবাসের প্রথম হইতে রমণীর বার্থোলিন-গ্রন্থিদ্বয় হইতেও অতিসামান্য মাত্রায় পাংলা রস নিঃসৃত হইতে থাকে। উহার নাম দিলাম "স্যন্দনরস"। উভয়েই ইহা অনুভব করিতে পারেন; কারণ সহবাস-কালে এই রসই ধীরে ধীরে যোনিপথ পিচ্ছিল

করিয়া দেয়। সহবাস যতই অগ্রসর হয়, স্যন্দনরস ততই অধিকমাত্রায় পড়িতে থাকে।

পুরুষের বীর্যপতনের সময় রমণীর যে সুখানুভূতি হয়, তাহা চরমানন্দ অপেক্ষা হীনতর। যাহাতে সহবাস-কালে রমণী পুরুষের পূর্বেই চরমানন্দ লাভ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে প্রাচীন মহাজনগণ পুনঃপুন উপদেশ দিয়া গিয়াছেন * ; এবং তজ্জন্য অঙ্গুলি-প্রয়োগ, ঘন ঘন চুম্বনাদি পচার কিছুক্ষণ প্রদানের পর তবে মূল রতিক্রিয়া আরম্ভ করিতে বলিয়াছেন। উভয়ের সমকালীন্ চরমানন্দ-লাভই, আমাদের মনে হয়—দাম্পত্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।

শ্রীমতী আরাধনা দেবী এতাবৎ বঙ্গদেশের সতের হইতে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্কা শিক্ষিত ভদ্রঘরের দুইশত একত্রিশ জন রমণীর রমণ-তৃপ্তির-কাল-নির্দেশক সন্নিকৃষ্ট হিসাব সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহাতে দেখা গিয়াছে, ইঁহাদের গড়্‌পড়্‌তা চরমানন্দ-লাভের কাল ১০·৬৪ মিনিট ; অথচ ইঁহাদের স্বামিগণের রমণ-কালের স্থায়িত্ব গড়ে মাত্র সাড়ে ৫·৮ মিনিট। ওই সাড়ে-চারিশতাধিক দম্পতির মাত্র ৬৬ জন স্ত্রী-পুরুষের চরমানন্দ প্রায়শ সমসময়ে সংঘটিত হয় ; এবং মাত্র ১৮ জন স্বামীর সহবাসকাল সাধারণত রমণীর চরমানন্দ-কাল অতিক্রম করিয়া যায়। অবশিষ্ট স্ত্রীগণকে কাম-জীবনে অতৃপ্ত ও অপেক্ষাকৃত অসুখী বলিতে হইবে।

বহুদিন অনুপস্থিতি বা সংযমের পর স্বামী সহবাস করিলে, তাহার স্থায়িত্ব দুই-এক মিনিটের বেশী হয় না ; পর-রাত্রে বা সেই রাত্রেই পরবর্তী সহবাস অবশ্য কিছু বিলম্বিত হয়। বলা বাহুল্য, এইক্ষেত্রে স্ত্রীগণ একবার সহবাসে আদৌ প্রশমিত হইতে পারেন না। অন্যান্য দিনেও পর্যুৎসুকা,

* "তস্মাত্তথোপচর্য্যা স্ত্রী যথাগ্রে প্রাপ্নুয়াদ্রতিম্"—কামসূত্রম্, সাং, ১ম অধ্যায়, ২৭ সূত্র।

পূর্ণযুবতীগণ প্রায়শ স্বামীর প্রথম সহবাসের শেষভাগে মাত্র উদ্দীপিতা হইয়া উঠেন এবং পর-পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় রমণ না করিলে সুখী হইতে পারেন না। বিবাহের কিছুদিন পরে পত্নীগণ যখন সুরতের রসাস্বাদে অভিজ্ঞা হইয়া উঠিয়াছেন, তখন কিছুদিন বিচ্ছেদের পর তরুণ স্বামীগণ ইহার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। পরন্তু যাঁহারা প্রথম সহবাসটিকে অন্তত দশ হইতে পনের মিনিট কাল প্রলম্বিত করিতে পারেন, তাঁহাদের স্ত্রীগণ সে রাত্রে দ্বিতীয় সহবাস-কামনা না-ও করিতে পারেন।

পূর্বে একাধিকবার বলিয়াছি,—পুনরায় উল্লেখ করি যে, যৌন-সম্মিলনের আনন্দ পুরুষ অপেক্ষা নারীর অধিকতর স্থায়ী ও নিবিড়তর হয়। পুরুষের কামাবেশ মনের মধ্যে প্রথম উদ্ভূত হইয়া, তাহার চরিতার্থতার জন্য নির্ভরশীল হয় একমাত্র জননেন্দ্রিয়ের উপর, এবং দেহের নাড়ী-তন্তু (nerve) সাহায্যে জননেন্দ্রিয়ের নিকট হইতে ঐ চরিতার্থতার সংবাদ পাইলে, তবে তাহার মন প্রসন্ন হয়।

নর-নারীর যৌন-বোধের পার্থক্য

কিন্তু নারীর কামাবেশ তাহার চরিতার্থতার ভারার্পণ করে শুধু তাহার জননেন্দ্রিয়েব উপর নহে—আরো অনেকগুলি প্রত্যঙ্গের উপর; এবং এতৎসংশ্লিষ্ট প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিকট হইতে নাড়ী-তন্তু-সাহায্যে চরিতার্থতার সংবাদ গেলে, তবে মনের পূর্ণ সন্তুষ্টি-বিধান হয়। সেইজন্য কালিদাসের "স্ত্রীণামনঙ্গো বহুধা স্থিতোঽস্য"—পংক্তিটির তাৎপর্য বুঝিয়া, প্রতি কামক্রীড়া কালেই তাহার প্রত্যেক অঙ্গটিতে কিছু-না-কিছু সোহাগ-আদর অর্পণ করা অবশ্যকর্তব্য।··

তারপর, কাম-চরিতার্থতার আনন্দ যদি পুরুষের মনের উপরিভাগে শুধু আঁচড় কাটে, তাহা হইলে তাহা নারীর মনের কেন্দ্রস্থলে গিয়া দাগ

অল্পে তুষ্টা নারী

বসাইয়া দেয়। সেইজন্য যৌন-সম্মিলন-সময়ে তৃপ্তি পাইতে নারীর এত দেরী হয় এবং ওই সুখের স্মৃতি তাঁহার মনে এত স্থায়িত্ব লাভ করে। ক্ষমতায় কুলাইলে, পুরুষ যেখানে প্রত্যহ অভিগমন করিয়াও তৃপ্তি পাইতে পারেন না, সেখানে নারী মাসে একবার বা বড় জোর দুইবার মাত্র যৌন-রসাস্বাদন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন; কারণ উষ্ট্রের ন্যায় তিনি কয়েকদিনের তৃষ্ণার উপাদান একদিনে সঞ্চয় করিয়া লইতে পারেন। তবে তাঁহার কাম-জোয়ারের কয়টি দিনই প্রত্যহ পুরুষ-সঙ্গ পাইলে, তিনি অসুখী হন্ না, বরং তাহা আশাতিরিক্ত ভাবিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করেন।

যে-সকল স্ত্রীলোক স্বভাব-রুগ্ণা, অবসন্না, যাঁহাদের মানসিক সচেষ্টতা সীমাবদ্ধ, মেজাজ রুক্ষ ও খুঁৎখুতে, তাঁহারা কাম-পীড়িতা হইলে এবং কাম-প্রসাদন সহজসাধ্য জানিলে, অত্যন্ত প্রাণপূর্ণা, কর্মঠ ও মধুর-স্বভাবা হইয়া উঠেন। এই ভাবটি অবশ্য কিছুক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে; তারপর ঐ নির্দ্দিষ্ট 'কিছুক্ষণের' মধ্যে কামনা পরিতৃপ্ত না হইলে, পূর্ববর্তী স্বভাব বলবত্তর হইয়া উঠে। কামনা পরিতৃপ্ত হইবার কিছুদিন পর পর্যন্তও দেহ-মনের এই স্ফূর্তিযুক্ত আবেশটি পরিলক্ষিত হয়। উপরি-উক্ত "কিছুক্ষণ" কথাটি নারী-বিশেষে দুই-তিন ঘণ্টা হইতে দুই তিন দিন বলিয়া বুঝায়; এবং "কিছুদিনের" অর্থ পাত্রী-বিশেষ দুই-তিন দিন হইতে দশ পনের দিন পর্যন্ত স্থায়িত্ব জ্ঞাপন করে।

স্ত্রী-জাতির যৌন-প্রকৃতির মধ্যে আর একটা লক্ষ্য করিবার মতো বিশেষত্ব এই যে, যে মদন-সন্তাপের বশে পুরুষগণ প্রায়ই আবেগ-অধীর, উন্মত্তপ্রায়, আত্মবিস্মৃত, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান-পরিশূন্য ও পরিশেষে অবসন্ন হইয়া

উভয়ের মনে কামের ক্রিয়া

পড়েন, তাহারই আবির্ভাবে অধিকাংশ রমণীর মরা মালঞ্চে ফুল ফুটে, প্রাণে বসন্তের ধীর মলয় বহে, শুষ্ক মগজের কানায় কানায় প্রখরবুদ্ধির বান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এইজন্য পুরুষ যখন ব্যাভিচারী হন, তখন সচরাচর তাহার মূলে থাকে তাঁহার ক্ষণিকের উন্মাদনা ও বিচারশূন্যতা ; নারী যখন ব্যাভিচারিণী হন, তখন তাহার মূলে থাকে খোশ্‌মেজাজ, ভাবের গভীরতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বিচক্ষণতা।

কেহ কেহ হয়ত শুনিয়াছেন, ব্যাভিচার করিতে গিয়া, পুরুষ যখন ধরা পড়িবার ভয়ে নিরাশ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তখন উপায়-উদ্ভাবনে পরিপক্কা নারী কি চমৎকার ক্ষিপ্র কৌশলে তাহাকে আত্মগোপনের সন্ধান বলিয়া দিয়াছে, নচেৎ তাহার নিরাপদে পলায়নের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। স্পেন্ ও ইটালীদেশে একটা প্রবচন আছে—"Mucho sabe la zorra, pero mas la donna enamorada ;"—'শৃগাল জানে অনেক, প্রেমানুরক্তা রমণী জানে তার চেয়েও বেশী',—অর্থাৎ নিজে পলাইবার বা প্রেমিককে বাহির করিয়া দিবার বহু কৌশল সে অবগত।' জাতক নারীর এই গুণের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। অমৃতলাল বসুর "চোরের উপর বাটপাড়ি" প্রহসনে নারীর এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের একটি হাস্যরসোজ্জ্বল ছবি দেখিতে পাই।···

পুরুষ-নারীর ব্যাভিচার-ক্রিয়ার মধ্যে আর একটু তলাইয়া দেখিলে আমরা এই সত্যটির সন্ধান পাই যে, একজন যখন ব্যাভিচার করে, তখন সে বর্তমানকেই বড় করিয়া দেখে—ভবিষ্যতের দিকে তাহার বড় দৃষ্টি থাকে না, সাময়িক উত্তেজনার চরিতার্থতা-চেষ্টাই তখন তাহার সমস্ত বিচার-শক্তিকে গ্রাস করিয়া বসে। কিন্তু অন্যজনের দৃষ্টি বর্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যতের দিকেই বেশী নিবদ্ধ থাকে, অর্থাৎ তাহার

তথাকথিত প্রেমকে চিরস্থায়ী করিবার আশা লইয়া ও এই উত্তেজনার দূরপ্রসারী ফল সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা বা সিদ্ধান্ত করিয়াই সে ব্যাভিচার-স্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

উপরি-উক্ত কারণে অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই, ব্যাভিচার করিয়া পুরুষ যখন অনুতাপ করিতেছে, নারী তখন আত্মতৃপ্তিতে মস্‌গুল্ হইয়া প্রাণ খুলিয়া হাসিতেছে। অনুতাপের সম্ভাবনা যদি থাকিতই, তাহা হইলে সে ব্যাভিচার-পথে আদৌ কি পা বাড়াইত ? কতকটা এই হেতুবাদ নিবন্ধন, কোনো রমণীকে কুলত্যাগিনী করাইয়া, কিছুদিন পরে পুরুষ তাহাকে পরিত্যাগ করে—হয় ওই অন্যায় কার্যের অনুশোচনানলে দগ্ধ হইয়া, নতুবা অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া। কিন্তু ভ্রষ্টা নারী সে পথ পরিত্যাগ করিতে মোটেই একাগ্রতা প্রকাশ করে না—প্রধানত ওই ক্ষণোন্মাদ, অবিশ্বস্ত, কপট প্রেমিকের প্রতি ক্রোধবশত এবং এই নূতন পথে অন্য পুরুষকে পরাজয় দ্বারা নিজের বিপ্রলব্ধতার গ্লানি মুছিয়া ফেলিবার লোভে। শীতল মস্তিষ্কে তখন সে এই কথা ভাবে যে, যে-প্রেমিক আমার রূপ-যৌবনকে এতদিন স্বর্গের নন্দন অপেক্ষা অধিকতর কাম্য বলিয়া মনে করিয়াছিল, সেই দুষ্ট পুরুষ হয় দেখুক্ নয় শুনুক্—তাহার সেই একদা-একান্ত-সেবিত রূপ-যৌবনের মদিরায় চুমুক্ দিতে আমি নিখিল-বিশ্বের প্রাণীকে আহ্বান করিতেছি।...

বহু কুলত্যাগিনী রমণী স্বামী কর্তৃক গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য আহূতা হইলেও বা বিচারকারী ম্যাজিস্‌ট্রেট্ কর্তৃক কোনো উদ্ধারালয় বা অবলাশ্রমে সৎভাবে জীবন-যাপন করিতে অনুরুদ্ধা হইলেও তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। স্মরণ রাখিবেন, এ নিয়মেরও অবশ্য ব্যতিক্রম আছে।...

মোট কথা হইল এই যে, পুরুষ যখন কামে অন্ধ হয়, নারীর তখন তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হয়। সেইজন্য আমাদের প্রাচীন সমাজ,

নারী উন্মার্গগামিনী হইলে, তাহার কঠোরতর শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন, এবং পুরুষ উন্মার্গগামী হইলে, আত্মানুশোচনার পর তাহাকে আর বেশী শাস্তি দিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেন না। অবশ্য যাঁহারা বলপূর্বক অপহৃতা ও ধর্ষিতা হন, তাঁহাদিগের প্রতি সমাজের কঠোর শাসন-নিপীড়ন অসঙ্গত ও অসমর্থনীয়।...

'দাম্পত্য-জীবনে সাধ্যমতো ব্রহ্মচর্য-পালন' বলিয়া একটা কথা লইয়া আমরা খুব নাড়া -চাড়া করি ; এবং "মাসে এক বছরে বারো, তার কম যত পারো"—যৌন-জীবনের উদ্দেশ্যে বহুবার-উচ্চারিত এই অথর্ব নীতিটির উপর বহু বুড়া কর্তারা প্রবল আস্থা স্থাপন করিতে আমাদিগকে উপদেশ দেন। ওই

রমণ-বিরতি

ঝুনা প্রাচীনগণ—যাঁহারা এককালে নবীন ছিলেন এবং যাঁহারা হয়ত সত্তর বা আশী বৎসর পর্যন্ত বহাল-তবিয়তে সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া থাকিয়া, নিশ্চিন্ত আরামে নাতিনাতিনীদের সুকোমল করকমলাঙ্গুলি দিয়া পাকা চুল তুলাইতেছেন, তাঁহাদের কেহই ভরা যৌবনের স্মৃতির দপ্তর হাত্ড়াইয়া হলফ্ করিয়া বলিতে পারেন না যে, ঐ নীতিটিকে কর্মক্ষেত্রে কখনো তাঁহারা বিশেষ আমল্ দিয়াছেন। বস্তুত এই "মাসে-একবারের" নীতিটি যদি ফৌজদারী-বিধি-ঘটিত সর্বজন-প্রতিপাল্য আইন-রূপে কখনো কোন দেশে জারী করা হয়, তাহা হইলে সর্বপ্রথম দেশের বিবাহিত যুবকদল উহার বিরুদ্ধে মহাসমারোহে সত্যাগ্রহ করিবে এবং যুবতীদলও তাহার পূর্ণসমর্থন করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না।

দীর্ঘ-সহবাস-বিরতিকে আমরা শরীর-মনের যতটা উপকারী বলিয়া উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়া থাকি, প্রকৃতপক্ষে উহা ততটা নহে *। পরন্ত

* THE SEXUAL LIFE by C. W. Malchow, M. D. p. 247. ও (2) SEX KNOWLEDGE FOR MEN by W. J. Robinson, M. D. দেখুন।

একুশ হইতে চল্লিশ-বিয়াল্লিশের মধ্যে মোটামুটি সুস্থ পুরুষগণ এবং চৌদ্দ-পনের হইতে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত মোটামুটি সুস্থা নারীগণ উভয়ের পূর্ণসম্মতিক্রমে প্রতি মাসে অন্তত নয়দিন করিয়া যৌনসম্মিলন করিলে, তদ্দ্বারা শরীরের কোন অবনতি তো হয়ই না, বরং প্রায় ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট কল্যাণ পরিলক্ষিত হয়। অত্যধিক যৌন-সংযোগ করিয়া সুস্থ, স্বভাবিক মানুষের যতটা ক্ষতি না হয়, তদপেক্ষা বরং কিছু বেশী ক্ষতি হয় দীর্ঘকাল ধরিয়া যৌন-উপবাস করায়, অস্বাভাবিকভাবে—অসম্পূর্ণভাবে—অসঙ্গতভাবে রতিক্রিয়া সংসাধন করায়, এবং জোর করিয়া কামেচ্ছাকে দমিত করিতে না পারিয়া ও পরিশেষে কার্যক্ষেত্রে নামিয়া 'ছি ছি, এতদ্দ্বারা আমার শরীরের কত না ক্ষতি হইল'—এই কাল্পনিক দুশ্চিন্তার দৈত্যকে মনের আঙ্গিনায় ডাকিয়া আনায়!...আলোচ্য বিষয়টি প্রত্যক্ষ অধিকারের বাহিরে বলিয়া, এই ব্যাপারের বিশদ আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য তুলিয়া রাখিতে বাধ্য হইলাম।

রতি-বিরতি বা ব্রহ্মচর্য, স্ত্রীলোক না পুরুষলোক অধিকতর অল্লায়াসে ও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল যাবৎ সহ্য করিতে পারে, তাহা লইয়া বিশারদ-গণের মধ্যে মতভেদ আছে। আমাদের ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, যে-সকল স্ত্রীলোক জীবনে কখনো রতি-সুখের আস্বাদ পায় নাই, তাহারা (অর্থাৎ অক্ষতযোনি বালবিধবারা) এই শ্রেণীর পুরুষদের অপেক্ষা বেশী দিন ও বিনা ক্লেশে রতি-বিরতি বরদাস্ত করিতে পারে। কিন্তু যে-সকল স্ত্রীলোক জীবনে একবার মাত্রও রতিসুখ প্রাণ দিয়া উপভোগ* করিয়াছে, তাহারা যৌবনকালে রমণ-বঞ্চনা খুব বেশী দিন সহ্য করিয়া থাকিতে পারে না। বিশেষত যে-সকল বিধবার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসরের নিম্নে, তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য পালন করা অত্যন্ত কষ্টকর, ও

যুবতী বিধবার ব্রহ্মচর্য

দীর্ঘদিন ধরিয়া পালন করা প্রকৃতপক্ষে দুঃসাধ্য। অর্থাৎ কঠোর সামাজিক বিধি, ধর্ম্মশিক্ষার সুকোমল আবহাওয়া ও তীব্র পারিবারিক শাসনের রক্তচক্ষু—রমণবঞ্চিতা যুবতীর স্বতোৎসারিত লিপ্সাকে কতকটা নিষ্প্রভ করিয়া দেয় সত্য, তথাপি একেবারে নির্বাপিত করিয়া দিতে পারে কিনা সন্দেহ।

বৈধব্যে যৌন-মনোবৃত্তি

জনৈকা মোটামুটি শিক্ষিতা প্রৌঢ়া বিধবা কিছুদিন পূর্বে গ্রন্থকারদ্বয়কে একখানা বহুতথ্যপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন; তাহার কয়েকটি ছত্র এই সূত্রে উদ্ধৃত করিয়া দিলে মন্দ হয় না, :—"যৌবনের প্রথম দিক্‌টায় বিধবা হওয়া প্রায় সকল রমণীর পক্ষেই খুব কষ্টকর ও ক্ষতিকর বটে, এবং আত্মসংযম করা অনেক সময় দায় হয়ে ওঠে। কিন্তু শেষ-যৌবনে বা প্রৌঢ় অবস্থায় বিধবা হ'লে স্বামীর অভাব তাঁদের মনে অন্যান্য কারণে পীড়া দিলেও, ঠিক যৌন-সম্মিলনের বঞ্চনা তাহাদিগকে অস্থির করে' তোলে না। যৌন-সংযোগকে পুরুষরা যত বড় করে দেখেন, নারীরা ততখানি দেখেন না। পুরুষ রূপ ভালবাসে—যৌবন ভালবাসে নিছক্ কামোপভোগের জন্য; কিন্তু নারী পুরুষকে ভালবাসে কেবল প্রেমের জন্য—পুরুষের গুণের উপাসনার জন্য—পুরুষের মুগ্ধমনকে তার সমস্ত মুহূর্ত্তগুলির উপর নিবদ্ধ কর্‌বার জন্য; নারীর কামের বাস্তবিক চরিতার্থতা প্রেমানুভূতির অধীন *। পুরুষ একটি মনোমত নারীকে দেখ্‌বামাত্র শুধু ভোগ করার বাসনাই তার মনে তীব্র হয়; অথচ একটি গুণবান পুরুষকে দেখে

* ঠিক এই রকম কথাই একটি রুশীয় গল্পের কোন তরুণীর মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে :—'We women even in free love cannot look too squarely at the actual 'fact'. For us the fact is always at the

নারীর শুধু তাকে ভালবাস্‌তেই ইচ্ছে যায়।···একটু খোঁজ নিয়ে দেখ্‌বেন, পত্নীগতপ্রাণা পুরুষ স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কিছুদিন পর্য্যন্ত চুপ ক'রে থাক্‌তে পারে; শেষে কয়েক রাত্রির পর স্ত্রীর তরফ্‌ থেকে সন্ধিস্থাপনের কোনো উদ্যোগ না দেখে, সে নানা অছিলায়—শুদ্ধ নিজের পশুবৃত্তির তাগিদেই—উপযাচক হ'য়ে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বল্‌তে ও তাকে কাছে ডাক্‌তে বাধ্য হয়।...

"যে নারী স্বামীকে ভালবাসতে পেরেছে বা তার ভালবাসার সামান্য প্রতিদান পেয়েছে, সে বৈধব্যাবস্থায় দূষিতচরিত্র হ'তে পারে খুব কম ক্ষেত্রেই। বিশেষ অনুকূল ক্ষেত্রে যদি বা কোন বিধবা কাউকে আত্মদান ক'রে ফেলে, সে শুধু কারুর একান্ত ভালবাসার অভাব সইতে পারে না ব'লেই।···যে-সকল বিধবা যৌবনে বিধবা হন, অথচ সারা জীবন চরিত্র অকলঙ্ক রাখেন, মৃত স্বামীর চেয়ে যোগ্যতর কারুর সংস্পর্শে এলে, তাঁকে মনে মনে না ভালবেসে থাক্‌তে পারেন না সত্য, কিন্তু বাক্যে বা ব্যবহারে কদাচিৎ তা' প্রকাশ করেন। কামের স্বয়ং অনুপ্রেরণা মাঝে মাঝে এলে, সেই ব্যক্তির সঙ্গে রমণে নিযুক্ত হয়েছেন—ভাবাবেগে শুধু এই কল্পনার ছবি মানস-পটে এঁকে অনেকেরই হয়ত পরম প্রসাদ লাভ হয়।···কেউ কেউ আবার অন্য দুই এক প্রকার কদভ্যাসের দ্বারাও নিজের অনুতাপ ও বিরক্তি সত্ত্বেও আত্মপ্রশমন কর্ত্তে বাধ্য হন্‌—জানি।"......

শুধু আমাদের দেশে বলিয়া নহে, পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশেই

end of the chapter, while at the begining we are charmed by the man himself, his mind, his talents, his soul, his tenderness. We always begin by desiring something other than physical union...." —WITHOUT CHERRY BLOSSOM by P. Romanof from 'Great Russian Short Stories', p. 943.

সাধারণত পুরুষ অপেক্ষা রমণীদিগের কাম-চরিতার্থতা-সাধনের অগ্রগামিতা বা স্বাধীনতা একেবারে নাই বলিলেই চলে। কাযেই বৈধভাবে তাঁহাদিগের কাম-লালসা মিটানোয় স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বাধা জন্মিলে, বিধি-বহির্ভূতভাবে অথবা লোকসম্মতভাবে এইরূপ চরিতার্থতা-সাধনের সুবিধা, সুযোগ বা অধিকার তাঁহারা অল্প পান্। পুরুষ এ বিষয়ে যেমন স্বেচ্ছাতন্ত্রী, তেমনি সুবিধা ও সুযোগ তাঁহাদিগের নিকট অত্যন্ত সুলভ; তাহার উপর সামাজিক শাসন তাঁহাদিগের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। যদি রমণ-বঞ্চিতা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে সমান সুযোগ, সুবিধা ও স্বাধীনতার মধ্যে রক্ষিত হইতেন, তাহা হইলে উভয়েই প্রায় তুল্যমূল্যভাবে কামনা-চরিতার্থ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন; এবং অনেক ক্ষেত্রে যুবতী-রমণীর সে চেষ্টা হয়ত অধিকতর বলবতী হইয়া উঠিত।

ব্রহ্মচর্যে অহিত

বর্তমান সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থার ভিতর থাকিয়া, স্ত্রীলোকদিগকে—বিশেষভাবে যুবতী-বিধবাদিগকে—সর্বদাই কাম-লালসা প্রশমিত করিবার জন্য অন্তঃপ্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে হয়; সে যুদ্ধে কেহ জয়-লাভ করেন, কেহ পরাজিত হন্। কিন্তু উভয় শ্রেণীরই একটা মস্ত লাভ হয় এই যে, তাঁহারা এ বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর সহিষ্ণু হন্। কিন্তু আজীবন ওই যুদ্ধের ক্ষতি ও ক্ষত অল্পবয়সী রমণীদিগের দেহ ও মনকে অপরিহার্যভাবে বহন করিতে হয় এবং তাঁহাদিগের দেহ-মনের নিকট হইতে এই জোর-করিয়া-অভ্যস্ত-করা সহনশীলতার রীতিমত মাশুল দিতে হয়। তাই আমরা বয়স্কা কুমারী ও যুবতী-বিধবাদের অনেকের দেহমনে কতকগুলি অনিবার্য উপদ্রব লক্ষ্য করিয়া থাকি; যথা—অতিরিক্ত ঘর্মনিঃসরণ, হাত-পা জ্বালা, মাঝে মাঝে উন্মাদলক্ষণ ও মূর্চ্ছাভাব, অকালে রজঃরোধ, শিরঃপীড়া,

জরায়ুর পীড়া, অম্লশূল, সর্বদা বিরক্তিভাব, স্বামীর সঞ্চিত অর্থরাশি নিরর্থক ব্যয় করিয়া ফেলিবার বাসনা, শুচিবায়ুগ্রস্ততা, স্নেহের আবরণে সন্তানদিগকে প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রশ্রয়দান, কলহপ্রিয়তা, ছোটখাট জিনিষ চুরি করার অভ্যাস প্রভৃতি।...

ইহা ভূয়োদর্শন-সিদ্ধ সত্য যে, স্ত্রীলোক যত সভ্য হইতেছে বা বহির্জগতের সংস্পর্শে তাহারা যত ঘনিষ্ঠভাবে আসিতেছে, ততই যৌন-বিতৃষ্ণা অথবা যৌন-সম্মিলনে দুস্তোষণীয়তা ও যৌন-জীবনে নির্বাচন-প্রবৃত্তি (অর্থাৎ ইহাকে ভালো লাগে না—উহাকে ভালো লাগে, এখন ভাল লাগে না—তখন ভাল লাগে, এ অবস্থায় ভালো লাগে না—ঐ অবস্থায় ভালো লাগে...ইত্যাদি) তাহাদের মধ্যে প্রকট হইয়া উঠিতেছে। শিক্ষিতা ও স্বাধীনাচারিনী রমণীর প্রেম ও প্রেমিকের আদর্শ স্বভাবত অত্যন্ত উচ্চ, বিচিত্র ও অসাধারণ রকমের হয়। বাস্তব জীবনে যথাসাধ্য সেই আদর্শের অনুরূপ মানুষ তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। সেরূপ না পাইলে, সচরাচর প্রেমে পড়েন না। অথচ প্রেমের অভিনয় করিতে অথবা ঠাট্‌ঠমক্‌-দ্বারা বহু পুরুষের মুগ্ধ স্তুতি আহরণ করিতে, এই শ্রেণীর অনেকেই বেশ পারদর্শিনী হইয়া উঠেন।

যৌন-জীবনে দুস্তোষণীয়তা

প্রেমে না পড়িয়া বিবাহ হইলে, অথবা বেশী না ভাবিয়া-চিন্তিয়া পরিণয়ে সম্মতি দিয়া ফেলিলে, স্বামীর প্রেমালিঙ্গনের নিকট ইঁহারা স্বভাবত শীতল ও নিস্পন্দ হইয়া থাকেন। কোনো পণ্ডিত হিসাব করিয়া বলিতেছেন—পাশ্চাত্য দেশে যৌন-জীবনে কামশীতলা বা উদাসীন্ (frigid) রমণী প্রায় শতকরা ৩০ জন। অবশ্য ইঁহাদের অধিকাংশই স্থান-কাল-পাত্র

কামশীতলা রমণী

বিশেষে উত্তপ্ত হইতে পারেন; অর্থাৎ স্বভাবগতভাবে ইঁহারা শীতলা নহেন, তবে অবচৈতনিক প্রবণতা ও ব্যক্তিগত রুচি তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে সূক্ষ্ম বাছ্-বিচার করিতে শিক্ষা দেওয়ার ফলে অপছন্দসই স্বামীর নিকট ইহাঁরা উদাসীন হইয়া থাকেন। রমণীর কামশীতলতার আরো অন্যান্য কারণ আছে; সেগুলি নিম্নে বিশ্লেষণ করা হইতেছে। আমাদের দেশেও এইরূপ স্ত্রীলোকের সংখ্যা অন্তত শতকরা দশটি আছে বলিয়া অনুমান করা যায়।

কামশীতলা স্ত্রীলোকগণ সঙ্গমের সময় একেবারে নিশ্চেষ্ট থাকেন—আদৌ আনন্দ অনুভব করেন না, অথবা এত ক্ষীণ আনন্দ বোধ করেন যে, তদ্দ্বারা নিবিড়তম রতিক্রিয়ার সময়েও অঙ্গাদি আন্দোলন প্রভৃতি-দ্বারা ঐ আনন্দের বাহ্য লক্ষণ কিছুই প্রকাশ করেন না; কিংবা কোনমতে আপনাদিগকে চরমানন্দ-লাভের অবস্থায় আনয়ন করিতে পারেন না। শুধু তাহাই নহে, কেহ কেহ স্বামীর কামোপক্রমে চিরকাল পারতপক্ষে বাধা প্রদান করেন। এইরূপ শীতলা স্ত্রীলোকগণ নিজেদেরও অসুখী করেন, পরন্তু প্রত্যুত্তরাকাঙ্ক্ষী সরলহৃদয় স্বামীদিগকেও কিছুদিনের মধ্যে ক্ষুণ্ণ, অতৃপ্ত ও বীতস্পৃহ করিয়া তুলেন্। অনেক সময় এই সকল স্ত্রীলোকের স্বামিগণই বিবাহিত জীবনের মধ্যভাগে বাধ্য হইয়া অসচ্চরিত্র হইয়া পড়েন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, জগতে পুরুষের ন্যায় অল্প কামুক বা অধিক কামুক স্ত্রীলোক দেখা যায় বটে; কিন্তু একেবারে "শীতলা" বা "কামলেশ-পরিশূন্যা" স্ত্রীলোক নিতান্ত বিরল। যৌন আবেগ বর্তমান থাকিতেও, রমণীগণ স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে নানাকারণে যৌনমিলনে উদাসীনতা ও অস্বাচ্ছন্দ প্রকাশ করেন এবং আপনাদিগকে পুরুষের

কামশীতলতার কারণসমূহ

অনধিগম্যা রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি ক্ষেত্র ও হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম।—

(ক) দীর্ঘকালীন রোগভোগ ; স্বামীকর্তৃক উপসর্পিত জননেন্দ্রিয়ের ব্যাধি (সিফিলিস, গনোরিয়া প্রভৃতি) ; প্রসবের অব্যবহিত পরে জনন-নালীর প্রসারতার দরুণ মানসিক বিক্ষোভ।

(খ) গর্ভ-সঞ্চারের আশঙ্কা ; প্রসবকালীন যন্ত্রণা-সঙ্কট ও সন্তান-পালনের গুরু দায়িত্ব এবং শিশু-মৃত্যু-জনিত শোকের পুরোচিন্তা।

(গ) গর্ভ-নিবারণের জন্য সম্মিলন-কালে স্বামী-কর্তৃক বিভিন্ন সুখাপহারক প্রক্রিয়ার বিনিয়োগ ; যথা—ক্রমাগত ফরাসী টুপির (French letter) ব্যবহার, প্রত্যাহারী বহির্নিষেক (Withdrawal), ধারক সঙ্গম (Karezza method), বহির্যোনীয় সঙ্গম * ইত্যাদি।

(ঘ) নারীর কামাবেগের চরমাবস্থা আনয়ন করিবার প্রক্রিয়াসমূহ সম্বন্ধে পুরুষের দুরপনেয় অজ্ঞতা, অথবা সঙ্গমের পূর্বে বা সমসময়ে উপচারসমূহের আদৌ অনুপস্থিতি।

(ঙ) ইচ্ছার অভাব সত্বেও ক্রমাগত জোর-করিয়া-আদায়-করা সঙ্গম।

(চ) বাল্যে, কৈশোরে, বা যৌবনোন্মেষে স্বমেহন, সমমেহনাদিতে ঘোর আসক্ত হইয়া পড়া।

(ছ) পুরুষের প্রতি অভিমান, রাগ, বিরাগ, বিদ্বেষ।

(জ) স্বামীর উপর একাধিপত্য করিবার দুর্নিবার প্রবৃত্তিতে বাধার উৎপত্তি।…ইত্যাদি।

. এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইলে, একখানি সুবৃহৎ পুস্তক

* এই সকল প্রক্রিয়ার বিশেষ তথ্যবহুল ব্যাখ্যার জন্য নৃপেনবাবুর "জন্ম-শাসন" নামক পুস্তক পাঠ করুন।

লিখিতে হয়। এই প্রসঙ্গে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অতৃপ্ত পুরুষ অপেক্ষা অতৃপ্তা নারীর সংখ্যা জগতে অপেক্ষাকৃত বেশী, ভারতে তো অত্যন্ত বেশী। পণ্ডিতগণ একবাক্যে বলেন, ক্রমাগত অতৃপ্ত উত্তেজনাভোগের দ্বারা রমণীগণের কষ্টরজঃ, রজঃরোধ, অনিয়মিত রজঃ, বাধক, হিষ্টিরিয়া, রক্তাল্পতা, মেল্যান্‌কলিয়া, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, বিশীর্ণতা, শিরঃপীড়া, কটিশূল, উন্মাদভাব প্রভৃতি বহুতর ব্যাধি প্রকাশ পায়।

ইতঃপূর্বেই বলিয়াছি যে, কৈশোরের শেষে বা যৌবনের প্রথমে বৈধভাবে পুরুষ-সংসর্গের সুযোগ না ঘটিলে, বহু বালিকাই নানারূপ অস্বাভাবিক যৌন-কদভ্যাসে প্রবৃত্ত হইতে পারে। একটা বয়সকালে এইরূপ অভ্যাসে রত হওয়াটা পুরুষের পক্ষে যদি যুক্তিসহ হইতে পারে, তাহা হইলে নারীর পক্ষেই বা না হইবে কেন? কিন্তু বহু বৈজ্ঞানিক ও দেহতাত্ত্বিকদের মতামত হাঁতড়াইয়া আমরা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি যে, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষে এই অভ্যাস অধিকতর ক্ষতিকর এবং একবার বদ্ধমূল হইলে তাহা পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। যাহারা বাল্যে বা কৈশোরে স্বমেহনে রত হয়, তাহারা মনোমত স্বামী লাভ করিয়াও তাঁহার সহিত সহবাসে তৃপ্ত হইতে পারে না, প্রায়ই কামশীতলা হইয়া পড়ে।

স্বমেহন

এই জাতীয় কোন কোন রমণী স্বামী-সহবাসের পর নির্মল হইবার অছিলায় গোসল্‌খানায় গিয়া পাণিমেহন করিয়া তবে পূর্ণপরিতৃপ্তি লাভ করে। ইহাদের মধ্যে প্রায় লিউকরিয়া, বাধক, কটিবেদনা, কোষ্টবদ্ধতা, দুশ্চিন্তা-প্রবণতা, স্বভাবরুক্ষতা, মূর্চ্ছা প্রভৃতি স্থায়ী উপসর্গসমূহ দেখা যায়। কৈশোর-যৌবনে এই কদভ্যাসে যাহারা

দীক্ষিতা হয়, তাহাদিগের দুই তিন বৎসরের মধ্যেই পৃষ্ঠদেশ ন্যুব্জ হইয়া যায়, জঘন-প্রদেশ বিশীর্ণ হইয়া পড়ে, কুক্ষি-গহ্বর ভিতরদিকে বসিয়া যায়, চক্ষু জ্যোতিহীন হয়, গণ্ডদ্বয় চাপা হয়; ইহারা দক্ষিণ হস্তদ্বারা অধিকতর ক্রিয়া-নিপুণা, ঘোর স্বার্থপর, নির্জনতাপ্রিয়, পরিচ্ছদ-বিলাসী হয় এবং অনেকেই ওষ্ঠদ্বারা সুন্দর শীষ্ দিতে পারে।

স্বমেহন বা পাণি-মৈথুন পাশ্চাত্য রমণীগণের মধ্যে প্রবলভাবে প্রচলিত থাকিলেও আমাদের দেশের নারী-সমাজে খুব কম দেখা যায়। সঙ্কীর্ণ মণ্ডলের মধ্যে অনুসন্ধানের দ্বারা জানিতে পারিয়াছি যে, কোনো কোনো প্রোষিতভর্তৃকা ও বাল-বিধবা উত্তেজনা প্রশমনের জন্য, অঙ্গুলি দ্বারা ভগাঙ্কুর (clitoris) নিপীড়ন, বিছানার উপর ভগাঙ্কুর ঘর্ষণ, উরুর উপর উরু স্থাপন করিয়া উভয় ভগোষ্ঠ (labia majora) ঘর্ষণ, পেন্সিল, ঝর্ণা-কলম, মাথার কাঁটা, হেয়ার পিন্, যুগ্ম অঙ্গুলি, বদ্না, গাড়ু বা হুকার নল প্রভৃতি মূত্রনালিতে বা জনন-পথে প্রবেশ করাইয়া দেওন প্রভৃতি অস্বাভাবিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়, এ দেশের ইংরাজী স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ও কলেজের বালিকাদিগের মধ্যেও এইভাবে স্বমেহনের অভ্যাস ক্রমশ বিস্তৃতিলাভ করিতেছে।

ইহাদিগের মধ্যে সমকামিতার (homosexuality) অর্থাৎ বালিকার প্রতি বালিকার আসক্তির কয়েকটি বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেদনও আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। আশ্রম, আবাসিক বিদ্যালয় ও হোস্টেলের বহু ছাত্রীর নিকট ইহার তথ্য ও আচরণ অজ্ঞাত নহে বলিয়াই আমাদের প্রতীতি। কোন কোন কলেজের ছাত্রী-সমাজে নাকি সমমেহনের প্রচলিত ও গুপ্ত পরিভাষা—'ছাপ্পি'। আমাদের দেশের কোনো কোনো বিধবা যুবতী ও বেশ্যার মধ্যে এই বাতিক বিদ্যমান বলিয়া জানিতে পারা যায়।

সমমেহনাভ্যাস

সগর রাজার দুই স্ত্রীর পরস্পর 'রমণের' ফলে ভগীরথের জন্ম হয়,—আধুনিক বিজ্ঞানের কষ্টি-পাথরে ইহার সত্যতা নির্ণয় করা দুরূহ হইলেও এইটুকু বুঝিতে পারি যে, তৎকালে নারীদিগের মধ্যেও সমমেহন ব্যাধি বর্তমান ছিল। জাতক, কামসূত্র, পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতিতে ইহার উল্লেখ আছে। মহাভারতে ভীম কথাপ্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক যখন মনুষ্য নিকটে পায় না, তখন পরস্পর পরস্পরের উপর আপতিত হয় [Mbh. Bombay edn. XIII, 38—43]। নীলকণ্ঠ তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, একপ্রকার কৃত্রিম ধ্বজদণ্ড প্রস্তুত করিয়া ও তাহাই জঘনস্থলে আঁটিয়া এক স্ত্রী অপর স্ত্রীকে পুরুষানুরূপ আনন্দ-দানে প্রযত্নবতী হয়; ইহা নাকি তৎকালে সকল সমাজেই সুবিদিত ছিল *।

পাশ্চাত্য দেশে সমমেহন-ব্যাধির প্রসার অত্যন্ত অধিক; এমন কি, ইহা লইয়া খুন-জখম, বিবাদ-বিসংবাদ ও আত্মহত্যাও হয়। তথায় বহু বয়স্থা কুমারী সমকামের মোহজালে পড়িয়া নিশ্চিন্ত সুখে জীবন-যাপন করিতেছে। তদুপরি, গ্রীসের স্ত্রীকবি স্যাফোর আমল্ হইতে বিংশ শতাব্দীর নবতন সভ্যতার পূর্ব পর্যন্ত যে এ ব্যায়রাম স্ত্রীলোকের মধ্যে সমান্ টানে চলিয়া আসিয়াছিল, তাহা Paul Lecroixর 'Histoire de le Prostitution', Emile Zolaর 'Nana' উপন্যাস প্রভৃতি গ্রন্থ-পাঠে সুনিশ্চিতভাবে জানা যায়।...

ভারতের পশ্চিম দেশগুলির বহুস্থলে উচ্চ হইতে নিম্নস্তরের পুরুষ-বিরহিতা রমণীগণের মধ্যে সমমেহনাভ্যাস বর্তমান দেখা যায়। যৌনতত্ত্বজ্ঞ,

* Schmidt, LIEBE U. EHE IN INDIEN. p. 254, এবং J. Meyer-প্রণীত SEX LIFE IN ANCIENT INDA গ্রন্থদ্বয় দেখুন।

বহুদর্শী ও বহুঅধ্যয়নশীল কোন বন্ধু প্রবাস হইতে লিখিতেছেন—"হিন্দীতে জড়ানকে (embracing) বলে "চিপট্না"। যে জড়িয়ে আছে, সে পুংলিঙ্গে 'চিপ্‌টা', স্ত্রীলিঙ্গে 'চিপ্‌টী'। সেইজন্য tribadismএর হিন্দী নাম 'চিপ্‌টি'।…শোনা যায় যে, একটি পুরু কাপড়ের গোল, সরু, লম্বা থলিতে উপর অবধি পর পর পয়সা সাজিয়ে রেখে সেলাই ক'রে দেওয়া হয়। পরে সেটা ভেড়া বা ছাগলের পেটের ভেতর যে পাৎলা চামড়ার ঝিল্লি পাওয়া যায়, তাই দিয়ে জড়িয়ে বন্ধ করা হয়। পরে তার উপর মোম বেশ ক'রে ঘষে লাগান হয়। দু'জনে এ জিনিষটির প্রায় অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক নিজ নিজ যোনির মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে পুরুষের মত কটি-আন্দোলন করে। এরই নাম চিপ্‌টি। Havelock Ellisএর STUDIES IN THE PSYCHOLOGY OF SEXএর Vol.iiতে 'Sexual Inversion' অধ্যায়ে উদ্ধৃত একজন ভারতীয় সিভিল্ সার্জেনের চিঠিতে চিপ্‌টীর উল্লেখ আছে।"…

বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট

অ

আ

ই

উ

ঋ

* ২৪ পৃষ্ঠায় 'অণ্ডাণুকোষকে' ভুল করিয়া লেখা হইয়াছে 'গর্ভকোষ'; সংশোধন করিয়া লইবেন।

ঠ

ত

দ

ন

প